স্মৃতিচারণ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুরসুধাকর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

তৃয় পর্ব

যৌবন—উত্তরযৌবন-স্মৃতি

দিলীপকুমার রায়

২৭ বৎসর বয়সে

এ পর্বে যাঁদের কথা লিখেছি :

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, কাশীনরেশ, শ্রীকালীপদ গুহরায় ও শ্রী এস ডোরাস্বামী···

এবং প্রসঙ্গতঃ সুভাষচন্দ্র, ইন্দিরা দেবী, অতুলপ্রসাদ, শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক, শ্রীসুধী মল্লিক, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺অমলেন্দু দাশ, শ্রীমিলন সেন, শ্রীমতী বাণী সেন, রাকা, প্রেমল, সৈয়দ হুসেন নাসির···

tolerant, that is what we are here for. It is a soul-factory, and it is turning out a bad article."

বইটির নাম Land of Mist—লিখেছিলেন বিখ্যাত কনান ডয়েল ১৯৩০ সালেরও আগে। আজ যদি তিনি দেখতেন বৈজ্ঞানিকদের কাপালিকতার ফলে মানুষ কীভাবে শক্তিমদমত্ত নাস্তিকতার পাল তুলে চলেছে ধ্বংস-প্রপাতের রসাতলে তাহ'লে নিশ্চয়ই আরো অনেক মূল্যবান্ কথা বলতেন আস্তিকতার স্বপক্ষে, যদিও বস্তুবাদী ইদানীন্তনেরা কানে তুলত না সে-ধর্মের কথা, চলত সমানেই আত্মঘাতী ওকালতি করতে করতে—আণবিক মারণাস্ত্রকেই জগতে পরম শান্তির ভিত্তি ব'লে দুন্দুভি বাজিয়ে।

আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বিজ্ঞানের বিরোধী নই। বিজ্ঞান বস্তু-বিচারের পথে চ'লে প্রকৃতির নানা শক্তিকে অদ্ভুত কৌশলে বুদ্ধির তাঁবেদার ক'রে মানুষের রকমারি দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেছে, বিশেষ ক'রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে মানুষের অনেক দেহদুঃখের নিরসন না হোক হ্রাস হয়েছে সন্দেহ নেই। আমার বলবার কথা শুধু এই যে, বিজ্ঞানের আধিভৌতিক জ্ঞান খতিয়ে মানুষের যথার্থ হিতসাধন করতে পারে না যদি না ভাগবত জ্ঞানের অধ্যাত্ম আলো তাকে পরম মুক্তি ও শান্তির পথনির্দেশ দেয় ভাগবতী করুণার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে। কারণ এ-জগতে শুধু এই করুণাই পরম শুভদা—প্রেমের ঘরণী, শান্তির জননী, আনন্দের ধাত্রী। তাই ভগবানের ইচ্ছাকে যাঁরা তাঁদের জ্ঞানের আলোয় চিনেছেন শুধু তাঁরাই হ'তে পারেন মানুষের অন্তিম বরদাতা, শুভবুদ্ধির পথিকৃৎ, দেখাতে পারেন মানুষের কোন্ কোন্ মতিগতি দৈবী ও সাত্ত্বিক (ওরফে ভগবানের অভিপ্রেত) আর কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি আসুরিক ও তামসিক (অর্থাৎ ভগবানের প্রতিস্পর্ধী)। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই কথাটা না বুঝলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য যে, যেহেতু বিজ্ঞানের বস্তুবিচারলব্ধ জ্ঞানের লক্ষ্য অপরা বিদ্যা, সেহেতু বিজ্ঞানবুদ্ধি কদাচ খতিয়ে সর্বার্থসাধিকা হ'তে পারে না যদি না সে পরা বিদ্যা ওরফে ব্রহ্মবাদীর হুকুমবরদার হ'তে শেখে। কারণ শুধু এই আত্মবিত্তেরি হাতে আছে শান্তির, মৈত্রীর, সুষমার, সৌভ্রাত্রের, পরমানন্দের চাবি—বৈজ্ঞানিক মন্ত্রবিতের হাতে নয়। ইতি।

কালীপূজা, ১৩৬৮ দিলীপদা

ভূমিকা

লিখতে লিখতে যখন কোনো বইয়ের কায়া বেড়েই চলে, অথচ লেখনী থামতে চায় না তখন লেখকের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে এত বড় বই কেউ পড়বে কি—বিশেষ আত্মকাহিনী? তাই "স্মৃতিচারণ" প্রথম দুই পর্ব লিখবার পরে যখন বহু পাঠক পাঠিকার পত্র পাই—"আরো লিখুন"—তখন ভরসা ক'রে দ্বিতীয় পর্বের পরে তৃতীয় পর্ব স্বরু করলাম। এ-পর্ব বোধ হয় আড়াইশো পাতা হবে। সাড়ে আটশ পাতা স্মৃতিচারণ! ফের সেই কুণ্ঠা জাগে। কিন্তু তারপরে মনকে সান্ত্বনা দেই—এত ভয় কিসের? সরস না হ'লে কেউ পড়বে না—কর্মফলের শাস্তি পাব হাতে হাতেই। ফলে অতঃপর প্রকাশক আর সদয় হাসি হাসবেন না—লেখনীকেও থামাতেই হবে। চুকে গেল।

এই ভেবেই তৃতীয় পর্বে লিখেছি বাংলার কয়েকটি মহামনীষীর কথা।

এখানে থেমে স্মৃতিচারণের মূল প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কারণ অনেকে আমার স্মৃতিচারণ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ভেবেছেন।

প্রথম কথা এই যে স্মৃতিচারণ লিখতে আমি কখনই ব্রতী হতাম না যদি মনে একটি গভীর আনন্দের প্রেরণা অনুভব না করতাম। সে-আনন্দ শিল্প বা সাহিত্যের আনন্দ নয়—তার মূলে ছিল ধর্ম-প্রেরণা আমার কাছে দিনে দিনে কী ভাবে সত্য হ'য়ে উঠে আমাকে অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে আলোর এলাকার দিকে এগিয়ে দিয়েছে সেই ইতিহাসের একটা রেকর্ড রেখে যাওয়া, বিশেষ ক'রে তাঁদের জন্যে যাঁরা ভক্তি জ্ঞান নিষ্ঠা ধ্যান ধারণা আরাধনা-বর্গীয় ভগবৎসাধনাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা ব'লে বরণ করেছেন।

কিন্তু একথার মানে নয় যে, সাহিত্যে বা সঙ্গীতে আমি রস পাই নি কোনোদিন। পেয়েছি বৈ কি। বিলেতে রোল"ার জন ক্রিসটফার প'ড়ে ১৯১৯ সালে এত অভিভূত হয়েছিলাম যে তাঁকে চিঠি লিখে দেখা করতে চেয়েছিলাম। বার্টরাণ্ড রাসেলের Roads to Freedom প'ড়েও ঠিক তেম্‌নি মনে হয়েছিল যে, এমন মহাপ্রাণ মানুষের সংস্পর্শ না পেলেই নয়। কিন্তু তার পরে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেয়ে আর কোনো মহাজনের কাছে জীবনের পরম দিশা সম্বন্ধে উপদেশ চাওয়ার কথা ভাবতেও পারিনি। এহেন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন একটি পরম মন্ত্রে: যে, শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের পথে মানুষ কখনই সর্বোচ্চ সার্থকতার স্বাদ পেতে পারে

না—জীবনে সর্বার্থসাধিকা হ'তে পারে কেবল একটি দীক্ষা—ভগবানের চরণে পূর্ণ শরণাগতি আর তাঁকে জানলে তবেই আর সব. জ্ঞাতব্যকেই দেখা যায় তাদের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি আমাকে নানা পত্রেই লিখেছিলেন যে, আর্টের মাধ্যমে ভক্তি মানুষের হৃদয়ে বেশি সহজে প্রবেশ করে ব'লেই আর্টের মূল্য। তাই যে-আর্টের সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্কই নেই—অর্থাৎ আর্ট ফর আর্টস্ সেক—সে-আর্টের ক্ষণিক তথা অগভীর সাধনা যোগীর স্বধর্ম হ'তেই পারে না।

কথাটা কিছু নতুন নয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ হাজার বৎসর আগে বলেছিলেন এই কথাই অনবদ্য সংস্কৃতে—বিষ্ণুপুরাণে :

তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥

অর্থাৎ

সে-ই কর্ম—গাঁথে না যে নিত্যনব বন্ধনের পাশ,
সে-ই বিদ্যা—মুক্তিপথে যে আলোর দিশারি ধরায়,
আর সব কর্ম—শুধু আয়াসের ক্ষণিক বিলাস,
আর সব বিদ্যা—শুধু শিল্পের নৈপুণ্য-সিদ্ধি হায়!

আমার এ-মনোভাবকে অনেকে শিল্পবিজ্ঞানবিমুখতা ব'লে ভুল বুঝেছেন, তাই এ-সূত্রে আমার বক্তব্যকে আর একটু খুলে বলি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

বছর পনের আগে একবার আমি কলকাতায় একটি মস্ত কন্সার্ট দিয়ে আশ্রমের জন্যে কয়েক হাজার টাকা তুলি। সেখানে আমার গান শুনে আমার এক শুভার্থিনী পরদিন তাঁর ওখানে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে বলেছিলেন : "যে-আপনি এমন গান করেন সে-আপনি কী দুঃখে সব ছেড়ে ছুড়ে যোগী হলেন ভেবে পাই না, দিলীপবাবু! এরি নাম সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—নয় কি?"

আমি উত্তরে হেসে শুধু একটি ছড়া কেটেছিলাম :

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে—কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

"ফের সেই ঠাট্টা—আপনি কী যে!—না, বলতেই হবে আপনি কী এমন বস্তু পেয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে যা অন্যত্র পেতেই পারতেন না। একটিমাত্র মানুষের টানে কী ক'রে সংসার ছাড়তে পারল—আপনার মতন সদানন্দ হাসিখুসি মিশুক কবি, গুণী, ভাবুক?"

আমি গদ্যে এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সেদিন রাতে একটি গান রচনা ক'রে পরদিন শুনিয়েছিলাম তাঁকে—"শুনুন আপনার কালকের প্রশ্নের উত্তর।" গানটি আমার একটি বড় প্রিয় কীর্তন—শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে লিখিত :

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ—
ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে !
কী পেয়েছি তার কী গাহিব গান ?
কী দিয়েছ হায় কহি কেমনে।

না চাহিতে যে গো আপনি মিলিল,
অহেতুক প্রেমে দিলে গহনে !
অতীতের দিশা চিহ্ন মুছিল
নবীন দিশারি-ছবি-বরণে !

ছিল না যাহার কোনো দাবি-দাওয়া
তারে দিলে তব চিরন্তনে !
যা কিছু পেয়েছি—সবই প্রিয়, পাওয়া
তব চরণের অনুসরণে।

আমার শুভার্থিনী এ-গানটি শুনে বলেছিলেন : "আহা, কী সুন্দর গানই না আপনি বাঁধেন !—বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে ! দিলীপবাবু, কেন আমার আপনার গান এত ভালো লাগে বলব ? না, আমি গানের গ-ও জানি না, যোগ ধর্ম ভক্তি কিছুই বুঝি না। কিন্তু এমন মিষ্টি গলা আমি জীবনে আর শুনি নি—তাই তো এত দুঃখ হয় ভাবতে যে—আপনি যোগ করতে গিয়ে গান ছেড়ে দিলেন।"

আমি হেসে বলেছিলাম : "গান ছেড়ে দিলাম ! বলেন কি আপনি ? গত দু'তিন বৎসরে সারা ভারতে—কলকাতা, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বম্বে, বরোদা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি শহরে গান গেয়ে লক্ষাধিক টাকা তুলেছি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে। আমি গান ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু করলে কি পারতাম এভাবে গুরুসেবা করতে ? তবে একথা সত্যি আমি ঠুংরি, গজল, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'জানি জানি তোমারে রঙ্গরাণী,' বর্গীয় গান আর গাই না—এখন গাই শুধু ভজন কীর্তন স্তোত্র দোঁহা। আমার কণ্ঠ আপনার ভালো লাগে বলছেন এতে আমি

খুশি, কিন্তু আরো খুশি হতাম যদি বলতেন যে, আমার কণ্ঠলাবণ্য তথা বহুদিনের সাধনা-অর্জিত গানের নৈপুণ্য যে আমি নিয়োগ করেছি ভগবানের প্রেমের দিকে ঐহিক মানুষের মন টানতে—এটুকু আপনার চোখে পড়েছে।"

তিনি বললেন: "চোখে পড়েছে অনেক বারই, দিলীপবাবু। অন্ধ তো নই। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও চোখে পড়েছে যে আপনি যোগের জন্যে দেশ ছাড়লেন—গুরুর জন্যে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—"

আমি হেসে বললাম: "আপনার প্রথম অভিযোগটির উত্তরে 'আই প্লীড গিল্টি'—যদি দেশ বলতে বোঝেন শুধুই ওস্তাদদের পাড়া আর বন্ধুবান্ধব বলতে বোঝেন কেবল তাঁদের যাঁরা আমার ধর্মের আদর্শকে হেনস্থা ক'রে আমাকে পেতে চান শুধু তাঁদের চিত্তরঞ্জক 'সমপ্রাণ সখা'-রূপে। আমাদের শাস্ত্রে যথার্থ স্ত্রী বলেছে তাকেই যে সহধর্মিণী, কি না ধর্মপথের সঙ্গিনী—যাকে পরমহংসদেব বলতেন 'বিদ্যা স্ত্রী'। তেমনি ধর্ম বা যোগসাধনার পথে তাদেরই বলা চলে যথার্থ স্বজন, অন্তরঙ্গ, যারা ভগবৎপন্থী—বাকি সবাই বহিরঙ্গ—তাদেরও প্রীতির চোখে দেখা যায় ও দেখা চাই—কিন্তু মনের মানুষ বলা চলে না। আপনার দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে শুধু একটি নিবেদন আছে: গুরু ও গুরুশক্তি কী বস্তু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, জেনেছি, চিনেছি, দেখেছি, চেখেছি—দিনের পর দিন। তাই উপলব্ধি করেছি যে, গুরুর মধ্যে দিয়ে ভগবানের কৃপাশক্তি আমাদের মুক্তির পথে এগিয়ে দেয় প্রতিপদেই। এ-হেন পরম বন্ধুর জন্যে কিছুই ছাড়ব না এ কেমন কথা বলুন তো? তাছাড়া গুরুর জন্যে আত্মীয়-স্বজন গৃহ সংসার ছাড়ার নামই দুরভিসার—কেননা প্রথম দিকে এতে ব্যথা বাজেই বাজে, বহুলালিত মমতার তন্তুতে টান পড়ে ব'লে। কিন্তু গুরু কী বস্তু যে আদৌ জানে না তাকে বোঝাব কী ক'রে কেন অভিসারের জন্যে সব ছাড়তে হয়?"

কথাগুলি আমি একটু সাজিয়েই লিখলাম—একাধিক বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সংক্ষেপে একটি বাদানুবাদে সংহত ক'রে। এ-প্রয়াস আমি করতাম না যদি আমার স্মৃতিচারণের নানা আত্মকথনকে নিশানা ক'রে কয়েকজন ক্রিটিক রকমারি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীরন্দাজি না করতেন। না, আরো একটি উদ্দেশ্য আছে: এ-আলাপটুকু আমার চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের প্রাক্‌কথন রূপেই নিবেদন ক'রে রাখলাম তাঁদের জন্যে যাঁরা অধ্যাত্ম সত্যে শ্রদ্ধালু—কারণ আমার যোগজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যদি কোনো দিন লিখি লিখব তাঁদেরই জন্যে—

আমার সে-সব বন্ধু বা ক্রিটিকদের জন্তে নয় যাঁরা যোগ সম্বন্ধে কোনো অপরোক্ষ অনুভূতি না থাকা সত্ত্বেও যোগার্থীকে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর বর্গীয় উপাধি দিয়ে থাকেন—এই অদ্ভুত যুক্তিতে যে যা তাঁদের কাছে অবাস্তব বা অসম্ভব মনে হয় তার অস্তিত্ব নামঞ্জুর, তাঁদের চোখে যা বিসদৃশ তা দণ্ডনীয়।

* * *

ভূমিকা বড় হ'য়ে গেল। তবে সান্ত্বনা এই যে যাঁদের ভালো লাগবে না এ-সব ধর্মের বা যোগের ওকালতি, তাঁরা সহজেই এটুকু বাদ দিয়ে পড়তে পারবেন শুধু সেই সব প্রসঙ্গ যাতে ধর্মের বা যোগের আমেজ নেই। কেবল আর একটি কথা বলার আছে।

আমার মনে হয়—আমি যখন এ-পর্বে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি লিখেছি, তখন আরো একটু বলা দরকার—আমার স্মৃতিচারণে তাঁর ব্যক্তিরূপ তথা প্রতিভার কোন্ বিভাবের (aspect) 'পরে আমি সবচেয়ে বেশি জোর দিতে চেয়েও পারিনি স্থানাভাবে।

আমার মনে হয় আমাদের এ-বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক যুগের মানুষ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা, ব্যক্তিরূপ ও শিল্পকারুর মহিমা সম্বন্ধে যতটা সচেতন তাঁর আধ্যাত্মিক ওরফে সত্যদ্রষ্টা রূপের মহিমা সম্বন্ধে ততটা সচেতন নন। যদি হ'তেন তাহ'লে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে তাঁর অপূর্ব "শান্তিনিকেতন" ভাষণাবলীর সম্বন্ধে অন্তত: কয়েকটি প্রশস্তিরও দেখা পেতাম। আমার হাতে এ-আশ্চর্য ধর্মগ্রন্থটি প্রথম পড়ে পণ্ডিচেরিতে কুড়ি পঁচিশ বৎসর আগে। একটুও অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে, এ দুই খণ্ডের নানা অপরূপ ভাষণের ভাবগভীরতা, অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ও অন্তর্দৃষ্টি আমার মনকে অভিভূত করেছিল। দিনের পর দিম কী আনন্দেই না পড়েছি "শান্তিনিকেতন" !—আজো পড়ি মাঝে মাঝেই—আর পড়তে পড়তে রোজই কত কী যে লাভ করি কী বলব ? ভাষা ও ভাব চলেছে তর তর ক'রে হিল্লোলে কল্লোলে —এ বলে আমাকে দেখ. ও বলে—আমাকে ! আমার মনে হয় এ-বইটি আজকের দিনে প্রতি কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত, আমাদের দেশের তরুণদের জানা উচিত—রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে রকমারি মণিমাণিক্য এনে তাঁর মানসপ্রতিমা বঙ্গ-ভারতীকে সাজালেও সে-মঞ্জু দেহসজ্জার নিচেকার অন্তরাত্মা—নির্ভেজাল ভারতীয়—ঔপনিষদিক। অন্য ভাষায়, তিনি তাঁর নানা ঝংকৃত ভাষণের সূত্রে বহু বিচিত্র য়ুরোপীয় ভাবমুক্তামালা গাঁথলেও তাঁর যে-আন্তর ধ্যানসূত্রে

এ-রত্নহার গ্রথিত সে-সূত্রটি তিনি ভারতের ব্রহ্মবাদী ঋষিদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার-সূত্রে। তাই যাঁরা বলেন (অবশ্য তাঁদের স্বাধীন মত বলবার তাঁদের পূর্ণ অধিকার আছে) যে, রবীন্দ্রনাথ খতিয়ে য়ুরোপের মানসপুত্র, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সায় দিলে রবীন্দ্রনাথের আন্তর সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপটিই আমাদের অগোচর থেকে যাবে। যদি যায় তবে তাতে ক'রে সবচেয়ে বেশি লোকসান হবে তাঁদের যাঁরা—আমাদের মতন—আজো বিশ্বাস করেন যে, ভারতের গভীরতম বাণী সাহিত্যের নয়, শিল্পের নয়, বিজ্ঞানের নয়; ভারতের গভীরতম বাণী সর্বাস্তিবাদ ওরফে লীলাবাদ—অর্থাৎ ভগবান্ শুধু পারমার্থিক আশ্রয়দাতা নন, জীবনের প্রতিপদক্ষেপে তাঁর পায়ের তাল ছন্দিত, প্রতি রূপায়ণে তাঁর রূপের স্বীকৃতি অঙ্গীকৃত, প্রতি পার্থিব আনন্দবেদনায় তাঁর সেই দৈবী-চেতনা ঝংকৃত যাকে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বরণ করা হয়েছে:

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ (২।১৭)

রবীন্দ্রনাথের গভীরতম সত্তা ছিল এই আর্য বাণীরই একান্ত উপাসক, তাই না তিনি তাঁর নৈবেদ্যে এই শ্লোকটির পূর্ণ সমর্থক ভাষ্য দিয়েছেন এমন সহজ আনন্দে:

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে-বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

এই সুর শুধু যে তাঁর "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের প্রতি ভাষণের বাদী সুর ছিল তাই নয়—তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা গান প্রবন্ধের উপজীব্য। উপনিষদের

মহাবাণীর দীক্ষা পেয়েছিলেন তিনি যে ব্রহ্মবাদী পিতার কাছে যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল : "যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" তাই তো তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ "নৈবেদ্য" তিনি উৎসর্গ করেছিলেন পিতৃচরণে—যার রাগালাপ আদ্যন্ত আর্ষ ব্রহ্মবাদের সুরে বাঁধা। যথা শ্বেতাশ্বতর-এর—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

তথা শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

এ দুটি শ্লোকের ভাষ্য করেছেন কবি কী অপরূপ ভাবোচ্ছ্বাসে :

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্‌প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'

উদ্ধৃতি-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। তবু এ দুটি দৃষ্টান্ত দিলাম শুধু রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মার ভারতীয় আর্যত্বের দিকে বিশেষ ক'রে অধ্যাত্মসাধকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছি "শান্তিনিকেতন" থেকে এ-খণ্ডের শেষের দিকে।

এ-সূত্রে আর একটি কথা মনে পড়ে। আমার একটি বন্ধু একবার উগ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন যে তিনি পাশ্চাত্ত্য ঐহিকতার দিকে ঝুঁকছেন। আমি তাতে ব্যথিত হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দকে আমার আপত্তি জানাই যে রবীন্দ্রনাথের

মতন ভারত-আত্মার প্রতিভূ আমাদের কাছে নিত্য নমস্তই হওয়া উচিত। তাতে শ্রীঅরবিন্দ আমার মতে সায় দিয়ে লিখেছিলেন একটি চিঠি (অনামী):

"I don't think we should hastily conclude that Tagore's passing over to the opposite camp is a certitude...I don't see how he can turn his back on all the ideas of a life-time. After all, he has been a wayfarer towards the same goal as ours in his own way—that is the main thing, the exact stage of the advance and putting of the steps are minor matters."

(ভাষ্য: রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিপক্ষদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কে বলল ?··· সারাজীবনের ভাবধারাকে এককথায় বরখাস্ত করবেনই বা তিনি কী দুঃখে ? খতিয়ে, তিনিও তো আমাদেরি মতন তীর্থযাত্রী—হ'লই বা তাঁর ছন্দ আলাদা— লক্ষ্য তো একই। তিনি আমাদের সমানধর্মী এইটেই হ'ল আসল, কে কতটা এগুলো না এগুলো সে বিচারে কাজ কী ?)

আমার চিঠিতে আমি প্রসঙ্গতঃ আরো একটি তর্ক তুলেছিলাম। লিখেছিলাম: "রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা গান নিবন্ধাদির পিছনে অধ্যাত্ম আদর্শবাদ ও ভাগবতী প্রেরণা ছিল ব'লেই না তিনি ভারতীয় আত্মার দিব্যদর্শনের বাণীবাহ হ'তে পেরেছিলেন ? আবাল্য তাঁর মহাভাগ পিতার ব্রহ্মবাদী ভাবধারায় তাঁর মনপ্রাণ পুষ্টিলাভ ক'রে এসেছে ব'লেই তো তিনি এত অফুরন্ত প্রেরণা পেয়েছিলেন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর জীবনে রূপায়িত ক'রে তুলতে ? কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি গুণী ভাবুক রসিকেরা তাঁর এ-অধ্যাত্ম ভাবধারার উত্তরসাধক হ'তে না চেয়ে য়ুরোপের নাস্তিক বিজ্ঞান ও বন্ধ্যা যুক্তিবাদকেই মেনে নিলেন ব'লেই না রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্য আজ এমন দেউলে ! মহৎ বিশ্বাস শ্রদ্ধা বিনা কি বড় সৃষ্টি সম্ভব ?"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন (অনামী):

"As for your question, Tagore of course belonged to an age which had faith in its ideas and whose very denials were creative affirmations···Now all that idealism has been smashed to pieces by the immense adverse event and everybody is busy exposing its weaknesses —but nobody knows what to put in its place. A mixture of scepticism and slogans, 'Heil-Hitler' and the Fascist salute and Five-Year-Plan and the beating of everybody into one amorphous shape, a disabused denial of all ideals on one side and, on the other, a blind shut-my-eyes and shut-everybody's-eyes plunge into the bog in the hope of finding

some firm foundation—these will not carry us very far. And what else is there? Until new spiritual values are discovered no great enduring creation is possible."

(**ভাষ্য : রবীন্দ্রনাথের যুগের মানুষ ছিল তদানীন্তন ভাবাদর্শে শ্রদ্ধাশীল, তাই সে-যুগে নানা অস্বীকারও পত্তন করেছিল নবসৃষ্টির অঙ্গীকারের। এখন সে-সব ভাবাদর্শই চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, ফলে সকলেই উজিয়ে উঠেছেন তাদের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি উদ্‌ঘাটন করতে। কিন্তু কেউই নির্দেশ দিতে পারছেন না হৃতবিগ্রহ বেদীতে বসাবেন কোন্ নব আদর্শকে। সন্দেহ ও বুলি, 'হাইল-হিটলার' ও ফাশিস্ত কুর্নিশ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সবাইকেই গুঁড়িয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার নিরবয়ব রূপ দেওয়া—একদিকে স্বপ্নভঙ্গের পরে সব অতীত আদর্শকে হারিয়ে দেউলে হওয়া, অন্যদিকে সবাই মিলে একজোটে জয়ধ্বনি ক'রে চোখ বুঁজে নাস্তিক দ-য়ে ঝাঁপ দেওয়া—যদি কোনো পাকা ভিৎ মেলে এই দুরাশায়—ততঃ কিম্? এই জাতীয় দুরাচার মতিগতির তাল পাকিয়ে মিলবে কোন্ মহাসিদ্ধির পরমপিণ্ড? অথচ আর কীই বা আছে যাকে খুঁটি করা চলে? কোনো স্থায়ী মহৎ সৃষ্টিই গ'ড়ে উঠতে পারে না—যদি না তার বনেদ হয় কোনো নব আধ্যাত্মিক ইষ্টার্থ।"**)

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম দৃষ্টি তথা ভাবধারা থেকে আমাদের সকলেরই অঢেল লাভ করবার আছে এই কথাটির উপর জোর দিতেই শ্রীঅরবিন্দের গভীর বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করলাম—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, দিন দিন দেখি তরুণদের মধ্যেও ভারতীয় আত্মিক-সত্যে অশ্রদ্ধা ও পাশ্চাত্যের নির্লক্ষ্য গতিবাদী বৈজ্ঞানিকতায় গদ্‌গদ ভক্তি ফেঁপে উঠছে। এই ধরণের ভ্রান্ত মতিগতির ফলেই য়ুরোপ আজ ধ্বংস পথের যাত্রী—একথা রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অক্লান্তভাবে ঘোষণা ক'রে এসেছেন তাঁর আস্তিক শ্রদ্ধার অফুরন্ত প্রেরণায়। এ-খণ্ডে আমি রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম বাণীবাহ রূপের 'পরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি আরো এই জন্যে যে অশ্রদ্ধার আত্মঘাতী বিষের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক সেই সব মহাজনের কথামৃত যাঁরা এ-যুগেও ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিক ইষ্টার্থে শ্রদ্ধাশীল ও ভারতীয় আত্মদর্শনেরই উদ্‌গাতা—যথা, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীমৎ অনির্বাণ প্রভৃতি। চতুর্থ পর্ব যদি কখনো লিখি তবে আরো দুজন মহাপুরুষের কথা লিখব যাঁদের দেখে ধন্য হয়েছি—শ্রীরমণ মহর্ষি ও শ্রীরামদাস।

এ-বিংশ শতকে ভারতীয় অধ্যাত্ম সত্যের যে-কয়জন মহাপুরোহিত তাঁদের অনন্যতন্ত্র ভঙ্গিতে আমাদের কাছে চিরন্তনের স্তবগান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে পুরোধা এ-যুগে দুজন মহাত্মা : শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, আর তার একটি কারণ—এঁরা দুজনেই ছিলেন শুধু যে জ্ঞানী তাই নয়, তার উপর মহামনীষী ও মহাকবি। তাইতো এঁরা দুজনে পরস্পরকে আত্মার আত্মীয় তথা সতীর্থ ব'লে এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'পরে শ্রীঅরবিন্দের দরদ ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তার পরিচয় দিতে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি—আরো একটু দিলে ক্ষতি কি? আমি শ্রীঅরবিন্দকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: রবীন্দ্রনাথকে আগামী যুগের বিজ্ঞানমুগ্ধ বস্তুবাদীরা কী ভাবে গ্রহণ করবেন? (ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে ছোট করবার যে-চেষ্টা সুরু হয়েছে তাতে মনে পড়ে আরো শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী।) তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঐ চিঠিতেই (অনামী):

"His exact position as a poet or a prophet or anything else will be assigned by posterity and we need not be in haste to anticipate the final verdict. The immediate verdict after his departure, or soon after it, may very well be a rough one, for this is a generation that seems to take a delight in trampling with an almost Nazi rudeness on the bodies of its ancestors, especially the immediate ancestors. I have read with an interested surprise that Napoleon was only a bustling and self-important nincompoop all of whose great achievements were done by others; that Shakespeare was 'no great things', and that most other great men were by no means so great as the stupid respect and reverence of past ignorant ages made them out to be! What chance has then Tagore?"

(ভাষ্য: রবীন্দ্রনাথ কবি নবি বা আরো অনেক কিছু হিসেবে ঠিক কোন্ সিদ্ধির ভূমিকায় স্থায়ী আসন পাবার দাবি করতে পারেন সে-সম্বন্ধে আমাদের উত্তরসূরীরা রায় দেবেন যথাকালে—কাজেই সে-বিচার এখন মুলতুবি থাক। আমার শুধু মনে হয় যে তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরেকার রায় কঠোর হবার সম্ভাবনাই সমূহ, কেন না এ-যুগের বলিষ্ঠ সন্তানেরা খানিকটা কর্কশ নাজিদের মতনই উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন দেখতে পাই যখন তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের দেহ মাড়িয়ে জয়যাত্রা করেন সিংহনাদে—বিশেষ ক'রে পিতৃপিতামহের দেহ। আমাকে একটু চমকেই উঠতে হয়েছে শুনে যে, নেপোলিয়নও ছিলেন না কি একজন বাজে

পায়াভারি মূর্খ—যিনি অপরের কীর্তিকেই নিজের ব'লে চালিয়ে বড় হয়েছেন; শেক্ষপীয়রও নাকি এমন কিছু আহামরি কবি ছিলেন না—শুধু তদানীন্তন অজ্ঞান আবহে অর্বাচীনদের অতিভক্তির দরুণই না কি তাঁর এত নাম ডাক! অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আশা কোথায় বলো?)

এ-যুগের বুদ্ধিমন্তেরা অশ্রদ্ধাকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করতে চান—শ্রীঅরবিন্দের এ-বিশ্লেষণ যে সত্যভিত্তিক একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তিনি তাই ব'লে নিরাশাবাদী ছিলেন না—তাঁর মতন পরম ভাগবত কেমন ক'রে বলবেন অসুরের হাতে দেবতার চরম পরাজয় হ'তে পারে? "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" (সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়) একথা তিনি অগুন্তিবার বলেছেন তাঁর জীবন-দর্শনে তথা মহাকাব্য সাবিত্রীতে। তাই তিনি এই পত্রেই লিখেছিলেন শেষে যে আগামিক যুগে রবীন্দ্রনাথের 'পরে খানিকটা অবিচার হ'লেও শেষে তিনি সুবিচার পাবেনই পাবেন, কেন না "these injustices of the moment do not endure—in the end a wise and fair estimate is formed and survives the changes of time."

কালের অন্তিম রায় সম্বন্ধে তিনি আমার আরো অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর নানা ভাবগভীর পত্রে—তাদের মধ্যে একটিতে তিনি এই মন্তব্যটিকে আরো প্রাঞ্জল ক'রে বলেছিলেন। নানা পাশ্চাত্য কবির বিরুদ্ধে নানা সময়ে নানা সমালোচকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের উল্লেখ ক'রে আমাকে লিখেছিলেন যে, এসবই রুচি-র ক্ষণিক বুদ্বুদলীলা—ফোলে শুধু ফেটে পড়তেই, হাঁকডাক করে শুধু নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যেতেই মানুষের চিত্তলোকে একটি দাগও না কেটে—সত্যের পরাজয় মধ্যপথে হ'লেও শেষরক্ষা না হ'য়েই পারে না, তাই ক্ষণমুখরেরা তাদের রোখালো হাঁকডাকে খানিকক্ষণ আসর জমালেও শেষে—"...the world either refuses to listen or there is a temporary effect, a brief fashion in literary criticism, but finally the world returns to its established verdict. Lesser reputations may fluctuate, but finally whatever has real value in its own kind settles itself and finds its just place in the durable judgment of the world." (Letters Vol. 3, p. 274)

(জগৎ হয় তাদের কথায় কান দেয় না, না হয় তাদের খানিকটা সাময়িক প্রতিপত্তির পরে—বা সাহিত্যবিচারে কোনো ক্ষণায়ু ফ্যাশনের প্রবর্তনের অন্তে

শেষমেশ মানুষ তার সুবুদ্ধির নিত্যসিদ্ধ রায়েই ফিরে আসে। যে-সব কীর্তি তেমন মহৎ নয় তাদের স্বীকৃতির ঢেউয়ে জোয়ার-ভাঁটা আসতে পারে, কিন্তু যথাকালে প্রতি প্রতিভার দানেরই যথার্থ মূল্যায়ন হয়ই হয়—যার পরে প্রবুদ্ধদের সে-বিচার আর পাল্টানো যায় না।)

গুরুদেবের এই রায় যুক্তির দিক দিয়ে অকাট্য। তাই নির্ভয়েই এ-ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে সময়ে সময়ে মানুষের রুচির তথা মতিগতির নানা শোচনীয় অবনতি হ'লেও শেষে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের কাছে অর্ঘ্য পাবেনই পাবেন শুধু কবি ও সাহিত্যিক ব'লেই নয়—আর্ষ ভারতের ধ্যানদৃষ্টির একজন প্রধান বাণীবাহ ব'লেও বটে। ইতি।

লক্ষ্মী পূর্ণিমা, ১৩৬৮
২৩. ১০. ১৯৬১

শ্রীদিলীপকুমার রায়
হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুনা-৫

এক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা প্রথম শুনি তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্যের মুখে ১৯১১ কি ১৯১২ সালে। প্রমথবাবু ছিলেন ইভনিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা—পিতৃদেবকে তিনিই নাছোড়বন্দ হ'য়ে এ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত করেন। এ-সান্ধ্য ক্লাবের তিনি বিধাতা না হোন হর্তা তথা কর্তা ছিলেন তো বটেই। শুধু প্রাণবন্ত নয়—সর্বপ্রিয়। তাঁর শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা আজো যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাই। পিতৃদেব তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'অজাতশত্রু'। কে না করত তাঁর গুণাবলীর গুণগান, তৎপরতার তারিফ? এ হেন সর্বজনাদৃত মানুষটি স্বভাবত: মঞ্জুবাক্ হ'লেও একটিমাত্র ক্ষেত্রে দেখতে দেখতে হ'য়ে উঠতেন শুধু স্পষ্টবক্তা না—পরুষভাষী: অর্থাৎ যেম্‌নি কেউ তাঁর "ন্যাড়ার" (শরৎচন্দ্রের ডাকনাম) সঙ্গে আর কোন সাহিত্যিকের তুলনা করত। একদিনের কথা মনে পড়ে: শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্পের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করেন। প্রমথবাবু অমনি বলেন: "হ্যাঁ জোনাকি বটে, কিন্তু আমাদের 'ন্যাড়া'-র উদয় হ'লে শুধু মিটমিটই করবে, আলো দেবে না আর।" সুরেশবাবু কী যেন বলেন প্রভাতবাবুর স্বপক্ষে মনে নেই—সঙ্গে সঙ্গে প্রমথবাবু আরো উদ্দীপ্ত হ'য়ে বললেন, "ধেৎ, ন্যাড়া যদি তার গল্প দুচারটে প্রকাশ করে তবে প্রভাত দুপুর বিকেল সবারই অন্ন মারা যাবে।"

পিতৃদেব হেসে বললেন: "বলো কি হে প্রমথ? চাটুজ্জের পো কি না মুখুজ্জের পো-র বাড়াভাতে ছাই দেবে?"

প্রমথবাবু (হেসে): না দ্বিজদা, সে ভয় নেই। ন্যাড়া যে স্বভাবে দারুণ নির্বিবাদী, ফোঁস করতে জানে না। নৈলে ও যে জাতসাপ একবার চক্র ধরলে রাজ্যির ডঁ্যাপেরা মিইয়ে যেত। মুখুজ্জের পো কী বলছেন? ন্যাড়া কলম ধরলে রাজচক্রবর্তীদের শ্বশুরের পো-রাও ডুববে, লিখে রাখুন।

সে-সময়ে আমি প্রভাতবাবুর মহাভক্ত। তাছাড়া সবাই জানে—যেমন নম্রতা জাগায় নম্রতা, তেম্‌নি রোখ জাগায় রোখ। সুতরাং আমিও যে রুখে উঠব এ আর বিচিত্র কি? বললাম: "কী যে যা তা বলেন প্রমথবাবু! প্রভাতবাবু ডঁ্যাপ—শ্বশুরের পো? পড়েছেন ওঁর বলবান্ জামাতা?"

প্রমথবাবু (উষ্ণ): ঢের ঢের কুস্তিগির দাদাশ্বশুর দেখেছি হে—স্যাড়ার কাছে কারুর ফুটুনিই চলবে না ব'লে দিলাম।

আমি (উষ্ণ): আপনি যা ইচ্ছে ব'লে দিতে পারেন, কিন্তু প্রভাতবাবু তাতে ব্যাড়ি গিয়ে ম'রে থাকবেন না—এ-ও আমি ব'লে দিলাম।

প্রমথবাবু ছিলেন তরুণ, তাই তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি হ'লে মুখ সামলে কথা কইতাম না—আরো এই জন্যে যে তাঁর স্বভাব ছিল গঙ্গাজলের মতন—কোনো তাপই টিঁকত না সেখানে।

এমন সময় যমুনা পত্রিকায় বেরুল—বোধ হয় ১৯১৩ সালে—প্রমথবাবুর "স্যাড়ার" গল্প "রামের সুমতি"। পড়তে পড়তে চোখের জলে হরফ ঝাপসা হ'য়ে আসত—স্পষ্ট মনে আছে। কই এ রকম গল্প তো কস্মিনকালেও পড়িনি! না আছে তরুণ-তরুণীর উচ্ছ্বাস, না পুলিশ গোয়েন্দার তর্জন, না জগৎ সিং ওশমানের বিতণ্ডা। শুধু মাতৃকল্পা বৌদির স্নেহ ও এক ডানপিটে ছেলের কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলাদা। কিন্তু আমরা বঙ্কিমচন্দ্র প'ড়ে শেষ ক'রে ব'নেছিলাম আধুনিক পাঠক, পড়তাম মহোৎসাহে প্রধানতঃ তিনজন লেখকের উপন্যাস—রোমহর্ষক রোমান্সের পরাকাষ্ঠা ব'লে: পাঁচকড়ি দে, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রভাতবাবু উদয় হন এঁদের পরে এবং উদয় হ'তে না হ'তে এ-খ্যাতনামা ত্রয়ী পাণ্ডুর হ'য়ে গিয়েছিলেন। প্রভাতবাবুর নানা গল্প মাসিক পত্রিকায় তথা পুস্তকাকারে প'ড়ে মনে হ'ত—এমন গল্প কেউ কোনোদিন লেখেনি, লিখবে না, এবং বলা বাহুল্য এ-ঘোর মত প্রকাশ করতাম সদাপটেই—ত্রিকালদর্শীর অভ্রান্ত ঢঙে।

এহেন প্রভাতবাবুর কান্ত স্বর্ণরশ্মিকে কিনা শরৎচন্দ্রের সান্ধ্য জ্যোৎস্না এক-মুহূর্তে দুয়ো দিল! পিতৃদেবও মুগ্ধ হয়েছিলেন—বিশেষ ক'রে দুর্দান্ত রামকে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে নারায়ণীর একের পর এক বেত মারা আর রামের পালাতে পালাতে কান্না। বেশ মনে আছে তাঁর একটি উক্তি: "একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ড্রামা হে প্রমথ! লোকটিকে দেখতে ইচ্ছা হয়।" মস্ত নাট্যকার তো—কাজেই সব প্রথম এর নাটকীয় রসই যে তাঁর মন টানবে এ আর বিচিত্র কি! আরো মনে পড়ে আমার বোন মায়াকে তাঁর জিজ্ঞাসা করা: "কেমন লাগল রে রামের সুমতি?" মায়া বলেছিল—মেয়েছেলে তো—"বেশ ভালো, বাবা!" পিতৃদেব হেসে বলেছিলেন: "বেশ ভালো কিরে? বল্ চমৎকার!" স্পষ্ট মনে আছে কারণ আমার মনকে তখন শরৎকৌমুদীর নেশায় পেয়ে বসেছে—আমি এক মুহূর্তে প্রভাতবাবুকে ছেড়ে হয়ে

উঠেছি শরৎবাবুর পাণ্ডা। কৈশোর স্বভাবে ডিস্‌লয়াল, কে না জানে? অথ দিলীপ-প্রমথ-সংবাদ—যথাকালে।

প্রমথবাবু (বিজ্ঞভাবে): কী হে মণ্টু? কেমন লাগল ন্যাড়ার রামের সুমতি? প্রভাতবাবুর কম্ম এরকম লেখা?

আমি (অধোবদন—অথচ পুলকিত): তিনি বর্মায় থাকেন কেন প্রমথবাবু?

প্রমথবাবু: সে এক পাগল। নৈলে এমন দুর্মতি হয়? অজ পাড়াগাঁরও বাড়া—বর্মা—বর্মা মণ্টু—দুঃখের কথা বলব কি? রেঙ্গুন।

আমি: সে কি? রেঙ্গুন শুনেছি প্রকাণ্ড শহর—আমাদের কলকাতার চেয়েও বড়?

প্রমথবাবু (না দ'মে): আহা বড় হ'লে কি পাড়াগাঁ হয় না? সুন্দরবনও তো কলকাতার চেয়ে বড়—তাই ব'লে কি সেটা ইডেন গার্ডেন?

আমি (হেসে): তা না হয় হ'ল—কিন্তু রেঙ্গুনের 'পরে আপনার এত আক্রোশ কেন?

প্রমথবাবু: আক্রোশ কেন হ'তে যাবে?—তবে রেঙ্গুনের কথা ভাবতেই আমার গার মধ্যে শিরশির্ ক'রে ওঠে। আর সেখানে মানুষ নাপ্পি খায় মণ্টু—নাপ্পি নাপ্পি—জলজ্যান্ত পচা মাছ—দুর্গন্ধে ভূত পালায়। শুধু কি তাই? এহেন কিষ্কিন্ধ্যায় ব'সে ন্যাড়া শুধু যত রাজ্যের বই পড়বে। আর পড়ছে তো পড়ছেই। আমি ওকে কত লিখি—'ওরে ন্যাড়া, অত বই প'ড়ে হবে কী, তুই কলম ধর্‌রে কলম ধর!' হায় হায়, ও কি শুনবার পাত্র? শুধু বই মুখে ক'রেই আছে। আর আফিং। আর—আজকাল ওকে আবার আর এক ভূতে পেয়েছে—ছবি আঁকা।

আমি: ছবি আঁকা? বলেন কি!

প্রমথবাবু: আর বলি কি মণ্টু—বলি মতিচ্ছন্ন, বলি ভূতে পাওয়া। এছাড়া আর কিছু বলবার কি আর ও পথ রেখেছে? আমি ওকে কত তুতিয়ে পাতিয়ে কলকাতায় টেনে আনতে চাই, কিন্তু বলে না:

অবুঝকে বোঝাবো কত—বোঝ সে কি মানে?
ঢেঁকিকে বোঝাবো কত নিত্যি ধান ভানে।

প্রমথবাবুর কথার ভঙ্গি ছিল এই ধরনের—একবার শুরু করলে তাঁকে থামানো হ'ত দায়। তাই তো তাঁর কাছে শরৎদার নাড়ীনক্ষত্র জেনে নিয়েছিলাম সে কবে: কোথায় ভাগলপুরে ওঁদের গল্পচক্র ছিল, সেখানে ন্যাড়া গল্প লিখে

শোনাত আর সবাইকে—কোথায় নিভৃত রাতে হ্যাড়া ডিঙি ক'রে গঙ্গায় হ'ত উধাও বাউণ্ডুলেদের সঙ্গে—গান গাইত অ্যাক্টো করত, নেশাপত্রও বাদ যেত না, এমন কি দু দুবার সন্ন্যিসী পর্যন্ত হয়েছিল···এই ধরনের সে কি একটা কথা?—যাকে বলে ইতিহাস।

এর আগে তাঁর গল্প "বড়দিদি" বেরিয়েছিল ভারতীতে যদিও আমি পড়ি অনেক পরে—যখন বই হ'য়ে বেরোয়। কিন্তু তার আগে তাঁর আরো অনেক গল্পই বেরিয়ে গেছে, সাহিত্যিক মহলে সাড়া পড়ে গেছে—বিশেষ ক'রে তাঁর "চরিত্রহীন" উপন্যাসে।

ঠিক মনে নেই কোন্‌টার পর তাঁর কোন্ গল্প পড়েছিলাম, তবে এ-কথা হলপ ক'রে বলতে পারি যে যাই পড়তাম মনে হ'ত—অপূর্ব! প্রমথবাবুর হ্যাড়া হয়ে দাঁড়ালেন বটে যুগপ্রবর্তক লেখক! না মেনে উপায় কি?

কিন্তু "চরিত্রহীন" মাসিকের পৃষ্ঠায় প্রকাশ হ'তে না হ'তে একদল লোক পঞ্চমুখে তাঁর দুর্নাম রটাতে লাগল। আমার মন তখন পুরোপুরি শরৎপূজারী—কাজেই আমি ক্ষুণ্ণ হলাম বৈকি। কিন্তু মজা এই যে তাঁর দুর্নাম শুনতে না শুনতে আমার বালক-মন যেন আরো রুখে উঠে 'হিরো'-তন্ময় হয়ে উঠল। কেবলই মনে হ'ত: "আহা! কেন তিনি বিদেশে বিভুঁয়ে প'ড়ে থাকেন—যেখানে লোকে নাপ্পি খায়? কেন আসেন না কলকাতায়?"

এইভাবে কয়েক বৎসর কাটার পর হঠাৎ একদিন গুরুদাস লাইব্রেরিতে পিতৃবন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনলাম যে শরৎবাবু রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় এসেই বসবাস করবেন—যাকে বলে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা। পিতৃদেবের লোকান্তরের তিন চার বৎসর পরের ঘটনা এ—না, ঘটনা নয়—অঘটন!

রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না। কবে আসবেন, কবে আসবেন—সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অপরূপ গল্পগন্ধর্ব? কবে চাঁদ আসবে হাতে? দিন গুনতে শুরু ক'রলাম সত্যিই।

শুভদৃষ্টি হ'ল, কিন্তু অতি গদ্যময় পরিবেশে—গুরুদাস লাইব্রেরির উপর তলার একটি ছোট কক্ষে—স্পষ্ট মনে আছে। চারদিকে বই, মাঝখানে ব'সে একটি মানুষ—শ্যামবর্ণ, ছাগলদাড়ি, একহারা—কেবল কী তীক্ষ্ণ চোখ দুটি, আর কী টিকোলো নাক? সে-সময়ে সত্যিই তাঁর চেহারার মধ্যে সে-জৌলুস একদম ছিল না—যা পরে ফুটেছিল কলকাতার জলহাওয়ায়।

আমি প্রণাম করতে ভুলে গিয়ে থতমত খেয়ে বললাম : "আপনি…"

শরৎচন্দ্র (হেসে) : হ্যাঁ হে—শরৎচন্দ্র নির্ভেজাল। (আমার পিঠে হাত বুলিয়ে) বড় ঘা খেয়েছ, না মণ্টু! ভেবেছিলে আমার রাজপুত্রের মতন চেহারা —না?

আমি (লজ্জা পেয়ে প্রণাম ক'রে) : না না! তা নয়, তবে…

শরৎচন্দ্র : যেতে দাও। হরিদাস আমাকে বলেছে তোমার কথা—প্রমথও লিখত তোমার সুবুদ্ধির কথা। কিন্তু মনে রেখো মণ্টু, ফ্যাকাশে সুবোধ বালক হ'লে তোমার চলবে না—তোমাকে মনে রাখতে হবে সব আগে—তুমি কত বড় বাপের ছেলে—আর তারপরে হ'তে হবে বাপকা বেটা, কেমন?

এই কয়টি কথায়ই তিনি আমার কিশোর চিত্ত জয় ক'রে নিয়েছিলেন সেই প্রথম দিনেই। না নেবেন কেন? একে তিনি রামের সুমতি, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীনের লেখক, তার উপরে পিতৃদেবের অনুরাগী। তাছাড়া আমার গানও তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছিল—বিশেষ ক'রে পিতৃদেবের কীর্তনাঙ্গ গান। হিন্দুস্থানি ঢঙের গান তিনি তেমন পছন্দ করতেন না—কিন্তু আমার মুখে পিতৃদেবের "ও যে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়" বার বার শুনেও যেন তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। বলতেন—"গাও মণ্টু ফের ঐ চরণটি : 'সে যে দেবতা ভিখারি মানবদুয়ারে দেখে যারে তোরা দেখে যা!' আহা! তোমার বাবা শুধু কবি ছিলেন না মণ্টু, ছিলেন ভক্ত, নৈলে এ লেখা বেরুত না—বলে দিলাম তোমাকে।" প্রায়ই বলতেন তিনি একটি কথা : "আহা তিনি আজ বেঁচে থাকলে এমন আরো কত কীর্তনই লিখতেন!" তাঁর আর একটি প্রিয় কীর্তন ছিল—পিতৃদেবের চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত—

"আর কেন মিছে আশা মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা?
সে যে সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ আমি তো তাহারে পাব না।"

তিনি গান গাইতেও পারতেন, যদিও বড় গায়ক বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। কিন্তু গানের প্রাণের কথাটি যে ভাব তা তিনি জানতেন ব'লে আরো তাঁর সঙ্গে আমার মিলেছিল। একদিকে তিনি আমার গান শুনে তৃপ্তি পেতেন, অন্যদিকে তিনি যে আমার গান শুনে খুশি হচ্ছেন এতে আমি আনন্দ রাখবার জায়গা পেতাম না।

এমনি ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় প্রীতি, সঙ্গীত ও সাহিত্যের মাধ্যমে। এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে এবার নারায়ণং নমস্কৃত্য পালাগান শুরু করি।

শরৎদার সম্বন্ধে প্রথম যে-স্মৃতিটি আজ উজ্জ্বল হ'য়ে আছে সে হল তাঁর গল্পবলার একটি বিশেষ ভঙ্গি। কথা বলার ভঙ্গিতে অবশ্য প্রত্যেক মানুষই অনন্যতন্ত্র কিন্তু শরৎদার বলার ধরন মনে হ'ত যেন বিশেষ ক'রেই অনন্যতন্ত্র এবং যদি বলি গুড় গুড় ক'রে তামাক খাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহলে হয়ত বর্ণনাটা খুব ভুল হবে না। গল্প বলতে বলতে তাঁর চোখের দৃষ্টি কখনো বা হ'য়ে উঠত প্রখর, কখনো কোমল। প্রখর হ'ত যখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকদের লক্ষ্য ক'রে তীরন্দাজি করতেন, কোমল হ'ত যখন দুঃস্থ মানুষ বা পতিতা রমণীর নারীত্বের স্বপক্ষে নানা দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর একটি প্রিয় প্রতিপাদ্যকে খাড়া করে ধরতেন: যে, মানুষকে অপমান করতে নেই। এ সম্বন্ধে পরে বলছি যা মনে আছে —মনে রাখবার মত কথা বৈ কি—কিন্তু আগে আমার শুরু-করা বক্তব্যটি সারা হোক।

দোসরা নম্বর: তাঁর শোনার ভঙ্গি। এ-সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে ভালো বক্তা বা কথক বলার ঝোঁকে ভুলে যান যে অপরকেও কিছু বলতে দেওয়াই আলাপের আর্ট। একতরফা গল্প হাজার সরস হ'লেও হয়ে দাঁড়ায় যেন মঞ্চে আসীন বক্তার লেকচারের মতন। বিখ্যাত চারুচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই জাতীয় কথক—তাঁর কথার তোড়ের সামনে কার সাধ্য একটি কথাও পেশ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: "তুমি গল্প জমাতে পারো।" অপ্রতিবাদ্য, কিন্তু মুশকিল এই যে, এরকম কথকের কাছে শ্রোতা আসে একবার দুবার বড়জোর তিনবার—তারপর নিজে কিছুই বলতে না পেয়ে ঘরের ছেলে সেই যে ঘরে ফিরে যায় আর ও-মুখো হয় না। পণ্ডিচেরিতে তাই আমরা অনেকেই চারুচন্দ্রের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। চারুচন্দ্রের দোষ ছিল না। তিনি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, বটেই তো। কিন্তু আমার বক্তব্য যে তিনি ছিলেন না শরৎচন্দ্র—যিনি যুগপৎ কথাকুশলী তথা শ্রবণোৎসুক—যিনি অপর পক্ষের প্রতি কথাটি শুনতেন—না ঠিক বলা হল না—শুষে নিতেন উৎকর্ণ হয়ে। সে একটা দেখবার মতন কৃতিত্ব, অনুকরণীয় কীর্তি। কী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা: তারপর? হ্যাঁ···কিন্তু ঐ যে বললে···বটে তবু মনে হয় মণ্টু যে এর পরে আরো আছে—আমি চাই সেইটুকু শুনতে।" মনে পড়ত কেবলই চরিতামৃতের "এহ বাহ্য আগে কহ আর"—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

একথা আরো মনে পড়ে একটি বিশেষ কারণে: তিনি প্রথম প্রথম ক্রমাগতই

আমাকে শুধাতেন পিতৃদেবের কথা—তিনি কী ভাবে হাসতেন, গল্প জমাতেন ঠাট্টা তামাসা করতেন, গাইতেন, গান বাঁধতেন, সুর দিতেন, আশ্রিতদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন···ইত্যাদি অফুরন্ত প্রশ্ন! ফলে যা হবার—হিন্দিতে বলে "জো হোনী থী সো হোঈ"—কিনা পিতৃদেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে আমার কিশোর মন দেখতে দেখতে উঠল আরো উজিয়ে। অবশ্য পিতৃদেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় আমি অনেক আগেই পেয়েছিলাম প্রমথবাবুর কাছে—যখন তিনি শরৎবাবুর নানা চিঠি আমাকে দেখাতেন। সে-সব চিঠির ছত্রে ছত্রে পরিচয় পাওয়া যায় শরৎবাবু সাহিত্যিক হিসাবে পিতৃদেবকে কী চোখে দেখতেন। বহু বৎসর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে ফের নতুন ক'রে পড়ি তাঁর দ্বিজেন্দ্র-প্রশস্তি, যথা:

"ইভনিং ক্লাবের সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। কাছে থাকিলে দ্বিজুবাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আসিতাম"······(জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

"দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ রেঙ্গুন গেজেটে পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।··· সত্যই তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না।···সারদা মিত্র কি করিবেন? তিনি ভালো জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক।···সাহিত্য পরিষদের মোড়ল হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর।" (২৪ মে, ১৯১৩)

"দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ (ভারতবর্ষ)···আর কেউ চালাতে পারবেন না।···দ্বিজুবাবু আবশ্যক হ'লে ও কাগজ প্রায় একাই ভরিয়ে দিতে পারতেন। প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, কালিদাস ভবভূতির সমালোচনার ম'ত সমালোচনায় যেমন করে হোক আবশ্যক হ'লে চালিয়ে দিতে পারতেনই— একি আর কারো কাজ?" (৩১ মে, ১৯১৩)

উদ্ধৃতিগুলি দিলাম এই কথাটি আরো সজোরে পেশ করতে যে এ-চিঠিগুলি যখন প্রমথবাবু সহাস্যে ও সগর্বে আমাকে শোনাতেন তখন থেকেই আমার মন ভিজে উঠেছিল—সাধ জেগেছিল একদিন পিতৃদেবের বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করব। এক কথায় আমার বালক মনেই শরৎশ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হয়েছিল যা উত্তরকালে আনন্দমহীরুহে পরিণত হয়েছিল—তাঁকে দেখে আনন্দ, তাঁর কথা শুনে আনন্দ, সর্বোপরি তাঁর লেখা পড়ে আনন্দ! অবশ্য বয়েসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হ'ত বৈকি—যার ফলে বুঝতাম তাঁর স্বধর্ম এক আমার স্বধর্ম আর। কিন্তু এজন্যে সময়ে সময়ে

ব্যথা বাজলেও তিনি কোনোদিন ভুলেও আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত করেন নি, বা আমি কোনোদিন তাঁর মতামতের প্রতিবাদেও ঝোঁকের মাথায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিনি।

ফলে আমার প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ ও তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ আলোকলোকে কোনোদিনো মনান্তরের মেঘলা ছায়া এসে হানা দেয় নি। তাছাড়া আমার নিজের অযোগ্যতার জন্যেই আরো আমার কাছে মূল্যবান হ'য়ে উঠেছিল তাঁর নিবিড় দরদী স্নেহ—মনে হ'ত এ-হেন স্নেহ যেন বিধাতার কৃপার মতই অহেতুক দান, অযাচিত বর। নৈলে আমার কাঁচা লেখাও তিনি অত মন দিয়ে পড়বেন কেন—আমার সাহিত্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে অমন কৃতনিশ্চয় হবেন কেন—ছত্রে ছত্রে আমাকে তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছল স্নেহ জানিয়ে উৎফুল্ল তথা ধন্য করবেন কেন?

তাঁর সম্বন্ধে কত স্মৃতিই ভিড় করে আসে—আলোর পর আলো, ছবির পর ছবি! কত রাতেই যে তাঁকে স্বপ্নে নিবেদন করেছি আমার নাবালক তথা সাবালক হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি—অনুরাগের অর্ঘ! কতবারই তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করবার সময়ে শিউরে উঠেছি—তাঁর স্নেহস্পর্শে আমার কিশোর চিত্তের কত আনন্দফুলই যে দল মেলেছে উছল কৃতজ্ঞতায়। সব সত্য দানই যে আমাদের মনকে উর্বর ক'রে রেখে যায় একথা তাঁর নানা স্নেহের ও উপদেশের আলোয় বারবারই যেন নতুন করে প্রত্যক্ষ করেছি—কিন্তু উচ্ছ্বাস রেখে আগে স্মৃতির নৈবেদ্য সাজাবার চেষ্টা করি তাঁর তর্পণে। আগেকার মতনই ছক না কেটে লিখে যাই কলমের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে। যে-মানুষটি ছিলেন চিরদিনই স্বভাবে অনাড়ম্বর তাঁর তর্পণ অনাড়ম্বর ঢঙে করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম দিকে গুরুদাস লাইব্রেরিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। তারপর নানা সময়ে নানা স্থানে। কখনো আমার মাতুলালয়ে—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। আমি সেখানে জন্মেছিলাম শুনবামাত্র তিনি কৌতূহলী হয়ে বলেন মনে আছে: "বটে! কোন্ ঘরে মণ্টু?"

সেই ঘরে তাঁকে নিয়ে যেতেই তিনি একটি কথা বলে আমাকে রোমাঞ্চিত করেছিলেন—সে কি ভুলবার?—"আমি চাই মণ্টু, যে পরে একদিন এই ঘরটি আরো অনেকে দেখতে আসবে।"

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে বলি, "কী যে বলেন!"...ইত্যাদি। তবে সলজ্জে স্বীকার

করছি—ঠিক বৈষ্ণব বিনয়ের কায়দায় পেশ করতে পারিনি আমার "অধমতা" কারণ আমার কিশোর মনে জল্পনা-কল্পনা জাগত বরাবরই: বড় আমাকে হ'তেই হবে—মানে, যাকে বলে সত্যি বড়—অর্থাৎ কীর্তিতে বড়—ধনে মানে বংশ-গৌরবে নয়। মহাভারতে কর্ণের একটি উক্তি পিতৃদেব প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন আমার মনে লেগেছিল বাল্যকালেই: "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।" মনে হ'ত পুরুষ হ'য়েও পৌরুষের কীর্তিতে যে দেউলে তার চেয়ে দুর্ভাগা কে।

একটা ক্ষোভ বরাবরই আমার মনে খচ খচ করে বাজত: যে যারাই আমাকে দেখে তারাই আমার পরিচয় দেয় ডি এল রায়ের ছেলে ব'লে। প্রথম সুভাষ আমাকে স্বকীর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার দিকে প্রেরণা দেয়, তারপর আমাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপিত করেন এই বিচিত্র মানুষটি। আমার মধ্যে তিনি কী দেখেছিলেন কেমন ক'রে বলব? তবে এটুকু নিশ্চয় যে কিছু যদি না দেখতেন তবে আমার বালক চিত্তের মতামত ও যৌবনের রচনা তিনি কখনই এমন সহজ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারতেন না। একথা আমি বলছি সূক্ষ্মভাবে আত্মগুণগান করতে নয়—শুধু এই কথাটি জানাতে যে আমাদের তরুণ মন যখন একটুখানি স্বীকৃতির জন্যে লালায়িত থাকে ও না পেয়ে বার বার ঘা খায় তখন যে দুচারজন দরদী আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করেন তাঁদের কাছে আমাদের ব্যক্তিরূপ বিকাশের প্রত্যক্ষ খোরাক পায়। অন্তত আমি শরৎদার দরদকে এইভাবেই বরণ করেছিলাম আমার সাহিত্যের তথা চিন্তার বিকাশের অন্যতম দিশারি ব'লে। দিশারি বলছি এইজন্যে যে তাঁর কাছ থেকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা না পেলেও সৃষ্টি কোন্ পথে সার্থক হয় সে-সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ নির্দেশই পেতাম। না, আরো বলা চলে। তাঁর উৎসাহ পেয়ে তবেই আমার মনে এ-আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয় যে শিল্প-সৃষ্টি আমার পক্ষে পরধর্ম নয়, যেহেতু আমি শুধু তত্ত্বজিজ্ঞাসুও নই—শিল্পজিজ্ঞাসুও বটে। এই সূত্রে তাঁর কাছে আরো একটি সত্যের দীক্ষা পেয়েছিলাম: যে মুনিঋষি তুচ্ছতম মানুষের মধ্যে নারায়ণ দেখেন যে-দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তার কিছুটা কবি-শিল্পীতেও বর্তায়। তুচ্ছতম মানুষের জীবন সম্বন্ধেও শরৎদার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার দৃশ্যেই আমি সর্বপ্রথম এ-গভীর ইঙ্গিতটি পাই; অবশ্য এ-অন্তরঙ্গ কৌতূহল সব প্রকৃত সাহিত্যশিল্পীর জীবনে আচরণে তথা সন্ধানেই ফুটে উঠে থাকে। কিন্তু শরৎদার কৌতূহল এত নিবিড় ছিল যে তাকে কৌতূহল না ব'লে তৃষ্ণা নাম দিতাম আমরা অনেকেই: যেন এ ও তা অজস্র তথ্য তাঁর না জানলেই নয়—যেন

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি আহরণ তাঁর কাছে বিলাসের নয়—জীবনীশক্তির প্রত্যক্ষ খোরাক যোগায়।

আজ যখন অতীতের ছায়ালোকের দিকে ফিরে তাকাই তখন প্রায়ই আমার স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে তাঁর স্নেহকোমল অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মনে আছে পরে একবার গিরিশ মেসোমশায় বলেছিলেন: "দেখেছ মণ্টু, কীভাবে উনি দেখেন একদৃষ্টে—মনে হয় যেন আমাদের ভিতর অবধি সার্চলাইট চালাচ্ছেন।"

এই দৃষ্টি কলকাতায় কিছুদিন থাকবার পর যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কারণ হয়ত কলকাতায় আসার পরে তাঁর আর্থিক সমস্যার সুরাহা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিরীক্ষণ করতে পারতেন তাঁর স্বভাব-উৎসুক মনের অখণ্ড যোগশক্তি দিয়ে।

তাঁর মুখের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর টিকোলো নাক, ইংরাজিতে যাকে বলে acquiline. আমি সময়ে সময়ে মৃদু হেসে বলতাম: "আহা, তিলফুল জিনি নাসা রে!" তার মানে যাই হোক। শরৎদা অমনি হেসে জুড়ে দিতেন: "যেমন ত্রৈলোক্যবাবুর কঙ্কাবতীতে সেই ব্যাং সাহেবের নাক, না?"

কিন্তু নিজের চেহারাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই অকরুণ রসিকতা করলেও কেউ তাঁর চোখের দৃষ্টির সুখ্যাতি করলে তিনি ভারি খুশি হতেন। না হবেন কেন? স্পর্শকাতর অভিমানী মানুষ তো। ইংরাজীতে যাকে বলে refined—বাংলায় তাকে বলা যায় সুকুমার। শরৎদার প্রকৃতি আবাল্য সুকুমার ছিল ব'লে শুনেছি, বন্ধুরা তাঁকে দরদী উপাধি দিতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করলে তাঁর এ-উপাধি বাহাল না ক'রে উপায় ছিল না। কেন না তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হলেও সে দেখত শুধু বিচারকের চোখে তো নয়—সেই সঙ্গে ব্যথার ব্যথীর চোখেও বটে। তাই মানুষের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়লেও তিনি কখনো ভুলতেন না এই সত্যের সত্যটি যে "দোষেগুণে মানুষ"। এই দৃষ্টির পরিচয় পেয়েই পরে (১৯২৭ সনে) শ্রীকান্তের ইতালীয় অনুবাদ পাঠে রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে "পৃথিবীর একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক" উপাধি দেন।

কিন্তু "ঔপন্যাসিক" উপাধিটি আদরণীয় হলেও আমি সাধারণভাবে শুধু বড় কথাসাহিত্যিক তথমা দিয়েই তাঁর অত্যুজ্জ্বল মহিমার ইতি করতে চাই না। কারণ আমার কাছে তিনি সবচেয়ে বরণীয় হ'য়ে উঠেছিলেন বরেণ্য মানুষ ব'লেই বলব। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে "গ্রেট ম্যান"।

এই বরেণ্য বা "গ্রেট" বলতে ঠিক কী বোঝায় এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কেন না মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। (সংসারে কিসের সম্বন্ধেই বা সকলের এক রায়?) কেউ বলেন, শ্রেষ্ঠ মানুষের নমুনা খুঁজতে হ'লে যেতে হবে প্রতিভাধরদের কাছে—অর্থাৎ জীনিয়স। কেউ বলেন শক্তিমন্তরাই সবার সেরা। কেউ বলেন বৈজ্ঞানিকরাই হলেন দিক্‌পাল। কেউ বলেন জগতের কর্ণধার হলেন—মহাশিল্পী। এ-যুগে এমন কথাও রটেছে যে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল ডিক্‌টেটর, যথা স্ট্যালিন বা হিট্‌লার কিম্বা গৌরীশঙ্কর-আরোহী তেনজিং বা হিলারি। কাজেই সময়ে সময়ে ভয় করে বৈকি মহৎ-এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে। তবু স্মৃতিকাহিনীতে ব্যক্তিগত মতামত লেখা চলে ব'লে আমি এ-প্রসঙ্গে আমার নিজের ধারণাটি পেশ করতে চেষ্টা করব—দুর্গা বলে।

বাল্যকালে পিতৃদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে পড়ার ফলে আমার বালক মনে উপ্ত হয় একটি দৃঢ় ধারণা যে, মহৎ বলব শুধু সেই মানুষ যার বুদ্ধি হৃদয়কে দাবিয়ে রাখেনি বরং আরো দিলদরাজই ক'রে তুলেছে তার উজ্জ্বল বলিষ্ঠ সমর্থনে। প্রায় সবাই জানেন ও মানেন যে হৃদয়বৃত্তিই জীবনের সর্ববিধ রসসৃষ্টির প্রধান রসদদার, যার মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বাস ভাব স্বপ্ন সবই পড়ে। কিন্তু হৃদয়বৃত্তি সবচেয়ে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে শুধু আবেগ উচ্ছ্বাসে নয়—অন্তরাত্মার প্রবুদ্ধ দানে, যার নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছিলেন psychic being: এ-কথাটির ভাষ্য করতে হ'লে একটু দীর্ঘ ভূমিকা করতেই হবে।

দুই

১৯২৮এ যখন আমি হঠাৎ সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে উধাও হই তখন অনেকেই মনে করেছিলেন—বুঝি এ আমার অগস্ত্যযাত্রা। অন্তত শরৎদা যে ঐরকমই কিছু একটা বিভীষিকা কল্পনা ক'রে (গীতার ভাষায়) "শোক-সংবিগ্নমানস" হ'য়ে পড়েছিলেন এ নিশ্চয়। কিন্তু প্রথম দিকে তিনি তাঁর উদ্বেগকে ঢেকে রেখে শুধু ঠাট্টা তামাশা ক'রেই আমার কাছে নানা অনুযোগ করতেন—"হাল্‌কা তুমি করো পাছে হাল্‌কা করি ভাই, আপন ব্যথাটাই" ভঙ্গিতে। যাঁরা তাঁর গোপন মনঃক্লেশের খবর রাখতেন না তাঁরা ধ'রে নিলেন—তিনি আমার

যোগোৎসাহকে দমিয়ে দিতেই ব্যঙ্গের সুর ধরেছেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর এ-চিঠিগুলি মন দিয়ে পড়বেন—যাকে ইংরাজিতে বলে reading between the lines—তাঁরা আঁচ পাবেন তাঁর ব্যথার। একটি চিঠির নমুনা দিলেই আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে। তিনি ১৩ই জুন, ১৯২৯ তারিখের একটি পত্রে লেখেন :

"মণ্টু, তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হ'তে গেলে! ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবামাত্র চ'লে আসবে। এ বাঙালির পেশা নয় বাপু, কথা শোনো—চ'লে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাকলে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আসছ পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে, আমি ইষ্টিশানে যাবো।

"আর একটা কথা। বারীন (শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ) শুনেছি যে-কোনো গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে-কোনো ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে।...আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিনকতক তার 'দ্বীপান্তরের বাঁশি'-র খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে এবং এ বই এতদিন পড়োনি এই ব'লে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ করবে। খুব সম্ভব এই হ'লেই বিভূতিটা হস্তগত করে নিতে পারবে। উত্তরভারতে বেড়াবার সময় এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

"অনিলবরণ (শ্রীঅনিলবরণ রায়) শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি ক'রে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু পাঁচসাত ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে-ঘাটে বিদেশে—বুঝেছ তো? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালোমানুষ...অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। তারপর এ-দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো তো ওখানে কষ্ট করে থাকবার দরকারই বা কি?

"অনেককাল তোমাকে দেখিনি। ভারি দেখবার ইচ্ছা হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আসবে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম প্রথম থেকেই, কিন্তু কালাতিপাতে সে-অনুরাগ আরো গভীর হয়েছিল চাক্ষুষ ক'রে যে, তিনি অনেক মান্যগণ্য সুবিধাবাদীর

মতন মনরাখা কথা বলতেন না—না ভক্তিভাজনদের আদর কাড়তে, না স্নেহভাজনদের হাতে রাখতে। এইজন্যে অনেক লোকেই তাঁকে ভুল বুঝত, ভাবত তিনি সুশীলতার ধার ধারেন না। কিন্তু তাঁকে একটু কাছ থেকেও যে দেখেছে সে সাক্ষ্য দেবেই দেবে যে, তিনি স্বভাবে আদৌ কঠোর ছিলেন না, দুঃশীল তো নয়ই। তবে আশ্রমের অজ্ঞাতবাসে তিনি সত্যিই বিশ্বাস করতেন না, ভাবতেন এতে ক'রে মানুষ স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে পড়ে ও পাঁচজনের সঙ্গে আদান-প্রদানের অভাবে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা খুইয়ে বসে। প্রায়ই বলতেন—শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা হ'ল প্রাণিক এবং পাঁচজনের সঙ্গে সংস্পর্শে না এলে প্রাণশক্তি বাঁচবার কি বাড়বার খোরাক পায় না। তাঁর এ-ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না আমি কয়েকবৎসরের মধ্যেই বুঝতে পারি ঠেকে শিখে: মানে আশ্রমবাসী অনেক নিষ্কর্মারই অদ্ভুত আচরণে। সেসব কথা পাড়ব যথাস্থানে—এখন শরৎদার কথাই বলি।

আমি পণ্ডিচেরিতে গিয়ে প্রথম দিকে খুব উৎসাহী হ'য়ে উঠি। সে সময়ে সরলভাবে যাই শুনতাম বিশ্বাস ক'রে বসতাম। প্রথম প্রথম শরৎদাকে সেসব কথা লিখতাম সোৎসাহেই বলব, কিন্তু তাঁর সন্দিগ্ধতায় বারবার ঘা খেতাম। তিনি কথায় কথায় বলতেন: "বিশ্বাসের কি একটা লিমিট থাকবে না মণ্টু! যা তা বিশ্বাস ক'রে কি শেষটায় দ-য়ে মজব?"

ফলে আমাদের মধ্যে প্রথম দিকে একটু ব্যবধান মতন আসে—ঠিক যেমন ঘটেছিল সুভাষের বেলায়ও। কেন না এ-বিষয়ে সেও ছিল শরৎদার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত: যে, সাধনার নাম ক'রে আমাদের নানা আত্মসর্বস্ব প্রবৃত্তিকে আস্কারা দেওয়া সমীচীন নয় কেন না তাহ'লে একদিকে যেমন পরার্থনিষ্ঠায় ঘুণ ধ'রে যায় অন্যদিকে তেম্‌নি কর্মপ্রবৃত্তিতে মরচে প'ড়ে যায়। সুভাষ ও শরৎদার এ-ধারণা পুরোপুরি সত্য না হ'লেও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও ছিল না এ-সত্যটি একটু চোখ খুলে দেখতে চাইলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম। কিন্তু স্বভাবে যারা আবেগপ্রবণ তাদের চোখ সহজেই খানিকটা অর্ধনিমীলিত মতন হ'য়ে আসে—যার ফলে তারা তাদের কল্পনার রংকে রং ব'লে চিনতে বেগ পায়। তাছাড়া আবেগের নরম মর্মস্থলে ঘা খেলে মানুষ যে বেঁকে বসে এ-ও খুবই জানা কথা, তাই আমি সুভাষ ও শরৎদার আপত্তিতে ব্যথিত হ'য়ে আরো জোর ক'রে অঙ্গীকার করতাম যা আমার প্রাণ চাইত—লিখতাম অনেক শোনা কথা ধ্রুব উপলব্ধির ভঙ্গিতে। মিথ্যা অবশ্য বলিনি কারণ স্বভাবে আমি যে সত্যনিষ্ঠ ছিলাম এ শুধু যে আমিই জানতাম তাই নয় যাঁরাই

আমাকে একটু কাছ থেকে দেখেন তাঁরাই জানতেন। তাই সুভাষ ও শরৎদা আমার বিবাগী হওয়ার বিপক্ষে নানা কথা লিখলেও এটুকু জানতেন তথা মানতেন যে আমি যা কিছু তাঁদের লিখতাম সে সবই আন্তরিক বিশ্বাস করি ব'লেই লিখতাম। কিন্তু তবু বিশেষ ক'রে শরৎদা আমাকে প্রথম দিকে একটু ভুল বুঝতেন। কী ভাবে—তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত করলেই পরিষ্কার হবে। তিনি লিখেছিলেন—৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৭ তারিখের একটি পত্রে :

"পরম কল্যাণীয়েষু মণ্টু,

তোমার চিঠি পেলাম। গোড়াতেই লিখেছ—'বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আপনি আমার ওপরে ক্রমেই অখুসি হয়ে উঠছেন।' অখুসির মানে যদি হয় বিরক্তি, তাহ'লে উত্তরে বলব—নিশ্চয়ই না। আর অখুসির অর্থ যদি হয় গভীর ভাবে ব্যথিত, তাহলে বলব—নিশ্চয়ই হাঁ। বস্তুতঃ, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই যখনি মনে হয় দিন শেষ হ'য়ে আসছে কিন্তু এ-জীবনে আর তোমাকে দেখতে পাবো না, তখন এমন একটা কষ্ট হয় যে সে তোমার সাধনভজন করার দলে কেউ বুঝবে না। সুতরাং এসকল কথার প্রয়োজন নেই। জীবনে অনেক দুঃখই নিঃশব্দে স'য়ে গেছি। এও একটা।"

এই কথা কটি থেকে বোঝা যায় তিনি মূলতঃ স্বভাবে গভীর স্নেহপ্রবণ ছিলেন ব'লেই আমার অদর্শনে এত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর এ-ব্যথা পরে একটু একটু ক'রে কাটে যখন তাঁর সঙ্গে একটি নতুন তৃপ্তিকর সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে অর্থাৎ যখন আমি তাঁর "নিষ্কৃতির" অনুবাদ শুরু করি। সে কথা বলছি কিন্তু আগে এ-প্রসঙ্গটা সারা হোক।

শরৎদার যোগ সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা ছিল—যাকে ভুল ব'লে তিনি পরে স্বীকার করেছিলেন আমার উপন্যাস "দোলা" প্রকাশ হওয়ার পরে, লিখেছিলেন : (৩রা মাঘ, ১৩৪২—অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৬) "একদিন বুদ্ধদেব ভট্টচার্য এসে বলেছিল 'দোলা' চমৎকার হয়েছে। শুনে বিস্মিত হইনি। আমি মনে মনে জানি তোমার উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরো চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায়? তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রয়েছে আর্টিস্ট হৃদয়—যেমন বৃহৎ, তেমনি ভদ্র, তেমনি পরদুঃখকাতর। তোমার রসজ্ঞ মনের পরিচয় ছেলেবেলাতেই তোমার সঙ্গীতে, তোমার গুণিজনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে, তোমার নানা কাজে আমি পেয়েছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহও আমার

তাই অকৃত্রিম—কোনো বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়। তোমার লেখার সম্বন্ধে যে শুভকামনা বহুদিন পূর্ব্বে করেছিলাম আজ তা সফল হ'তে চলল এ আমার বড় আনন্দ। আবার আশীর্বাদ করি—জীবনে তুমি সুখী হও, সার্থক হও।"

পুরো চিঠিটি শরৎচন্দ্রের ছাপানো পত্রাবলীতে বেরিয়েছে, তবু এখানে তা থেকে এ-অংশটি উদ্ধৃত করলাম শুধু ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর পুণ্যস্মৃতির তর্পণ করতেই নয়—আমার অভিজ্ঞতার এজাহারে এই কথাটি জানাতে যে, হৃদয়বত্তায় তিনি অলোকসামান্য ছিলেন ব'লেই তাঁর কথাসাহিত্যের নানা চিত্রে এত লোকের মন গলে। আমিও তাঁকে এই কথাই বলতাম নানাসময়ে আমার নানা উচ্ছ্বাসে, উদ্ধৃত করতাম এক ইংরাজ কবির বাণী : "He best can paint them who shall feel them most"; তিনিও সায় দিয়ে সোৎসাহে বলতেন : "বটেই তো মণ্টু, সারা জীবনে যে কোনদিন প্রেমে পড়ে নি সে প্রেমের ছবি আঁকবে কেমন করে? যে-কৃপণ কোনদিন দান করে নি সে কলম হাতে নিলেই কি দাতার ঔদার্যের বর্ণনা ক'রে কারুর মন ভিজোতে পারে?" ইত্যাদি। কিন্তু ৪ঠা ফাল্গুনের চিঠিটা শেষ করি দেখাতে যে, তিনি আমার যোগদীক্ষা গ্রহণে ব্যথিত হয়েছিলেন শুধু ব্যক্তিগত দিক দিয়ে আমার অভাব বোধ করার দরুনই নয়—তাঁর একটি গভীর ব্যথার জায়গায় ঘা পড়েছিল ব'লেও বটে যে, আমি সাহিত্য সঙ্গীত হয়ত ছেড়ে দেব—গড়পড়তা বৈরাগীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, চিত্তবৃত্তিনিরোধপন্থী হ'য়ে নাভিদৃষ্টি নিষ্কর্মা ব'নে গিয়ে। তাই ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন দুঃখ করে :

"তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে-বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া কল্পনা কত দিন সত্যিকার সাহিত্য যোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাংলা দেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে। তাই ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে

ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি বাংলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই তো সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। কিন্তু আমার কথা যাক্। তোমার নিজের কথায় একদিন আমি ভেবেছিলাম মণ্টু যে ব্যারিস্টার হয়ে আসে নি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, না-ই চ'ড়ে বেড়ালো মটরগাড়ি, না-ই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চ'লে যাবে—শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ,—সেই আমাদের ঢের। আমি আরও একটা কথা ভাবতাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাংলা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্ছে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘট্‌বে না। কিন্তু সে-আশা সে-আনন্দে ছাই পড়লো। যার দেহের, মনের আনন্দের, সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না সে আজ এমনি দাসখৎ লিখে দিলে যে এক-পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর permission—ছাড়পত্র। এই হোলো ওর মুক্তির সাধনা! গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ—সেই হোলো ওর বড়ো! আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ কথা আমিও তো ভুল্‌তে পারি নে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারি নে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল।...

"আশ্রম যাক। আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়—গান শুনতে, গল্প করতে। ভারি বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এদিকে আসবে না একবার? আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

তিনি মিথ্যা বলেন নি—কারণ তাঁর স্নেহ পৌঁছেছিল প্রাণলোক ছাড়িয়ে অন্তরলোকে—শ্রীঅরবিন্দ যার নাম দিয়েছেন সাইকিক। এ-সম্বন্ধে ভাষ্য করতেই এত কথার অবতারণা, কারণ এই সাইকিক রস-উৎসে পৌঁছেছিলেন ব'লেই শরৎদা এত লোকের মন টেনেছিলেন—শুধু আমার মতন ঝোঁকালো মানুষের নয়—বহু মহৎ শিল্পীর, বীর বিপ্লবীর, মহাপ্রাণ মানুষের।

মহাপ্রাণ মানুষের বলতে সব আগে মনে পড়ে দুজনের কথা: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজি সুভাষ। দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় নি কিন্তু সুভাষ ও শরৎদার মাধ্যমে তাঁর দিকে আরো ঝুঁকেছিলাম তাঁর আশ্চর্য মহত্ত্ব ও উদারতার কথা শুনতে শুনতে। সুভাষ ও তাঁর মধ্যেও একটি পরম স্নেহের ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল আমার চোখের সাম্‌নেই।

তিনি কথায় কথায় বলতেন: "সবাইকে ছাড়তে পারি কিন্তু সুভাষকে ছাড়া অসম্ভব।" মনে পড়ে একবার কোনো একটি সভায় সুভাষকে উদ্যোক্তারা নিমন্ত্রণ করে নি ব'লে তিনি যান নি। আমি একবার পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতা এসে কোন একটি ঘটনায় পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "কেন যান নি?" তিনি বলেছিলেন: "সুভাষহীন সভা? শিবহীন যজ্ঞ?" বলেছিলেন হেসে: "সুভাষকে যে কী বেগ পেতে হচ্ছে জানো না মণ্টু। ওরা সেদিন আমাকে বলল কী জানো? বলল: সুভাষ ভূত। আমি পিঠ পিঠ উত্তর দিলাম: শেষে 'নাথ' জুড়ে দিতে হবে কিন্তু।" আমি বলেছিলাম: "রবীন্দ্রনাথ বলেন বাঙালি আত্মঘাতী জাত। নৈলে কি সুভাষেরও নামে নিন্দা রটে?"

সুভাষের কাছে শুনেছিলাম দেশবন্ধু তাঁকে কী গভীর শ্রদ্ধা করতেন ও তিনি দেশবন্ধুকে কী গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকায় শরৎদা তাঁর "স্বামী" গল্পটি পাঠান। দেশবন্ধু তাঁকে একটি সাদা চেক পাঠান নাম সই ক'রে: তিনি যে-দক্ষিণা চান শুধু বসিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। শরৎদা স্বচ্ছন্দ-চিত্তেই পাঁচশো টাকা পকেটস্থ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি চেকে আঁক কাটেন মাত্র একশো টাকার। এম্‌নি বিচিত্র ছিল এ দুটি মহাপ্রাণ মানুষের আন্তর সম্বন্ধ। দেশবন্ধুকে তিনি কী চোখে দেখতেন তিনি লিখেছিলেন এ-মহাভাগের দেহরক্ষার পরে—মাত্র একটি আশ্চর্য ছত্রে: "দেশবন্ধু করিতেন দেশের কাজ, আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" কিন্তু কোনো প্রেমের পথই কুসুমাস্তৃত নয়, তাই দেশবন্ধুর সহায় হ'তে গিয়ে শরৎদাকে ভুগতে হয়েছিল কম নয়। আমি তাঁকে অযথা বিড়ম্বিত হ'তে দেখে একবার মনোদুঃখে মর্লির একটি কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছিলাম: "যে-মানুষ স্বভাবে সাহিত্যিক হ'য়েও সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতি বরণ করে তার একটিমাত্র উপাধি আছে: সে পাগল।" তাতে শরৎদা হেসে বলেন যে দেশবন্ধুও তাঁকে নানাভাবে লাঞ্ছিত হ'তে দেখে রাজনীতির আখড়া ছাড়তে বলেছিলেন, কিন্তু দেশবন্ধুর নানা সঙ্গীসাথীদের ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখেই তিনি প্রাণ ধ'রে

তাঁকে ওঁদের হাতে সঁপে দিতে পারেন নি। দেশবন্ধুর লোকান্তরের পরে তাঁর শ্মশানযাত্রায় বিপুল জনতার হুড়োহুড়ি দেখে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন: "এরা তাঁর জীবদ্দশায় যদি একটুও আনুকূল্য করত তবে তাঁর হয়ত অকালমৃত্যু হ'ত না। ভাওয়াল কবি গোবিন্দ দাসের বিখ্যাত চরণটি মনে পড়ে—'ও ভাই বঙ্গবাসী! আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দেবে মঠ'!"

শরৎদার দেশবন্ধু-তর্পণ প'ড়ে একথা সুভাষও তাঁকে লিখেছিল, তার বিখ্যাত "মান্দালয়ের পত্রে"। তার জেলে-ব'সে-লেখা এ-চিঠিটি পরে যখন তার "তরুণের স্বপ্নে" বেরোয় তখন প'ড়ে অনেকেরই চোখে জল এসেছিল। এখানে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া অসঙ্গত হবে না। দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষ শরৎদাকে লিখেছিল (১৫ই আগষ্ট, ১৯২৫):

"আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি তখন নানাপ্রকার অসত্যে ও অর্ধসত্যে বাংলার সব খবরের কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে কথা তো কেউ বলেই নি—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নি। তখন স্বরাজ্য-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ।...যে-বাড়িতে একসময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু কারোরই চরণধূলি পড়ে না আর!...কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবরের কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরানো হ'ল—বাইরের লোকে জানে না—বোধহয় কোনদিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, যজ্ঞের পূর্ণসমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।" তারপরে খেদ ক'রে লিখেছিল:

"সময়ে সময়ে আমি মনে না ক'রে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুর জন্য তাঁর দেশবাসীরা এবং অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন তাহলে বোধহয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম ক'রে আয়ুঃক্ষয় করতে হ'ত না।

"অনেকে মনে করে যে আমরা অন্ধের ম'ত তাঁকে অনুসরণ করতাম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। আমার নিজের কথা বলতে পারি...আমি জানতাম যে, যতই ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে, আর তাঁর ভালোবাসা থেকে আমি কখনো বঞ্চিত হব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত ঝড়ঝাপটাই আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে।"

উদ্ধৃতিতে একটু চুক হ'য়ে গেল—চিঠির পরের অংশ এসে গেল আগে—যাক। এবার গোড়া থেকে খেই ধরি ফের। সুভাষ চিঠিটি শুরু ক'রেছিল এইভাবে:

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, মাসিক বসুমতীতে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লাম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।"

শেষে সুভাষ দেশবন্ধুর বিয়োগব্যথার যে-বর্ণনাটুকু ক'রেছিল তা এতই মর্মস্পর্শী যে উদ্ধৃতিটির বহর বেড়ে যাওয়া সত্বেও তার জের টানবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বেশ মনে পড়ে শরৎদার গলা ধ'রে আসত এ-অংশটি আমাদের প'ড়ে শোনাতে শোনাতে। সুভাষ লিখেছিল :

"আমি বোধহয় খুব বেশি দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার আর তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই। বাহিরে গেলেই যে-শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সংকুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে।···যাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসার ফলে আমি আজ এখানে···বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হ'লেও তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি, একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাইরের হতাশা, বাইরের শূন্যতা, বাইরের দায়িত্ব এখন আর মন যেন চায় না।"

সুভাষ শরৎদাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল ব'লেই তার আর এক গভীর ভালোবাসার কথা তাঁকে এমন খোলাখুলি লিখতে পেরেছিল। দেশবন্ধুও শরৎদাকে এত ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন যে, অনেক সময়েই পরামর্শ নিতে আসতেন সুদূর শিবপুরে তাঁর বাড়ি ব'য়ে। একবার দেশবন্ধু এইভাবে মনস্থির করতে না পেরে তাঁর কাছে আসতে শরৎদা যা বলেছিলেন তাঁর ভাষায়ই উদ্ধৃত করি, বললেন : "জানো মন্টু, দেশবন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী করি বলুন তো? অনেকে বলছে ফের ব্যারিস্টারি ক'রে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন ক'রে কংগ্রেসে টাকা দিতে—বলছে দেশের কাজে টাকা না হ'লেই নয়, কাজেই আমার টাকা রোজগার করাতেও দেশের কাজই করা হবে।"

"আপনি কী বললেন?" শুধালাম আমি সাগ্রহে।

শরৎদা একটু যেন খেদের সুরেই বললেন : "আমি বললাম—'দেখুন, যারা এমন কথা বলে তাদের মুখদর্শনও করবেন না আপনি। টাকা টাকা টাকা!

কিন্তু দেশের কাজে টাকা ঢালাটাই কি সব চেয়ে বড় কথা? আপনি লক্ষ টাকা আয়ের পসার ছেড়ে দিয়ে ত্যাগের যে-দৃষ্টান্ত দেখালেন, ফের ব্যারিস্টারি ক'রে পুনর্মূষিক হ'য়ে সে-দৃষ্টান্তের মহিমা নষ্ট করবেন না দেশবন্ধু, দোহাই আপনার। দেশের কাজে টাকা দু'চার লাখ কেন, দু'চার কোটি দিলেও ফুরিয়ে যাবেই যাবে দু'দিন বাদে। কিন্তু এই যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখালেন তার প্রেরণা কোনোদিনই ফুরুবে না। অর্থাগমের কয়েকটা আশু সুবিধার জন্য এত বড় দৃষ্টান্তকে নষ্ট করবেন না আপনি—আজে বাজে লোকের কথায় কান দিয়ে'।"

আমি খুশি হ'য়ে বলেছিলাম: "ঠিক ঠিক। সুভাষও এই কথাই বলেছে আমাকে কতবারই যে!"

শরৎদা: "তাঁর পাশে ঐ একটি ছেলে আছে মণ্টু যে বড় মন নিয়েই জন্মেছে, যে স্বভাবে শুধু দেশভক্ত নয়—ত্যাগী। তাই সে দেশবন্ধুর ত্যাগের মহিমা বুঝবে না তো বুঝবে কে? জহুরী না হ'লে কি জহর চেনা যায় মণ্টু?"

তাঁর এ-উপমাটি আমার বারবারই মনে পড়েছে এ-দুই মহাপ্রাণ মানুষের লোকান্তরের পরে। আর ঐ সঙ্গে পিতৃদেবের একটি গানও মন পড়ত এঁদের সম্পর্কে: "সমানে সমানে হয় প্রণয়ের বিনিময়—জোনাকির প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা?" তাই না এ-দুটি মানুষ পরস্পরের এত কাছে এসেছিলেন—প্রাণের টানে। তাই না শরৎদা দেশবন্ধুকে শুধু চিনতে পারা নয়—দিতে পেরেছিলেন এমন গভীর পথনির্দেশ।

কিন্তু এবার, হারানো খেই ধরি, বলি কীভাবে তাঁর সঙ্গে এক নব সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল পণ্ডিচেরি ও কলকাতার হাজার মাইল ব্যবধান ডিঙিয়ে।

তাঁর নানা লেখা প'ড়েই নানা সময়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি চোখের জল ফেলেছি তাঁর তিনটি গল্প প'ড়ে: নিষ্কৃতি, রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে। শরৎদাকে মাঝে মাঝেই বলতাম কোনো কোনো লোককে দিয়ে এ-গল্প তিনটির ইংরাজি অনুবাদ করাতে। কিন্তু যখনই একথা বলতাম তিনি পিঠ পিঠ জবাব দিতেন: "তুমিই করো মণ্টু।" আমি করতে রাজি ছিলাম ষোলো আনাই, কেবল ভরসা পেতাম না, কেন না সে-সময়ে ইংরাজি ভাষায় আমার দখল ছিল যেমন থাকে আর পাঁচজন ইংরাজি-অভিজ্ঞ শিক্ষিত যুবকের। পণ্ডিচেরি এসে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে এ-সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে

আমাকে জানান যে, কোনো ভাষা রীতিমত-সাধনা ক'রে আয়ত্ত না ক'রে সে-ভাষায় মুরুব্বিয়ানা দেখাতে যাওয়া মূঢ়তা।

অতঃপর গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর চরণচ্ছায়ায় আমি ইংরাজি সাহিত্যে দীক্ষা নিই। ইংরাজিতে গদ্যে তথা পদ্যে সাধনার ফলে যদি অল্প স্বল্প কিছু রসসৃষ্টি করতে পেরে থাকি তবে সেটুকু সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁরই প্রসাদে একথা বললে একটুও অতিশয়োক্তি হবে না। সে-সাধনার কথা আমার আশ্রমজীবন-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলবার ইচ্ছা রইল। তাই এখানে শুধু এটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হই যে, ইংরাজি ভাষার শক্তি ছন্দ মেজাজ গতিধারা ইডিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে আমি অন্তঃশ্রুতি অর্জন করি তাঁরই অভ্রান্ত নির্দেশে। আজো মনে পড়ে—কী আনন্দেই না তাঁর সঙ্গে পত্রের পর পত্রে ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা চালাতাম—রোজ নতুন নতুন ইংরাজি কবিতা লিখে তাঁকে পাঠাতাম আর তিনি অক্লান্ত স্নেহে সংশোধন ক'রে বুঝিয়ে দিতেন কোন্ ছন্দের সুপ্রয়োগ হয় কীভাবে, কোন্ শব্দের ব্যঞ্জনা কোন্ পথে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে···ইত্যাদি। সময়ে সময়ে উৎসাহে সত্যিই আমার রাত্রে "নিদ নাহি আঁখিপাতে" অবস্থা হ'ত। একথা একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে এক একদিন এমনও হয়েছে যে ইংরাজি কবিতা লিখতে লিখতে সত্যিই সমস্ত রাত কাবার হয়ে গেছে—ভোরে সূর্য উঠলে তবে থেমে স্নান ক'রে ধ্যানে বসেছি। এ-সময়ে যে ইংরাজি কাব্যচর্চাই ছিল আমার ধ্যান যোগ ধর্ম সবই। তাই রাতেও পার্থসারথির কথা ভুলে ডুবে যেতাম কাব্যভারতীর অর্চনায়—ঘুম এলে স্টোভে চা ক'রে খেয়ে ফের বসেছি লিখতে! ভুতে-পাওয়া যাকে বলে।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথাটি যে মিথ্যা নয়—আমি আমার নানা সাধনায়ই উপলব্ধি করেছি। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাকবির কাছে দীক্ষা ফলপ্রসূ হবে এ আর বিচিত্র কি! অথ, যথাকালে নিজের 'পরে একটু ভরসা এল, শ্রীঅরবিন্দ খুশি হ'য়ে দিলাশা দিতে। আমি চিরদিনই ঋণস্বীকারে আনন্দ পেয়েছি ও সেই আনন্দেরই ঝোঁকে যাঁর কাছে ঋণী তাঁর কিছু সেবা করতে চেয়েছি। আমার বরাবর মনে হয়েছে যে দান পেলে তার কিছু প্রতিদান দেবার চেষ্টা করার মধ্যে যে গভীর আনন্দ আছে সেই আনন্দই বিধাতার প্রত্যক্ষ অনুজ্ঞা। তাই স্থির করলাম শরৎদার কাছে যে-অগাধ স্নেহ পেয়েছি তার প্রতিদানে তাঁর কিছু কাজে অন্তত লাগতেই হবে। তাই শ্রীঅরবিন্দকে ধ'রে পড়লাম যে আমি "নিষ্কৃতি" অনুবাদ করতে চাই—তাঁকে দেখে দিতে হবে। তিনি রাজি হ'তেই আমি সানন্দে

কিন্তু দেশের কাজে টাকা ঢালাটাই কি সব চেয়ে বড় কথা? আপনি লক্ষ টাকা আয়ের পসার ছেড়ে দিয়ে ত্যাগের যে-দৃষ্টান্ত দেখালেন, ফের ব্যারিস্টারি ক'রে পুনর্মূষিক হ'য়ে সে-দৃষ্টান্তের মহিমা নষ্ট করবেন না দেশবন্ধু, দোহাই আপনার। দেশের কাজে টাকা দু'চার লাখ কেন, দু'চার কোটি দিলেও ফুরিয়ে যাবেই যাবে দু'দিন বাদে। কিন্তু এই যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখালেন তার প্রেরণা কোনোদিনই ফুরুবে না। অর্থাগমের কয়েকটা আশু সুবিধার জন্য এত বড় দৃষ্টান্তকে নষ্ট করবেন না আপনি—আজে বাজে লোকের কথায় কান দিয়ে'।"

আমি খুশি হ'য়ে বলেছিলাম: "ঠিক ঠিক। সুভাষও এই কথাই বলেছে আমাকে কতবারই যে!"

শরৎদা: "তাঁর পাশে ঐ একটি ছেলে আছে মণ্টু যে বড় মন নিয়েই জন্মেছে, যে স্বভাবে শুধু দেশভক্ত নয়—ত্যাগী। তাই সে দেশবন্ধুর ত্যাগের মহিমা বুঝবে না তো বুঝবে কে? জহুরী না হ'লে কি জহর চেনা যায় মণ্টু?"

তাঁর এ-উপমাটি আমার বারবারই মনে পড়েছে এ-দুই মহাপ্রাণ মানুষের লোকান্তরের পরে। আর ঐ সঙ্গে পিতৃদেবের একটি গানও মনে পড়ত এঁদের সম্পর্কে: "সমানে সমানে হয় প্রণয়ের বিনিময়—জোনাকির প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা?" তাই না এ-দুটি মানুষ পরস্পরের এত কাছে এসেছিলেন—প্রাণের টানে। তাই না শরৎদা দেশবন্ধুকে শুধু চিনতে পারা নয়—দিতে পেরেছিলেন এমন গভীর পথনির্দেশ।

কিন্তু এবার, হারানো খেই ধরি, বলি কীভাবে তাঁর সঙ্গে এক নব সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল পণ্ডিচেরি ও কলকাতার হাজার মাইল ব্যবধান ডিঙিয়ে।

তাঁর নানা লেখা প'ড়েই নানা সময়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি চোখের জল ফেলেছি তাঁর তিনটি গল্প প'ড়ে: নিষ্কৃতি, রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে। শরৎদাকে মাঝে মাঝেই বলতাম কোনো কোনো লোককে দিয়ে এ-গল্প তিনটির ইংরাজি অনুবাদ করাতে। কিন্তু যখনই একথা বলতাম তিনি পিঠ পিঠ জবাব দিতেন: "তুমিই করো মণ্টু।" আমি করতে রাজি ছিলাম ষোলো আনাই, কেবল ভরসা পেতাম না, কেন না সে-সময়ে ইংরাজি ভাষায় আমার দখল ছিল যেমন থাকে আর পাঁচজন ইংরাজি-অভিজ্ঞ শিক্ষিত যুবকের। পণ্ডিচেরি এসে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে এ-সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে

আমাকে জানান যে, কোনো ভাষা রীতিমত-সাধনা ক'রে আয়ত্ত না ক'রে সে-ভাষায় মুরুব্বিয়ানা দেখাতে যাওয়া মূঢ়তা।

অতঃপর গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর চরণচ্ছায়ায় আমি ইংরাজি সাহিত্যে দীক্ষা নিই। ইংরাজিতে গদ্যে তথা পদ্যে সাধনার ফলে যদি অল্প স্বল্প কিছু রসসৃষ্টি করতে পেরে থাকি তবে সেটুকু সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁরই প্রসাদে একথা বললে একটুও অতিশয়োক্তি হবে না। সে-সাধনার কথা আমার আশ্রমজীবন-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলবার ইচ্ছা রইল। তাই এখানে শুধু এটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হই যে, ইংরাজি ভাষার শক্তি ছন্দ মেজাজ গতিধারা ইডিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে আমি অন্তঃশ্রুতি অর্জন করি তাঁরই অভ্রান্ত নির্দেশে। আজো মনে পড়ে—কী আনন্দেই না তাঁর সঙ্গে পত্রের পর পত্রে ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা চালাতাম—রোজ নতুন নতুন ইংরাজি কবিতা লিখে তাঁকে পাঠাতাম আর তিনি অক্লান্ত স্নেহে সংশোধন ক'রে বুঝিয়ে দিতেন কোন্ ছন্দের সুপ্রয়োগ হয় কীভাবে, কোন্ শব্দের ব্যঞ্জনা কোন্ পথে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে···ইত্যাদি। সময়ে সময়ে উৎসাহে সত্যিই আমার রাত্রে "নিদ নাহি আঁখিপাতে" অবস্থা হ'ত। একথা একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে এক একদিন এমনও হয়েছে যে ইংরাজি কবিতা লিখতে লিখতে সত্যিই সমস্ত রাত কাবার হয়ে গেছে—ভোরে সূর্য উঠলে তবে থেমে স্নান ক'রে ধ্যানে বসেছি। এ-সময়ে যে ইংরাজি কাব্যচর্চাই ছিল আমার ধ্যান যোগ ধর্ম সবই। তাই রাতেও পার্থসারথির কথা ভুলে ডুবে যেতাম কাব্যভারতীর অর্চনায়—ঘুম এলে স্টোভে চা ক'রে খেয়ে ফের বসেছি লিখতে! ভূতে-পাওয়া যাকে বলে।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথাটি যে মিথ্যা নয়—আমি আমার নানা সাধনায়ই উপলব্ধি করেছি। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাকবির কাছে দীক্ষা ফলপ্রসূ হবে এ আর বিচিত্র কি! অথ, যথাকালে নিজের 'পরে একটু ভরসা এল, শ্রীঅরবিন্দ খুশি হ'য়ে দিলাশা দিতে। আমি চিরদিনই ঋণস্বীকারে আনন্দ পেয়েছি ও সেই আনন্দেরই ঝোঁকে যাঁর কাছে ঋণী তাঁর কিছু সেবা করতে চেয়েছি। আমার বরাবর মনে হয়েছে যে দান পেলে তার কিছু প্রতিদান দেবার চেষ্টা করার মধ্যে যে গভীর আনন্দ আছে সেই আনন্দই বিধাতার প্রত্যক্ষ অনুজ্ঞা। তাই স্থির করলাম শরৎদার কাছে যে-অগাধ স্নেহ পেয়েছি তার প্রতিদানে তাঁর কিছু কাজে অন্তত লাগতেই হবে। তাই শ্রীঅরবিন্দকে ধ'রে পড়লাম যে আমি "নিষ্কৃতি" অনুবাদ করতে চাই—তাঁকে দেখে দিতে হবে। তিনি রাজি হ'তেই আমি সানন্দে

শরৎদাকে লিখি। উত্তরে তিনি আমাকে আশীর্বাদ পাঠাতেই আমি মহা উৎসাহে অনুবাদে লেগে যাই। শ্রীঅরবিন্দ "নিষ্কৃতির" অনুবাদ সযত্নে সংশোধন ক'রে দিতেন দিনের পর দিন। অনুবাদ শেষ হ'লে তিনি "নিষ্কৃতির" সুখ্যাতি ক'রে দুটি লাইন লিখেছিলেন—শরৎদাকে পাঠিয়েছিলাম। ঐসঙ্গে পাঠিয়েছিলাম শরৎদার বিখ্যাত "মহেশ" গল্পটি সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ যে-মন্তব্যটুকু লিখেছিলেন: "A wonderful style and a great creative artist with a profound emotional power"—অর্থাৎ, বিস্ময়কর রচনাশৈলী, মহান্ স্রষ্টা শিল্পী যিনি মানুষের হৃদয়ে গভীর আবেগ জাগাতে সক্ষম।

আমি "নিষ্কৃতি" অনুবাদ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ পত্রে সব জানিয়ে শেষে অনুরোধ করি গল্পটির একটি প্রাক্কথন (foreword) লিখে আমাকে পাঠাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎদার মনান্তর ঘনিয়ে উঠেছিল, তাই আমি আশা করতে পারি নি যে কবি আমার কথা রাখবেন। নির্ভরসার কারণ এই যে বাংলার এ-দুই সূর্য-চন্দ্রের মধ্যে মনান্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পর পর কয়েকটি মতান্তরের সংঘর্ষের ফলে। এ-উত্তাপের শুরু হয় প্রথম গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যখন শরৎদা ঝোঁকের মাথায় রবীন্দ্রনাথের অসহযোগ-বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বসেন। এ-মতান্তরে আমি ছিলাম কবির দিকে—হয়ত এইজন্যে যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা হুজুগ ও মাতামাতিতে আমার মন কোনদিনই পুরোপুরি সায় দেয় নি—বিদেশী কাপড় পোড়ানো, স্কুল কলেজ ছাড়া, চরকা, পিকেটিং কিছুই আমার ভালো লাগত না। কিন্তু শরৎদাও ছিলেন ঝোঁকালো মানুষ, গোঁ ধরলেন—এই-ই স্বরাজের পথ। উত্তরকালে উভয়ের মধ্যে এ-মনান্তর আরো গভীর হ'য়ে ওঠে শরৎদার "পথের দাবি" প্রকাশ হবার পরে। ব্যাপারটা আজকের দিনে অনেকেই ভুলে গিয়ে থাকবেন, তাই বলি সংক্ষেপে।

শরৎদার "পথের দাবি" বেরুতে না বেরুতে, বাংলা দেশে মহা হৈ চৈ! শেষে এক এক কপি দশ পনের টাকায় বিক্রয় হ'ত। ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত করাতে শরৎদা রবীন্দ্রনাথের কাছে দরবার করেন যে তিনি এর প্রতিবাদে তাঁর সহায় হোন। আমার এখানে শরৎদার সঙ্গে পুরো সহানুভূতি ছিল, কাজেই আমিও খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম যখন রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুর আর্জি নামঞ্জুর ক'রে তাঁকে একটি কড়া চিঠি লিখে পাঠালেন। শরৎদা রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই তাঁর

সাহিত্যের দীক্ষাগুরুর পদে বসিয়েছিলেন যদিও গ্রহবৈগুণ্যে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর মন কষাকষি শুরু হয় অনেক আগেই। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কী রকম ভক্তি ছিল তাঁর একটি মাত্র তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি থেকেই প্রতীয়মান হবে। হয়েছিল কি, এক রবীন্দ্র-ক্রিটিক তাঁর কাছে এসে তোষামোদের ভঙ্গিতে বলেন :—"কবিগুরু কী যে বলেন বোঝা এক দায়, আমরা ভালবাসি আপনার লেখা মশাই, যা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি !" শরৎদা পিঠ পিঠ জবাব দিয়েছিলেন :—"তা হবেই তো। হয়েছে কি জানো? আমি লিখি তোমাদের জন্যে আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে।"

ঠিক সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাখ্যানে তিনি গভীর বেদনা পেয়েছিলেন। এ-ব্যথা তাঁকে কতখানি বেজেছিল তার একটু আভাষ মিলবে তাঁর আমাকে লেখা একটি চিঠিতে। বুদ্ধদেব বসু একটি প্রবন্ধে লেখেন যে রবীন্দ্রনাথ শরৎদার চেয়ে অনেক বড় ঔপন্যাসিক। আমি একথায় আপত্তি ক'রে তাঁকে একটি চিঠি লিখি। উত্তরে তিনি লিখেছিলেন :

"আমার চেয়ে কে বড়ো কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ত না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারাজীবন করেছি। এই জন্যেই আমি কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি না। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি।···স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা এনে দেবে (জানুয়ারি ১৯৩৫)।"

রবীন্দ্রনাথকে আমি শরৎদার এ-পত্রের একটি কপি পাঠিয়ে দিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন (তীর্থংকর দ্রষ্টব্য) :

"শরতের চিঠিখানি প'ড়ে মনে বেদনা পেয়েছি। বুদ্ধদেব শরৎকে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিম্নতর আসনে বসিয়েছেন এ-সংবাদ আমি জানিই নে।"

আমার মনে হয় কবির দরদী হৃদয় আমার নানা অনুরোধে খানিকটা নরম হয়েছিল ব'লেই তিনি এর পরে ব্যস্ত হ'য়ে শরৎদার প্রতিভার প্রশস্তি ক'রে লেখেন "নিষ্কৃতির" একটি নাতিদীর্ঘ প্রাক্কথন। সেটি পাবামাত্র আমি সানন্দে শরৎদাকে পাঠাই এই আশায় যে তাঁর বেদনার হয়ত কিছু উপশম হবে। কিন্তু অভিমানী মানুষ প্রায়ই প্রশংসায় যত আনন্দ পান তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পান আঘাতে —বিশেষ ক'রে যদি সে আঘাত আসে প্রিয়জনের কাছ থেকে। তাই তো শরৎদা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তরের ব্যথা পুষে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রাক্কথনে এ-গভীর প্রশস্তি পাওয়া সত্ত্বেও যে, "He has achieved the best reward of a novelist : he has completely won the hearts of Bengali readers."

কিন্তু জানুয়ারি ১৯৩৫-এ এ-প্রশস্তিটি আমাদের হাতে আসে নি। তাই শরৎদা ভেবেছিলেন কবি তাঁর সম্বন্ধে চুপ ক'রেই থাকবেন।

এ সূত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই জোর ক'রেই : যে, মহাজনের ব্যথাও মহৎই হয়ে থাকে। তাই তো শরৎদা আমার পণ্ডিচেরি-প্রয়াণের দরুণ ব্যথা পেলেও সে-ব্যথাকে ভুলতে পেরেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্ব ও প্রতিভাকে চিনবার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু তাই নয়, আমি যখন নিষ্কৃতির অনুবাদে হাত দেই তখন শ্রীঅরবিন্দ আমার অনুবাদ সংশোধন ক'রে দিচ্ছেন শুনে কী আনন্দ ক'রেই না আমাকে লিখেছিলেন একটি দীর্ঘ পত্র—তাঁর সব দুঃখ ভুলে গিয়ে। এ-চিঠিটি তিনি আমাকে লিখেছিলেন ৩রা মাঘ ১৩৪১ তারিখে :

পরম কল্যাণীয় মণ্টু, তোমার চিঠিগুলি পেলাম। একটা একটা করে জবাব দিই।

(১) তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকাল পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম। বড় আনন্দ হ'ল। একবার সত্যিকার দেখা দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি এ-জীবনে আর হ'ল না। নাই হোক।

(২) টাইপরাইটারটা যে ভালোভাবে পৌঁছেছে এতে বড় তৃপ্তি। সেদিন হীরেন এসে বললে, "মণ্টুদার নিজের টাইপরাইটারটা গেছে পুরোনো হ'য়ে, একটা নতুন কলের তাঁর দরকার।" বললুম, "একটু খেটে-খুটে তাকে পাঠিয়ে দাও না হীরেন।" সে রাজি হ'ল। এসব সেই করেছে—আমি জড় বস্তু, কোনো কাজই আমাকে দিয়ে হয় না। আমি শুধু তাদের ঐ কটা টাকার একটা চেক লিখে

দিয়েছিলাম। তোমার যে পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। যে-লোক নিজের সমস্ত দিয়েছে তাকে দেওয়া তো দেওয়া নয়, পাওয়া। আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

(৩) শ্রীঅরবিন্দের হাতের লেখা চিঠিটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

(৪) "নিষ্কৃতি"কে ভালো অনুবাদ করার জন্যে যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম। শুধু আমাকে ভালোবাসো ব'লেই নয়, যারা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। এ না ক'রে তারা থাকতে পারে না। হয় করে না, কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানে না।

(৫) অনুবাদ ভালো হবেই যখন দেখে দেবার সংকল্প ক'রেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দর ভালো লাগলো জানি নে। অন্তত না লাগলেও বিস্মিতও হোতাম না, ক্ষুণ্ণও হোতাম না। তুমি যেদিন "শ্রীকান্ত" প্রকাশ করতে পারবে তখনই শুধু আশা করব হয়ত বাঙালি একজন গল্প লেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ-অসম্ভবও হয়ত একদিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।

(৬) অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিয়েছি। তার কারণ, তুমি ত শুধু অনুবাদক নও—নিজেও বড় লেখক। তোমাকে অকিঞ্চিৎকর সপ্রমাণ করার লোক বিরল নয়, এ চেষ্টা তাদের আছে এবং অধ্যবসায়ও অপরিসীম। তা হোক্—তাদের সমবেত চেষ্টার চেয়েও অনেক বড় তোমার প্রতিভা এবং একাগ্র সাধনা। তোমার গুরুর শুভাকাঙ্ক্ষা ত সমস্ত কিছুর পিছনে রইলই। জগতে তাদের অপচেষ্টাটাই সফল হবে আর সার্থক হবে—না তোমার অন্তরের জাগ্রত শক্তি? এমন হ'তেই পারে না মণ্টু।

(৭) রবীন্দ্রনাথ আমাকে introduce ক'রে দিতে চাইবেন ব'লে ভরসা করি নে। আমার প্রতি তো তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোনো কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধলো, আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা নিরর্থক।

(৮) শেষকালে রইলো তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু! এর বেশি আর কি বলবো? চিঠিলেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারি নে। তাই যে সবকথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হ'ল না সে আমার অক্ষমতার জন্যে—অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়—এ বিশ্বাস ক'রো।

(৯) শ্রীঅরবিন্দের নববর্ষের প্রার্থনা সত্যিই বড় চমৎকার লাগলো। সত্যিই খুব বড় কবি তিনি। —শুভার্থী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তিন

এ-চিঠিটি আমি পাঠাই শ্রীঅরবিন্দকে এই তর্ক তুলে যে মানুষের প্রাণশক্তির লীলাই (e'lan vital) এ জীবনের মূলকে সরস রেখেছে, বসন্তকে রঙিন রেখেছে। গুরুদেব যাকে 'সাইকিক' বা আন্তর প্রেরণা বলেন তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে বাধে, কেন না সে প্রায়ই আমাদেরকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়। প্রাণলীলার সনাতন ধারার স্বপক্ষে আমি আরও অনেক মামুলি যুক্তি প্রয়োগ করেছিলাম নানান্ বিলিতি বুকনি সমেত—তার মোদ্দা কথাটা ছিল এই যে প্রাণের চির নবীন চির স্রোতে মানুষ আবহমানকাল গা ভাসিয়ে এসেছে বলেই সে আজো জীবনে বা মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারায় নি। শ্রীঅরবিন্দ আমার এইসব বিজ্ঞম্মন্য কুযুক্তির উত্তরে যে সুযুক্তি পেশ করেন তা এত সুন্দর ও গভীর যে তাঁর ব্যাখ্যাটি একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এখানে উদ্ধৃত করছি আদ্যন্ত। তিনি লিখেছিলেন (জানুয়ারি ১৯৩৫):

"Sarat Chatterjee's letter is not a glory of the vital at all, even though it may have come through the vital—but not from it: it is psychic throughout, in every sentence. If I were asked how does the psychic work in the human being, I could very well point to the letter and say 'like that'……The psychic is the soul, the divine spark animating matter and life and mind and as it grows it takes form and expresses itself through these three—touching them to beauty and fineness—it worked even before humanity in the lower creation leading

it up towards the human, in humanity it works more freely though still under a mass of ignorance and weakness and coarseness and hardness leading it up towards the divine. In Yoga it becomes conscious of its aim and turns inward to the Divine. It sees behind and above it—that is the difference."

এর ভাবার্থ : শরৎচন্দ্রের চিঠিটির মহিমা ওর প্রাণবন্ততায় নয়, কারণ যদিও প্রাণশক্তির মধ্যে দিয়েই তাঁর বক্তব্যটি নিজেকে জানান দিয়েছে কিন্তু প্রাণশক্তি ওর মূল প্রেরণা নয়। এর প্রতি ছত্রে অন্তরাত্মার আলো * উপছে পড়ছে। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে মানুষের মধ্যে এই আলো কিভাবে সক্রিয় হয়, তাহলে আমি অকুণ্ঠেই বলব : ঠিক ঐ চিঠিটির মতন।···এই অন্তরাত্মাই হ'ল আমাদের আসল সত্তা, বস্তু প্রাণ মনকে সেই জীবন্ত ক'রে তোলে আর এদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত ও বিকশিত ক'রে ধরে লাবণ্য ও সৌকুমার্যের রসায়নে। মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জৈবজগতেও ওর শক্তি সক্রিয় হয়ে এসেছে বটে জীবকে ধীরে ধীরে মানবতার পর্যায়ে এগিয়ে দিতে, কেবল মানুষের মধ্যে এ শক্তি বেশি অব্যাহত ভাবে কাজ ক'রে থাকে—যদিও বহু অজ্ঞান, দুর্বলতা, কর্কশতা ও কাঠিন্যের বোঝা ঠেলে তবে। যোগের ভূমিকায় এ-অন্তঃশক্তি তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভিতরে ভিতরে ভগবৎমুখী হয়—দেখতে পায় যা কিছু তার পিছনে ছিল বা ঊর্ধ্বে অপেক্ষা করছে।"

এর পরে আর একটি দীর্ঘ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বিশদ করে বোঝান—প্রীতি-প্রেম-স্নেহের রাজ্যে অন্তরাত্মা কী ভাবে নিজেকে জানান দিয়ে থাকে ও কোথায় বাধা পায়। সে চিঠিটি ইতিপূর্বে প্রকাশ হয়েছে † বলে পুরো ইংরাজি উদ্ধৃতিটি দেওয়ার প্রয়োজন নেই—আরো এইজন্যে যে বাংলা রচনায় ইংরাজি উদ্ধৃতি যত কম থাকে ততই ভালো—আমি এখানে শুধু সংক্ষেপে তাঁর ভাবার্থটি পেশ করব সাদা বাংলায়। তিনি লিখেছিলেন :

"শুধু প্রাণশক্তির মধ্যেই অন্তরঙ্গতার তাপস্পর্শ আসীন এবং অন্তরাত্মা হ'ল

* শ্রীঅরবিন্দ psychic being-এর অনুবাদ করেছেন চৈত্যপুরুষ। কিন্তু এ শব্দটি এখনো বাংলা ভাষায় চালু হয় নি ব'লে আমি সাইকিক বলতে চলতি অন্তরাত্মা, আন্তর, অন্তঃশক্তি জাতীয় শব্দই ব্যবহার করেছি।

† Sri Arobindo's Letter,—II—'Friendship and Psychic Love,' p. 265.

তাপহীন শিখাহীন একথা মনে করাও ভুল।···আন্তর প্রীতি-প্রেম-স্নেহের শিখা ও তাপ প্রাণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, কেবল সে হ'ল অমল শিখা, বিলোল নয়—তাই অহম্-এর বাসনাতৃপ্তি তার উপজীব্য নয়।···আন্তর প্রেম সচরাচর মানবিক আদান-প্রদানে পুরোপুরি সক্রিয় হ'তে পারে না—মানবিক স্বভাবের অঙ্গনে তার পূর্ণ আবির্ভাবও হয় না—তার লীলাখেলা পূর্ণবৃত্ত হয় যখন তার জ্যোতি ও আনন্দ হয় ভগবৎমুখী।···মানবিক স্তরে তার নিবিড় আনন্দ আত্মপ্রকাশ করে কালেভদ্রে, বা উঁকি দেয় আংশিকভাবে। কিন্তু তা সত্বেও যে-প্রেম মূলত প্রাণিক সেখানেও সেই জোগায় উর্ধ্বতর সব উপাদান : সব সূক্ষ্মতর মাধুর্য, কোমলতা, বিশ্বস্ততা, আত্মদান, আত্মবলিদান, আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তার আদিগঙ্গোত্রী সেই বটে।"

শ্রীঅরবিন্দের এই গভীর ব্যাখ্যার আলোয় আমার মামুলি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল বলেই এ-প্রসঙ্গে এত কথার অবতারণা। এখানে বিপ্লব বলতে আমি ঠিক কি বুঝছি একটু খুলে না বললেই নয়।

আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে আমাকে লিখেছেন, শরৎবাবুকে কেউ কেউ মনে করেন মহাজন, আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন মাত্র একটি কৃতী শিল্পী —এদের মধ্যে সত্যদ্রষ্টা কিনি? এ প্রশ্নটিরও উত্তর দেওয়া হবে আমার বক্তব্যটিকে ফোটাতে পারলে। তাই বলি—কেন শরৎবাবুকে আমি মহাজনদের অন্যতম ব'লে মনে করি।

সংসারে গড়পড়তারা যে কখনোই মহৎ মানুষের মতন নিস্বার্থভাবে কাজ করতে পারে না তা নয়। তাই তো সমর্সেট মম একবার লিখেছিলেন বড়র মধ্যে হীন-বৃত্তির লীলাখেলা প্রকট করাকেই বস্তুতন্ত্রতার রিয়ালিস্‌মের—পরাকাষ্ঠা বলা চলে না। সামান্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মহত্বও দেখানো চাই। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এ মহত্ত্ব সচরাচর প্রচ্ছন্ন থাকে বলেই সামান্যরা যখনই হঠাৎ মহৎ কি অসামান্যের মতন কীর্তিমান হয়ে ওঠে তখন আমরা একটু চমকে না উঠেই পারি না—মনে করি সে বুঝি তার স্বভাবকে ডিঙিয়ে গেল। কিন্তু আসলে ছোট যে থেকে থেকে আচম্‌কা মহৎ হয়ে ওঠে তার মূলে আছে এই অন্তরাত্মার সুগুপ্ত অভীপ্সা যাকে বাস্তব জীবনের লক্ষ দৈন্যগ্লানিও চেপে মারতে পারে না। অন্তরাত্মার এই নিহিত জ্যোতিকেই শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন সাইকিক প্রেরণা যে আমাদের নিরন্তরই ঠেলে নিম্ন-প্রকৃতিকে দুয়ো দিয়ে উর্ধ্বলোকের অভিসারী হ'তে। সাধারণ মানুষও থেকে থেকে এ-তাগিদ অনুভব করে বৈকি, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক তামসিকতা এ-প্রেরণাকে

কার্যকরী হ'তে দেয় না। মানুষ যে-অনুপাতে তার এই নিম্ন প্রকৃতির কবল থেকে মুক্তিলাভ করে কেবল সেই অনুপাতেই সে পারে স্বভাবের দুর্লংঘ্য তামসিকতাকে জয় করতে। অপিচ, এ-বিজয়াভিযানে যে সেই অনুপাতেই সাফল্য লাভ করে যে-অনুপাতে সে দেহপ্রাণ ও মনের রাজ্য ছাড়িয়ে পৌঁছায় অন্তরাত্মার রাজ্যে। শরৎদার মধ্যে আবাল্য এই সাইকিক শক্তি ছিল অসামান্য বলীয়ান্। তাই তিনি পেরেছিলেন সে-অসাধ্যসাধন করতে যার কথা আমাকে তিনি নানা ভাবেই বলতেন নানাসূত্রে। তাঁর মূল উক্তিটি ছিল এই: "মণ্টু, আমার বেলায় একটা জিনিস ঘটেছে ভারি আশ্চর্য। লোকে বলে যে মানুষের পরিবেশই তাকে গড়ে তোলে। কিন্তু আমার সমস্ত জীবনটাই যেন একথার জ্বলন্ত প্রতিবাদ। নৈলে ভাবো—কাদের মধ্যে আমি দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাটিয়েছি? —না মাতাল, নেশাখোর, বাউণ্ডুলে, বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলে, অস্পৃশ্য, পতিতা, লম্পট—কাকে ছেড়ে কাকে বলব? তাদের মধ্যে সম্ভবত খুনে বদমায়েশও মিলবে খুঁজলে। অথচ দেখ আমার বিকাশ এদের মধ্যে থেকেও তো বন্ধ হয়ে যায় নি। বরং এদের খুব কাছে থেকে দেখেছি বলেই না আমি হীনতম মানুষ ও ও পতিতা নারীর মধ্যেও দেখতে পেয়েছি মনুষ্যত্বের ও নারীত্বের কাঁচা সোনা—রাজ্যের ধুলো কাদায়ও যার দীপ্তি ম্লান হয় নি।"

এসম্বন্ধে তিনি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়েছিলেন ভুলতে পারব না কোনদিনই। গল্পটি তিনি আরো অনেকের কাছেই ক'রে থাকবেন, তবে হয়ত কারুর কারুর কাছে তিনি কিছু রেখে ঢেকেও ব'লে থাকতে পারেন, জানি না—কেন না তাঁদের কেউ কেউ আখ্যানটির পুনরাবৃত্তি করেন এইভাবে যেন এটি শরৎদার দেখা অভিজ্ঞতা নয়—কানে-শোনা কাহিনী। কিন্তু আমার কাছে তিনি অনেক কিছুই খোলাখুলি বলতেন, তাই আমি এ-অঘটনটি তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব'লেই অকুণ্ঠে পেশ করছি—অবশ্য তাঁর ভাষায় নয়—আমার নিজের ভাষায়। আমার স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য হলেও খুঁটিনাটিতে কিঞ্চিৎ ভুলচুক থাকা অসম্ভব নয়—চল্লিশ বছর আগে শোনা কাহিনী তো—তবে মূল বক্তব্যটি যে তিনি আমাকে যেভাবে বলেছিলেন সেই ভাবেই সাজিয়েছি একথা হলপ করে বলতে পারি।

শরৎদা বললেন: "আমরা সেদিন আমোদ করতে গেছি এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে—তার নাম, ধরো, প্রমোদ। তার হাতে তখন কয়েক হাজার টাকা জমেছে—

জমিদারের টাকা। সে বলল : 'চলো আজ একটু চুটিয়ে ফুরতি করে আসা যাক।' দেখি—তার পকেটে একতাল নোট, পাঁচ ছ'হাজার টাকা হবে।

"সদলবলে গেলাম একটি নর্তকীর বাড়ি। সে বেশ চটকদার মেয়ে—নাচতে গাইতে কথাবার্তা বলতে একেবারে চৌখস। আমরা ছিলাম অনেকে—কাজেই ডাকা হ'ল আরো কয়েকটি নর্তকীকে।

"খুব নাচগান চলতে লাগল মদের সঙ্গতে! প্রমোদবাবু দেখলাম মদ খেতে যত পটু সইতে তত নয়—আধবোতল কাবার হ'তে না হ'তে উঠলেন উজিয়ে—পকেট থেকে একের পর এক দশ টাকার নোট বার করেন আর বকশিস দেন নর্তকীদের : 'আরো মদ লাও, অওরৎ লাও'—ইত্যাদি। থেকে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন সগৌরবে। ভাবটা : কেমন? জমেছে কি না? বলি নি······?

"আমার দেখে শুনে কেবল মনে হ'তে লাগল লোকটার মাথায় রং একটু বেশী চ'ড়ে গেছে, নৈলে এহেন রসাতলে এসে লোক দেখিয়ে দানছত্র করে কেউ?

"অনেক রাত অবধি চলল হররা। একে একে মদ খেয়ে আমুদেরা ফরাসেই এলিয়ে পড়লেন। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগেছিলাম কিন্তু শেষ রাতের দিকে আমার চোখও ঘুমে জড়িয়ে এল।

"সকালবেলা ঘুম ভাঙল প্রমোদবাবুর হাহাকারে! চোখ চেয়ে দেখি তিনি বুক চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন—'হায় হায় সব চুরি গেছে গো, সব লোপাট! —পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা! কী হবে? এ-টাকা আমার নয়—জমিদারের উশুল করা খাজনা। ভেবেছিলাম দু'তিনশো টাকা এ থেকে খরচ ক'রে ফুর্তি ক'রে ফিরব—কিন্তু এবার—হায় হায় চাকরি তো গেলই, জেল অবধারিত······' ইত্যাদি ইত্যাদি—বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না!

"খোঁজ খোঁজ খোঁজ! কোথায় এ-ঘরের ঘরনী? দেখি পাশের ছোট ঘরে সে মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে—কোমরে শাড়ির আঁচলটা কোমরবন্দের মতন দু'তিন পাকে জড়িয়ে।

"তাকে জাগাতে সে চোখ কচলাতে কচলাতে সব শুনল। তারপরে প্রমোদবাবুকে বলল :

'আপনার কি মাথা খারাপ বাবু? নৈলে এত টাকা নিয়ে কেউ আসে এ-সব জায়গায়—যেখানে দু'চারটে টাকার জন্যে মেয়েরা ছাড়ে লজ্জাসরম, গুণ্ডারা করে খুনখারাপি? আমি তো থ হ'য়ে গিয়েছিলাম আপনার কাণ্ড দেখে—সবার সামনে

পকেট থেকে নোটের পর নোট বার ক'রে ফেলে দিচ্ছেন—এ কী ব্যাপার! দেখি সবারই চোখ আপনার পকেটের উপরে—কখন আপনি বেসামাল হবেন।

'ভেবেচিন্তে শেষে আমি করলাম কি—আপনি ঘুমে এলিয়ে পড়তে না পড়তে আপনার পকেট থেকে নোটের গোছাটা উঠিয়ে আমার আঁচলে বেঁধে দু'পাক জড়িয়ে কোমরবন্ধ মতন ক'রে ঘুরিয়ে পুঁটলিটা গুঁজে রাখলাম আমার তলপেটের দিকে—যাতে কেউ টানলেই আমার ঘুম ভেঙে যায়! এই নিন আপনার সে-টাকা বাবু—কিন্তু আর কখ্খনো করবেন না এমন বোকামি। ভাবুন তো, আমি যদি না লুটে নিতাম তা হলে কী হত? পুলিশ ডাকতেন? কিন্তু পুলিশ কাকে ধরত শুনি এক ঘর লোকের মধ্যে?'

"ব'লে মণ্টু"—বললেন শরৎদা—"মেয়েটি উল্টোপাকে শাড়ির আঁচল কোমর থেকে খুলে গোটা নোটের তাড়াটা বের ক'রে দিল প্রমোদবাবুর হাতে।

"এখন একবার ভাবো ব্যাপারটা! পাঁচ ছ' হাজার টাকা কিছু অঢেল টাকা নয় মানি, কিন্তু যে-মেয়ে দু'চার টাকার জন্যে প্রত্যহ দেহকে পণ্য করে তার কাছে পাঁচ ছ' হাজার টাকা কি লাখ টাকার সামিল নয়? তাছাড়া এ-হেন ক্ষেত্রে—যেখানে টাকাটা গাপ করলে কেউই ধরতে পারত না—সে শুধু হৃদয়ের একটি সহজ অনুকম্পা ছাড়া আর কোন্ নীতিবাদের তাগিদে এত টাকা যেচে ফিরিয়ে দিল বলবে—এত টাকা যা সে হয়ত সোম বৎসরেও রোজগার করতে পারত না! আরো দেখ মণ্টু, মানুষ অনেক সময়ে মহৎ কাজ করে লোকের তারিফ পেতে। কিন্তু এখানে সে স্বার্থ ছেড়ে পরার্থ বরণ করেছিল কার প্রশংসা পেতে? প্রশংসা? বরং বলা যায় নাকি যে তার আশপাশের সখী ও সঙ্গীরা তার এ-মূঢ়তা নিয়ে হাসাহাসি ক'রে থাকবে—যেমন বদমায়েশ সাক্ষীরা ক'রে থাকে যদি কোনো সাক্ষী ভুলে সত্যি কথা ব'লে ফেলে? এই অসতীটিকে আমি কতদিনই যে মনে মনে প্রণাম করেছি—অনেক সতী শিরোমণির চেয়েই সতীত্ব-গৌরবে না হোক, নারীত্ব-গৌরবে বড় ব'লে।"

সমর্সেট মমের একটি লেখায় পড়েছিলাম: "আমি ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই মনেপ্রাণে সিনিক হ'তে পারব না যতদিন দেখব মানুষ পরের উপকার করতে ছুটছে নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে।" কিন্তু শরৎদা তাঁর নানা লেখার মধ্যে দিয়ে আরো একটি আশ্চর্য সত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এজাহারে: যে, মানুষ যতই কেন দুর্বৃত্ত বা মেয়েরা যতই কেন পতিতা হোক না, তাদের মধ্যে

বিবেকবুদ্ধির শেষ স্ফুলিঙ্গ কিছুতেই নিভে যায় না। এই কথাই বলেছেন আমাদের শাস্ত্রীরা যে এমন কোনো পাপীই নেই যে বলতে পারে: "আমি ভগবানের সঙ্গে সব বোঝাপড়া শেষ ক'রে বনেছি ঘোর রসাতলের চিরনারকী।" শরৎবাবু আমার কাছে মানুষের নানা ভান ও ভড়ংকে নিয়েই হাসাহাসি করেছেন। তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রম মঠকে নিয়ে ব্যঙ্গও করেছেন কিন্তু কখনো তাঁকে বলতে শুনি নি যে কোনো দুর্বৃত্ত বা অসতী এমন কালো নরকের অতল স্পর্শ করতে পারে যেখান থেকে তার আলোর স্বর্গে ফেরার সব রাস্তাই বন্ধ। তিনি আমাকে বহুবারই বলতেন: "মানুষকে অপমান করতে নেই মণ্টু—খ্রীষ্টানদের মতন বলতে নেই যে কেউ এমন পাপ করতে পারে যার প্রায়শ্চিত্ত নেই।" গীতার ঠাকুর এই কথাই বলেছেন ভগবতী কৃপার সংজ্ঞা নির্ণয়ে যদিও একটু অন্যভাবে:

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অতি দুরাচারও অনন্যমনে যদি ডাকে কভু আমারে—তবে বিবেকী অধ্যবসায়ী সাধুর পদবী তাকে দিতেই হবে।

শরৎদার কাছে এ-ভাবে নানা সূত্রেই দীক্ষা পেতাম তিতিক্ষার, ক্ষমার, দরদের। কিন্তু আর একটি শিক্ষা পেয়েছি তাঁর কাছে যার বাংলা কোনো অভিধা নেই, যাকে ইংরাজিতে বলে suspension of judgment: কথাটা একটু ফলিয়ে বলি, কেন না বলবার মত যদিও এ-সম্পর্কে ঠিক যে শিক্ষাটি পেয়েছি তার সংজ্ঞা-নির্ণয় করা খুব সহজ নয়।

বিলেতে অনেক বড় মনীষীর লেখায়ই পড়েছি মানবচরিত্রের একটি দুরন্ত প্রবণতার কথা: যে, আমরা অপরের সম্বন্ধে ভালো কথা শুনে অনেক আনমনা হ'লেও অপবাদ নিন্দা কুৎসা রটনা শুনতে না শুনতে শুধু যে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠি তাই নয়, সরাসরি বিশ্বাস ক'রে বসি। শেক্সপীয়ার কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন:

The evil that men do lives after them:
The good is oft interred with their bones.

অর্থাৎ

অহিতি দুষ্কৃতি যত মৃত্যুপারে রয় চিরঞ্জীবী:
সুকৃতি সমাধি লভে আমাদের দেহ-অস্থি সাথে।

এ-সমস্যা নিয়ে যুগে যুগে চিন্তানায়কেরা বড় কম ফাঁপরে পড়েন নি।

মানুষের সহজ প্রবণতা—শুভের দিকে, না অশুভের দিকে? মানব-প্রকৃতি মূলতঃ ঊর্ধ্বগামী না নিম্নগামী? মানুষকে শেষ পর্যন্ত চালায় স্বার্থ না পরার্থ? মানুষ ষোলো আনা স্বাধীনতা পেলে দাঁড়াবে মদমত্ত স্বার্থপর, না করুণার্দ্র শুভব্রতী? এক কথায়, যুগে যুগে আমাদের দেহ মন প্রাণ খতিয়ে হ'য়ে এসেছে দেবতার লীলাভূমি, না পিশাচের কুরুক্ষেত্র?

মানুষ ভালো পরিবেশে জন্মালে জগতের নারকীয় কাণ্ড কারখানার বেশি খবর রাখে না ব'লেই ধ'রে নেয়: "All is well with the world"—ভল্‌টেয়ার এ-চলতি বুলিটিকে অভ্রান্ত ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর Candide-এ। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জগতের ব্যাপক ভণ্ডামি, স্বার্থান্ধতা, নিষ্ঠুরতা, কুকীর্তি, খুন-খারাপি, জাল জুয়াচুরির যতই খবর পাই ততই যেন আমাদের চোখ খোলে—আর অমনি কি হয়? না, আমাদের সরল আশাশীলতা—Optimism—স্তিমিত হ'য়ে আসে, আমরা উত্তরোত্তর হ'য়ে দাঁড়াই বিষাদবাদী—Pessimist, কিংবা সিনিক—মনুষ্যত্বে বীতশ্রদ্ধ।

শরৎদা আশৈশবই মানব চরিত্রের নানা দুরপনেয় দুর্বৃত্তির খবর রাখতেন ব'লে তাদের খোলা চোখেই দেখতে শিখেছিলেন। তাই তিনিও কোনো মোহময় আরামদায়ক ভাববিলাসের ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে পারতেন না, বলতেন প্রায়ই: "যতই জীবনকে দেখি মণ্টু, ততই যেন ধাঁধা লাগে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের প্রশ্ন মনে পড়ে: কা চ বার্তা কিম্ আশ্চর্যম্ কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে? যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই যেন মনে হয় আমার যে, এ চারটির একটি প্রশ্নেরও উত্তর আমি জানি না। এক কথায়, কোন্ পথে আমরা চলেছি ভেবে যেন থই পাই'নে।

আর যতই পড়ি অথই জলে ততই ভাবি—শিল্পীর কাজ হয়ত পথের নির্দেশ দেওয়া নয়, তার কাজ সমস্যার রূপটি ধ'রে দেওয়া মাত্র। অর্থাৎ যা দেখছি যা ভাবছি তার হদিশ দেওয়া—সমাজের সংস্কার করার ভার আমাদের নয়—সে করুন তাঁরা সংস্কার করা যাঁদের স্বধর্ম।

শরৎদা তাঁর এই মতটি আমাকে প্রায়ই বলতেন: "মণ্টু, কবি বলেছেন তাঁর অপরূপ সাজাহান কবিতায়: 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' আমি এর সঙ্গে আর একটু জুড়ে দিতে চাই: যে, মানুষের কুকীর্তিও তার ভিতরকার আসল মানুষটিকে পুরো ছাপিয়ে যেতে পারে না। তাইতো নিয়তির হাজারো চাপেও

একটু ফাঁক পেলেই ঘোর দুর্বৃত্তও থেকে থেকে এমন সব অদ্ভুত কাজ ক'রে বসে যে মহৎতম মানুষের চোখেও জল আসে শ্রদ্ধায়, আনন্দে, গর্বে, যে মানুষের মনুষ্যত্ব —ঐ আকাশের আলোর মতনই—ম'রেও মরে না, নিভেও নিভে না। সময়ে সময়ে আমার মনে হয় এই জন্যেই বুঝি গীতায় বলেছে যে একে ছিঁড়লেও ছেঁড়া যায় না, পোড়ালেও ছাই করা যায় না, ধুলোবালি চাপালেও ময়লা করা যায় না, শুষে নিলেও নস্যাৎ করা যায় না। তোমাকে তাই বলি মণ্টু, আমি কোমর বেঁধে দুর্নীতি প্রচার করতে কলম ধরি নি, আমি মানুষের মধ্যে সেই গোপন মানুষটির মহিমাই নানা ভাবে এঁকে সবার সামনে ধরেছি যা সবার চোখে পড়ে না। মানুষের মধ্যে ঘৃণ্য অনেক কিছু আছে দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে এখনো আমি এ ইঙ্গিত করি নি যে ঘৃণ্যতাই তার আসল স্বরূপ। আমি চেয়েছি দেখাতে যে মানুষের হাজার ত্রুটি, অপরাধ পদস্খলন হোক না কেন, তার অন্তরের অন্দরমহলে একটি অনির্বাণ আলো জেগে থাকেই থাকে—তাকে আত্মাই বলো, মনুষ্যত্বই বলো বা অন্তর-দেবতাই বলো। এই জন্যেই মন্দ চরিত্র আঁকবার সময়েও আমি কোনো দিন ভুলি নি যে হাজার ঘৃণার কাজ করলেও মানুষ ষোল আনা ঘৃণ্য বা পিশাচ ব'নে যায় না। অথচ আশ্চর্য এই যে পৈশাচিক কাজ ক'রেও যে কোনো মানুষই পুরোপুরি পিশাচ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না এই সনাতন সত্য তত্ত্বটিকে আমার সৃষ্ট চরিত্রের ভাষ্যে ফুটিয়ে তোলার অপরাধে নীতিবাদীরা সবাই রৈ রৈ ক'রে উঠেছেন—আমি অশ্লীল, দুরাচার, নোংরামির পূজারী! আমার জানতে ইচ্ছা হয় এই নীতিধ্বজেরা ঋষি টলষ্টয়কেও দুরাচার বলেন কি না—তাঁর Resurrection উপন্যাস লেখার জন্যে—যার নায়িকা স্বৈরিণী।"

শরৎদা খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন তাই তাঁর কোনো বইয়ের নিন্দা রটলে মর্মাহত হ'য়ে নানা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরই নজির দিতেন। যথা, ডস্টয়েভস্কি খুনের চরিত্র এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর চরিত্র এঁকেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর চরিত্র এঁকেছেন—ইত্যাদি।

আমাদের দেশে তিনটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল: রবীন্দ্রনাথ, পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরৎচন্দ্র। তিনটি মানুষই শক্তিতে নিটোল, প্রতিভায় অনন্যতন্ত্র ও ব্যক্তিরূপের বিকাশে অপরূপ। এঁদের প্রত্যেকের চরিত্রেরি নানা দিক আছে যেখানে একের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই। কিন্তু এক জায়গায় এঁরা পরস্পরের একান্ত আত্মীয়

—স্পর্শকাতরতায়—যার ইংরাজী নাম হল sensitiveness : তিন জনই সমালোচকের নিন্দায় অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। বাল্যস্মৃতিতে আমার রাঙা জ্যেঠা-মহাশয়ের কথা লিখেছি, তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন কিন্তু শিল্পীর ব্যথা ঠিক বুঝতে পারতেন না। তাই একদিন আমাকে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন (স্পষ্ট মনে আছে, একটুও বাড়ান নয়) "জানিস মণ্টু, রবিবাবুর বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধটি প'ড়ে আমি একবার তাঁকে জোড়াসাঁকোয় উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করি। বলি—'এ প্রবন্ধ আপনি ছাড়া আর কারুর হাতে বেরুতেই পারত না।' শুনে তাঁর সে কি আনন্দ! আমাকে বললেন কি জানিস? বললেন—'হরেনবাবু! আমার লেখাটি আপনার ভালো লেগেছে এতে যে কি খুশি হয়েছি বলতে পারি না। কারণ সত্যি বলছি, হরেনবাবু, আমি এত যত্ন নিয়ে লিখি যে আমার লেখার কেউ নিন্দা করলে আমার বাস্তবিকই ভারি কষ্ট হয়।' অবিকল এই কথাগুলি বললেন—রবীন্দ্রনাথের মতন প্রতিভাধর—একবার ভাব্‌রে, ভাব্!"

কথাটি মনে আছে আরো এই জন্যে যে রাঙা জ্যেঠামহাশয়ের এই মন্তব্যটির আলোয় যেন আরো পরিষ্কার হদিশ পেয়েছিলাম নিন্দাবাদে পিতৃদেবের বেদনার। বেশ মনে আছে তাঁর লেখার তীব্র নিন্দা করলে তিনি সময়ে সময়ে রাত্রে ঘুমতে পারতেন না, একলা পায়চারি করতেন বারান্দায়। মাঝ রাতে জেগে উঠে বাইরে যেতেই চোখে পড়ত। বলতাম: "এখনো পায়চারি করছেন বাবা? পায়ে ব্যথা হয় না আপনার?" তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলতেন: "ঘুমোই তো রোজই রে? মাঝে মাঝে আকাশের "অঘুমন্তদের সাথী হওয়া মন্দ কি?"

শরৎচন্দ্রের বেলায়ও ঐ কথা। স্পষ্ট মনে আছে একদিন তাঁকে বলেছিলাম পিতৃদেবের নিন্দায় ব্যথিত হ'য়ে এই রাত জাগার কথা। বলেছিলাম: "আমি জানতাম অবশ্য যে তিনি দুঃখের উত্তেজনায়ই ঘুমতে না পেরে গভীর রাতে পায়চারি করতেন, কিন্তু বলুন তো শরৎদা, আপনিও কি নিন্দায় এতটা বিচলিত হন? শরৎদা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: "সাহিত্যিক যখন হবে তখন নিজের মনের এজাহারেই এ প্রশ্নের জবাব পাবে মণ্টু!" আমি নাছোড়বন্দ, বললাম: "তবু"? শরৎবাবু বললেন: "তবু কি! কেউ চাব্‌কালে ফোস্কা পড়বে না—এ কখনো হয়?"

রবীন্দ্রনাথের বেদনাবোধ ছিল একটু অন্য ধরনের—স্বভাব-সংযমী এই সূক্ষ্মাভিমানী মানুষটি একটু রাগতে না রাগতে রাশ কশতেন। একদিন আমাকে

বলেছিলেন—তিনি একবার খু-ব রেগে অস্বস্তি বোধ করছেন এমন সময়ে তাঁর কাছে তাঁর এক প্রিয় ছোট্ট ভাইঝি এসে গল গল ক'রে অনর্গল কত কী ব'লে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখে পিছন থেকে। তখন তিনি একটি চেয়ারে ব'সে। বললেন : "তার নরম হাতের ছোঁয়ায় আমার সব রাগ যেন জল হ'য়ে গেল···মনে হ'ল আমি বুঝি এইটুকুর জন্যেই তৃষিত ছিলাম।"

আমি (হেসে) : আপনাকে দেখে তো মনে হয় না আপনি "খু—ব রাগতে" পারেন।

রবীন্দ্রনাথ (ততোধিক হেসে) : পারি না ? ঈ—স্ তুমি একবার বলে দেখ তো—আপনি অকবি।

আমি : এমন উদ্ভট কথা কোনো সুস্থমস্তিষ্কের মনে আসতে পারে নাকি ?

রবীন্দ্রনাথ : পারত হে এক সময়ে—খুব পারত। তুমি জানো এক সময়ে আমাকে সুস্থমস্তিষ্করা কী গালটাই দিতেন আমি ছন্দ জানি না বলে ?

আমি : জানি। একদিন খুব পুরানো ভারতীতে পড়েছিলাম কোন এক ধুরন্ধরের সমালোচনা যে আপনি কবি হ'তে পারতেন কেবল ছন্দের কান নেই ব'লেই পারলেন না—না, ঐ ধরনেরই একটা মন্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ : না হে না—তার চেয়ে অনেক বেশি। আর এসব কথা শুনে আমার সময়ে সময়ে রাগ চ'ড়ে যেত। তবে আমার একটা মস্ত বাঁচোয়া আছে এই যে আমি রাগবামাত্র আমার মন আস্বস্ত হয়ে বলে : করছ কী ! সামলাও। অম্‌নি আমি করি কি নিজেকে নিরীক্ষা সুরু করি—আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই দুই কানের পাশ দিয়ে গরম রক্ত মাথায় উঠছে। যেই টের পাওয়া অমনি সাবধান হওয়া।

আমি : তাই না আপনার তুলনা এক আপনি।

রবীন্দ্রনাথ (হেসে) : ঐ দেখ মন খুশি করে দিলে। হ্যাঁ হে হ্যাঁ, আমি শুধু রাগতেও জানি না, খুশি হতেও জানি—মানে চট করে খুশি হই। তাছাড়া আমার মনের মধ্যে একটা চক্ষুলজ্জা আছে—সে বলে ক্ষোভের অনুভবে তত ক্ষতি নেই—কেন না তার বেদনা আমার ব্যক্তিগত, কিন্তু প্রকাশে শুধুই লজ্জা, কেন না তার ফল সার্বজনীন।

এ-কথাগুলির ভাষা খানিকটা আমার হলেও ভাবটা যে তাঁর নিজের একথা হলপ ক'রে বলতে পারি। এ নৈশ্চিত্যের একটি কারণ—তিনি এমন অপরূপ ভাষায়

মনের ভাব প্রকাশ করতেন যে শোনার পরে মনে রাখার চেয়ে ভুলে যাওয়াই হ'ত কঠিন। তাছাড়া তাঁর নানা ফালতো উক্তি নিয়েই বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আলোচনা করার ফলে স্মৃতির ফলকে সে-সব কথার উপর পুনরুক্তির দাগা বুলিয়ে রেখাগুলি গভীর হয়ে উঠত। অপিচ, বিলেত থেকে ফেরার পরে তাঁর নানা উক্তিই আমি তখনি তখনি টুকে রাখতাম—যে-সব উদ্ধৃতি আমার তীর্থংকরে ও Among the Great-এ ছেপেছি। কিন্তু এছাড়াও তাঁর কত সুন্দর সুন্দর কথা যে শুনে ভুলে গেছি ভাবতে আজ দুঃখ হয়। মনে হয় কুড়েমি না ক'রে সে-সবই লিখে রাখা উচিত ছিল। বলতে না বলতে—কী আনন্দ!—মনে পড়ে গেল তাঁর একটি চমৎকার রসিকতা—যাঁরা জহুরি তাঁরা মানবেনই মানবেন যে আমার এ-মূল উদ্ধৃতিটি জীবন থেকেই নেওয়া, স্বকপোল-কল্পিত নয়। যখন শরৎদার দেহান্তের পরে তাঁর নানা ভক্ত তাঁর নানা আলাপের নমুনায় মাসিক পত্রিকাগুলি ছেয়ে ফেলেন তখন তিনি একদিন আমাকে করুণ হেসে বলেছিলেন: "শরৎ আমার আগে চ'লে গিয়ে আমাকে শুধু ব্যথাই দেয় নি দিলীপ, ভয় পাইয়ে দিয়েছেও কম নয়।"

আমি: সে কি?

রবীন্দ্রনাথ: আর "সে কি?" শরতের দুর্দশা দেখে মনে হয় আজকাল যে ম'লেও বুঝি আমার হাড় জুড়োবে না—আমার মুখেও না জানি কত শত লোক এইভাবে কত কথাই না চাপিয়ে দেবে—অথচ তখন আমার প্রতিবাদ করারও জো-টি থাকবে না। তাই মরতে আজকাল রীতিমত ভয় করে—সত্যি বলছি।

চার

পথ চলতে কত কীই চোখে পড়ে। এমন হয় অনেক সময়েই যে, যখন দেখি অভিভূত হই, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতে যাই ভুলে। আবার এমনও হয় যে যখন দেখি তখন মনে হয় না আশ্চর্য কিছু দেখলাম, কিন্তু যত দিন যায় মনে হয়: "এ কী? এঁকেও চিনতে পারি নি? আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা ক'রে কত কী বলেছিলেন, ভেবেছিলাম শুধুই ঠাট্টা?" শ্রীঅরবিন্দ একবার আমাকে লিখেছিলেন যে, আইরিশদের স্বধর্ম হ'ল গম্ভীর কথা চটুল ভাবে বলা*। প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে যখন গুরুদেব একথা আমাকে লেখেন, শ-র তারিফ ক'রে, তখন আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল

---

*"It is the native Irish turn to speak lightly when in dead earnest"—অনামী, ৩৩৫ পৃষ্ঠায়।

একটি মানুষের কথা যিনি ঠিক এই ভাবেই কথা কইতেন—গভীর কথা, ভাববার কথা বলতেন হাসি-মস্করার সুরে। এ-মানুষটির নাম উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিখ্যাত বিপ্লবী, সাহিত্যিক, সমালোচক, সর্বোপরি অগ্নিযুগে শ্রীঅরবিন্দের সতীর্থ, বারীনদার পরম বন্ধু, দেশবন্ধুর স্নেহপাত্র—কত উপাধি দেব? শ্রীঅরবিন্দ আমাদের একবার বলেছিলেন: "You could not have a dull moment when Barin or Upen was there." এই দুটি মানুষকে কেমন দেখেছি বলব আজ। প্রথমে বলি উপেনদার কথা—তার পরে পাড়ব বারীনদার প্রসঙ্গ।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন বলিষ্ঠ পুরুষ—বটেই তো। যে-দুঃসাহসী সর্বস্ব পণ ক'রে আগুনে ঝাঁপ দেয় ও বারো বৎসর আন্দামানে কাটিয়ে ফিরে এসেও অম্লান হাস্যরসের তুফান তুলতে পারে, তাকে দুর্বল বলবে কে? অথচ তাঁকে দেখতে প্রথমটা মনে হ'ত নিছক ভালোমানুষ। চোখ মিটমিট ক'রে তাকাতেন যখনই কেউ কিছু বলত, শুনতেন খুবই মন দিয়ে, কিন্তু যা তাঁর মন নিত না তাকে যে শুধু গ্রহণ করতেন না তাই নয়, দিতেন স্রেফ হেসে উড়িয়ে—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিতেন চোখা চোখা ব্যঙ্গবাণে। দেশবন্ধু তাঁর এই বলিষ্ঠ রসিকতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যখন তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা "নারায়ণ" প্রকাশিত হয় তখন উপেনদা ও বারীনদা দুজনে মিলে ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত। বলা বাহুল্য, এই দুটি আশ্চর্য মানুষ বিকশিত হয়েছিলেন স্বকীয় ছন্দেই, কারণ উভয়েই ছিলেন স্বভাবে বলিষ্ঠ ও স্বধর্মে অনন্যতন্ত্র। কিন্তু এক জায়গায় দুজনের গভীর মিল ছিল: উভয়েই ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পরমভক্ত। স্বদেশী যুগে বারীনদা ছিলেন গুরুদেবের প্রধান বাহন, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ নেতা হিসেবে তেমন নাম করতে না পারলেও যারাই তাঁর নিকট-সংস্পর্শে আসত, মুগ্ধ হ'ত তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তায়, রসিকতায় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে। তা ছাড়া বাংলার রসসাহিত্যে তাঁর ক্ষুরধার ব্যঙ্গ কীভাবে দুদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাঁরা সবাই জানেন—যাঁরা তাঁর বিখ্যাত উনপঞ্চাশীর তীক্ষ্ণ সরস সমালোচনা, কি তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা"-র উপাদেয় আত্মজীবনী পড়েছেন।

মনে আছে একবার আলিপুরে উপেনদাকে নিয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের কাছে। কবি তখন শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের অতিথি। সে-অবিস্মরণীয় অপরাহ্নে উপেনদার সঙ্গে কবির রসালাপ উপভোগ করেছিলাম আমরা সবাই। উপেনদা কবিকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি করলেও স্বভাবে ছিলেন—যাকে চলতি ভাষায় বলে মুখফোঁড়। কাজেই কবির সঙ্গেও তর্ক করতে তাঁর বাধে নি। কাউকেই তো রেয়াৎ ক'রে

কথা কইবার পাত্র ছিলেন না তিনি—এমন কি তাঁর গুরু শ্রীঅরবিন্দকেও নয়। তিনি কীরকম বেপরোয়া ছিলেন তার একটি উদাহরণ দেই।

কবি বলছিলেন বাঙালি বড় আত্মঘাতী জাতি। এ-কথা কবি আমাদের কাছে একাধিকবার বলেছেন—প্রশান্ত ও তজ্জায়া রাণী মাসী আমাকে নিশ্চয় সমর্থন করবেন—কিন্তু সেদিন কথায় কথায় কথা বেড়ে উঠল। কবি ব'লে চললেন বাঙালি জাত কিভাবে ব্রণান্বেষী। আমি বললাম: "বিবেকানন্দ স্বামীও বলতেন একথা, তাঁর নানা পত্রেই লিখেছেন যে বাঙালির মধ্যে পরশ্রীকাতরতা মজ্জাগত!" কবি বললেন: "বাঙালি ক্রমশঃ পেছিয়ে যাচ্ছে আরো এই জন্যেই। যাকে ধ'রে আমরা উঠব তাকেই যদি খাটো করি তাহ'লে ক্ষতি তারই বেশি যে উঠে দাঁড়াতে চায়" ইত্যাদি। উপেনদা খুব মন দিয়ে শুনলেন চোখ মিটমিট ক'রে। পরে বললেন: "কবি! যদি অভয় দেন তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।" কবি হাসলেন: "তুমি যে স্বভাবে ভয়কাতুরে এমন পরিচয় তো পাইনি এর আগে?—তবে এ বুঝি বিনয়বচন!" উপেনদা মুচকে হেসে বললেন: "আমি বিনয়ী এ অপবাদও আমার অতিবড় শত্রুতেও রটায় নি। কিন্তু সে যাক, আমার প্রশ্নটা ছিল এই: বাঙালির দোষ অজস্র—মানি। কিন্তু একটি কথা বলুন তো কবি, বুকে হাত দিয়ে?—ভবিষ্যৎ জন্মে আপনি বাঙালি ছাড়া আর কোনো জাতের মধ্যে জন্ম নিতে চান কি না? ভোজপুরী, কি বিহারী, কি উৎকলবাসী, কি তামিলনাড? কোন্‌টা? কবি হেসে বললেন: "আমার একটি গান আছে: মেনেছি হার মেনেছি।"

এ-হেন প্রখরপ্রভ রসিক মানুষটির সঙ্গে ঠিক কবে কী সূত্রে পরিচয় হয় মনে করতে পারছি না। তবে মনে আছে তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা" তথা "ঊনপঞ্চাশীর" নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প'ড়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম তাঁর কথা। রবীন্দ্রনাথ আমার মুখে তাঁর স্বাধীন চিন্তার কথা শুনে তাঁকে দেখতে চান ব'লেই আমি উপেনদাকে কবির কাছে নিয়ে যাই, অনেক তুতিয়ে পাতিয়ে। "তুতিয়ে পাতিয়ে" বলছি এইজন্য যে উপেনদা বড়লোকের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতেই চাইতেন, প্রায়ই বলতেন: ওরে ভাই বড় যে তাঁকে দূর থেকে দেখাই ভালো—কাছ থেকে দেখলে অনেক সময়ই স্বপ্নভঙ্গ হয় যে। তাছাড়া আমি স্বভাবে কালাপাহাড় যে দাদা, ভয় করে মহাজনের কাছে গিয়ে যদি অভাজন সেজে মুখ সামলে, ঠুঁটো জগন্নাথটি সেজে ব'সে থাকতে না পারি? কাজ কি?"

আমি পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে একবার তাঁকে বলেছিলাম যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে

আমি (সকুণ্ঠে) : কোনোদিনই না ?

উপেনদা : অন্তত যতদিন এ-ধড়ে প্রাণ থাকবে ততদিন না—কেমন ? রাজি ?

আমি (হেসে) : কার ধড়ে কতদিন প্রাণ থাকবে কে বলতে পারে উপেনদা ? হয়ত আমার ধড়টিকে নিয়েই আপনাকে রওনা হ'তে হবে নিমতলায় বলতে বলতে : হায় হায় যা তাকে বলেছিলাম গুপ্তই রয়ে গেল !

উপেনদা : ষাট্‌ ষাট্‌ বালাই। তোমার অজস্র শত্রুরা যাক নিমতলার ঘাটে, তুমি সতীর অক্ষয় সিঁদূর হয়ে বেঁচে বর্তে থাকো—ও হো হো, ভুল হ'য়ে গেছে—তুমি বুঝি আজো কুমারী—না ?

আমি (হেসে) : কেন ? মিষ্টি ঠুংরি গজল গাই ব'লে ?

উপনেদা : ও কি কথা ! এইমাত্র কি "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে" গাইলে না—সিংহনাদ ক'রে ? না দাদা, তুমি সিপাইকা ঘোড়া মানি। তবে কি জানো ? শুনেছি তুমি বিষম বোষ্টম, তাই ভেবেছিলাম যে তোমার মত এই যে, এ সংসারে পুরুষ এক কেষ্ট ঠাকুর আর সবাই ললিতা সখী।

আমি (হেসে) : আপনার সঙ্গে কথায় কে এঁটে উঠবে উপেনদা ? আমি তো সরলা অবলা বালা। বলুন তার চেয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন।

উপেনদার মুখের হাসি নিভে গেল, বললে : "দাদা, শোনো বলি তবে। আমি দেখতে নাবালক হ'লেও অনেক ঘাটেরই জল খেয়ে কুটীচক হ'য়ে ব'সে আছি। দেখেছি অনেক বড় বড় মানুষকে—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার বলবার—ঐ যা তুমি শ্রীমুখে এইমাত্র উচ্চারণ করলে—ভুলবার নয়—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর ছাঁচটি গ'ড়ে কুমোর মারা গেছে আর ছাঁচটিও গেছে ভেঙ্গে—কাজেই অমন সৃষ্টি আর হবে না দাদা !

আমি : এ তো ঠিক "অবিশ্বাসী"-র অঙ্গীকার ব'লে মনে হচ্ছে না, দাদা ?

উপেনদা : আমার অবিশ্বাস শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে নয়, দাদা ! তাঁর তুলনা এক তিনিই। অমনটি বাংলা দেশে হাল আমলে আর হয়নি—পরে কখনও হবে কিনা কে জানে ? আর যা যা দিয়ে তাঁকে বিধাতা গ'ড়েছেন সে-সব মাল-মশলারও খবর আমি রাখি না। তাই তাঁকে দেখলে হই থ, বুঝতে গিয়ে পড়ি অথই জলে। কিন্তু তবু আমি আজো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে মানবপ্রকৃতির আমূল রূপান্তর হবে কোনো অতিমানস শক্তির রসায়নে। তিনি অবশ্য পার্থসারথির মতনই পাঞ্চজন্য

বাজিয়ে বলেছেন এ হবেই হবে, কিন্তু দাদারে, প্রতি আবির্ভাবের পরে জগতে দেখলাম শুধু কুরুক্ষেত্রই—টেঁকসই ধর্মক্ষেত্র তো কই আজ পর্যন্ত চোখে পড়ল না একটিও। তাই আমার সংশয় আছে—তিনি যা বলছেন তা সত্যিই ঘটবে কি না। (একটু থেমে) আমার ভাবখানা কী জানো দাদা? ভগবান্ ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটছেন একথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ছোট্ট ঘটিটিও যদি তিনি ক্ষীরে ভরতি করতে না পারেন তবে সে-ক্ষীরোদচন্দ্রকে নিয়ে আমি করব কী? পেতে শোব, না গায়ে দেব? কিন্তু তোমাকে তবু বলি আরো কিছু। আমি সত্যিই অবিশ্বাসী নই। শ্রীঅরবিন্দকে যে একটু কাছ থেকেও জেনেছে তার পক্ষে নাস্তিবাদী হওয়া আর সম্ভব নয়। আমি নিছক চোখবাঁধা বলদ নই ভাই, খোলাচোখেই কিছু কিঞ্চিৎ দেখেছি। তাই মানি অঘটনের কথা। আমার মনের কালো ক্যামেরাতেও যে পড়েছে তাঁর উপাস্য আলোর দুচারটে ফালতো রশ্মি। আমি যে দেখেছি—যে-আমিকে নিয়ে আমরা রোজ ঘর করি অথচ কোনোদিনই চিনতে পারি না, মাপতে পারি না, এমন কি তার মতিগতির দিশা পেতেও বেগ পাই পদে পদে—সে-আমির চারদিকে অনেক কিছুর খেলাই চলছে যার জোরে সে আজো টিঁকে আছে। (হঠাৎ) শ্রীঅরবিন্দের কুটুমি কবিতাটি পড়েছ কি?

আমি : পড়েছি। কেন?

উপেনদা : তার শেষে আছে শ্রীঅরবিন্দের একটি ধ্যানকল্পনা যে, এক মহাত্মা বলেছেন যোগ ফের দেওয়া হবে মানুষকে, নাস্তিকতা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে, জ্ঞান প্রেম ও সৌভ্রাত্রের রটবে জয়জয়কার—যার ফলে এ কলিযুগেও হবে ফের রাম-রাজ্যের পত্তন।* কিন্তু আমার কুসুম কোমল মনে সংশয়ের কুটিল তক্ষক ঢুকেছে—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যাঁরা বহুদিন দহরম মহরম করেছেন তাঁদের হালচাল দেখে। আমি যে চাক্ষুষ করেছি দাদা এই দারুণ হৃদয়-ভেঙে-দেওয়া সত্যটি যে অমুক অমুক অমুক ১৯১০ সালে ঠিক যা ছিল আজও অবিকল তাই আছে—"দিব্য জীবনে"র কোনো ছিটে-ফোঁটাও পায় নি। এ-শোচনীয় সত্যটিকে একসময়ে আমি গায়ের জোরে অস্বীকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরে যখন দেখলাম—(ব'লে কয়েকটি

* শ্রীঅরবিন্দের Kutumi কবিতাটির শেষ লাইন কয়টি এই :

The yoga shall be given back to men,
The sects shall cease, the grim debates die out
And atheism shall perish from the earth·········ইত্যাদি

দৃষ্টান্ত দিয়ে)—তখন শুধু এই সান্ত্বনাকে জপমালা ক'রে ব'সে আছি যে হাজার পঞ্চাশ বৎসর বাদে হয়ত ঘটবে কর্তার ইষ্ট অতিমানসের অবতরণ। কেবল দুঃখ এই তুমি আমি সে "সম্ভবামি"-কে দেখে যেতে পারব না।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, উপেনদার কথাগুলির অনুলিপি এ নয়। আমি শুধু চেয়েছি তাঁর মূল বক্তব্যটি পেশ করতে—যতটা সম্ভব তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে। তাঁর মতামত যে এইই ছিল (অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতির বদল হয় না) একথা ইতি-পূর্বে আমি আমার Sri Aurobindo came to me বইটিতেও লিখেছি। এক্ষেত্রেও যে আমি তাঁর মুখে নিজের কথা চাপিয়ে দিই নি, তাঁর মতামতই পেশ করেছি এ বিষয়ে আমার মনে সংশয়ের লেশও নেই, কারণ শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ধ্যান বাণী সাধনাদি নিয়ে উপেনদার সঙ্গে আমার বহুবারই তর্কালোচনা হয়েছে। তিনি এক-দিকে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্বে গভীর বিশ্বাসী, অন্যদিকে তাঁর বাণী সম্বন্ধে সংশয়ী। তাঁর একটি মূল ধারণা ছিল এই যে মহাজনরা আজন্ম মহাজন হ'য়ে আদি মধ্য ও অন্ত্য লীলা পোষ্টাই ক'রে গেলেও অভাজনরা তাঁদের ধামা বাজিয়ে মহাজন হ'তে কোনোদিনই পারে নি, পারবে না। সেদিনও আমাকে বলেছিলেন—আমি আজো ভুলতে পারি নি তাঁর বলার ভঙ্গিটির বৈশিষ্ট্যের জন্যেই—"জানো দিলীপ, আমি স্বভাবে শুধু অবিশ্বাসীই নই, উদ্ধতও বটে। তাই মহাজনকে মহাজন ব'লে মেনেও নিজেকে অভাজন ব'লে তাঁর চরণামৃত পান ক'রে বলতে বাধে এবার অধমতারণ হ'ল ব'লে! কারণ আমি দেখেছি এ-জগতে অধমের অধমাধম বলবার পথ খোলা থাকলেও পুরুষোত্তম হবার রাস্তা আজ পর্যন্ত কেউ কেটে দিতে পারে নি। কিন্তু তবু মানতেই হবে যে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বেশ একটু কাবু করেছেন।

আমি: কাবু? সে কি?

উপেনদা (করুণ হেসে): আর সে কি দাদা! বলছিলাম না, আমি দেখেছি নানা মহাজনকে? গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, অশ্বিনী দত্ত, তিলক আরো কত স্বনামধন্য বরেণ্যকে। কিন্তু বলেছি নিজের মনে প্রত্যেকের সামনেই: আমার বুদ্ধি যদি হয় এক হাত তো ওঁর দশ হাত, অমুকের বিশ, অমুকের পঞ্চাশ, অমুকের আশি হাত। কিন্তু অরবিন্দের বুদ্ধি যে কত হাত আজো মেপে পাই নি। (হেসে) খানিকটা যশোদার কেষ্টঠাকুরকে বাঁধবার ম'ত মাপসই দড়ি না পেয়ে নাজেহাল অবস্থা আর কি, দাদা, হা হা হা!

এ-ভঙ্গি উপেনদার নিজস্ব, কথাগুলি তিনি বলেছিলেন একাধিকবার, ১৯৫০-এ

একটি পত্রিকায় আমি একবার উদ্ধৃতও করেছিলাম, সেই পত্রিকা থেকেই ছাঁকা টুকে দিলাম এখানে।

এসব কথা তিনি বলেছিলেন রসিকতা ক'রেই বটে, কিন্তু সে-চটুলতা থেকেও বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের অটল সমতাকে তিনি কী চোখে দেখতেন। বলেছিলেন: "জানো দিলীপ, আমি সবচেবে খুশি হই কী দেখলে?—যদি একদিন দেখি কর্তা হাপুশ নয়নে কাঁদছেন। ঐ মানুষটির সঙ্গে জেলে দিনের পর দিন একসঙ্গে একঘরে কাটিয়েছি—নানা ভূমিকম্পের মধ্যেই লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু জীবনে কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হতে দেখিনি। মনে হ'ত প্রায়ই গীতার অচলপ্রতিষ্ঠ বিশেষণটি।" ব'লেই হেসে চোখ মিটমিট ক'রে: 'শুনেছি তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদ যেদিন তাঁর কাছে পৌঁছয়, সেদিন নাকি তাঁর ডান চোখের বাঁ কোণে এক ফোঁটা জল চিকচিক ক'রে উঠেছিল। আমি সে সময়ে পণ্ডিচেরিতে ছিলাম না। তবে যাঁরা ছিলেন তাঁদের এজাহার এই যে, ফোঁটাটি পড়তে পায় নি, ঐখানেই শুকিয়ে যায়।" ব'লে ফের সে কী হাসি! সাধে কি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে উপেনদা যেখানে থাকেন সেখানে নীরসতা টিকতে পারে না?

উপেনদা কথায় কথায় বলতেন—তিনি স্বভাবে সংশয়াত্মা, অবিশ্বাসী। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ উপেনদাকে যাঁরাই একটু কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরাই মানবেন যে বিশ্বাসবিমুখ বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতি বিশ্বাস, না-বুঝে-বিশ্বাস, অশ্রুবিহ্বল বিশ্বাসের পরিপন্থী। কালাপাহাড়ের প্রতিমা দেখলেই ভাঙবার পণ নয়—ভালো ক'রে যাচিয়ে নেব, বাজিয়ে নেব—এইই ছিল তাঁর মনোভাব।

পারমার্থিক পথের পথিক যাঁরা তাঁদের পক্ষে এই বিচারপূজার প্রবৃত্তি খতিয়ে শুভ নয়। খাঁটি বিশ্বাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চেয়ে বড় এ আমি বহু ঠেকে শিখেছি। কিন্তু তবু বলব যে বুদ্ধির বলিষ্ঠতাকে আমি আজো শ্রদ্ধা করি। তাই তো উপেনদাকে ভালোবেসেছিলাম। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে গুরু ব'লে গভীর শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তাঁর সব কথায় সায় দিতে পারেন নি এজন্যে অনেক অরবিন্দবাদী দুঃখ পান কিন্তু আমি দুঃখ পাই নি। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার বলেছিলেন (Among the Great-এ যে কথা উদ্ধৃত করেছি) যে তাঁর সব কথা আমাকে মেনে নিতেই হবে এমন জোর তিনি করেন না—কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক, বলি উপেনদার কথাই।

কিন্তু উপেনদার কথা বলা খুব সহজ নয়। কারণ তাঁর প্রকৃতিটি ছিল দৃশ্যতঃ এমন সব স্বতোবিরোধে ভরা যে তিনি যদি কোনো গল্পের নায়ক হ'তেন তা'হলে ঔপন্যাসিক তাঁকে "বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র" ক'রে দাঁড় করাতে বিশেষ বেগ পেতেন। একরোখা সরল প্রকৃতির মানুষকে আঁকা খানিকটা সহজ হয়—কে না জানে? কিন্তু যার মতিগতি নানামুখী—আর এমন মতিগতি যার হদিশ পাওয়াও সুসাধ্য নয়—তাকে চিত্রায়িত করা একটু কঠিন না হ'য়েই পারে না। তবুও যে উপেনদার ছবি আঁকতে কলম ধরেছি, তার কারণ তাঁকে (ও বারীনদাকে) আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম, তাই মন বায়না ধরে—করো তর্পণ এহেন তর্পণীয় মানুষের। অতএব বলি—যেমন মনে আসে।

উপেনদার বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার অথচ ভক্তি তৃষ্ণা ছিল গভীর, প্রকৃতি ছিল সংশয়ী অথচ প্রাণটি ছিল স্বপ্নালু, স্বভাব ছিল শ্রদ্ধালু, অথচ কাউকে অপাত্রে শ্রদ্ধা করতে দেখলেই তিনি উঠতেন অগ্নিশর্মা হ'য়ে। তাই তাঁর নানা লেখায়ই—বিশেষ ক'রে তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা" ও "ঊনপঞ্চাশী" বই দুটিতে—তিনি একান্ত নিষ্করুণ হ'য়েই তীরন্দাজি করেছেন মানুষের যাবতীয় গড্ডলিকা-প্রবাহী মনোবৃত্তিকে, না-ভেবে-চিন্তে গতানুগতিকতাকে বরণ ক'রে নেওয়ার তামসিক প্রবণতাকে। তাঁর অপূর্ব নক্সাগুচ্ছ "ঊনপঞ্চাশী" যখন প্রথম প্রকাশ হয় তখন ভাবুকদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে যায়—এইবার একজন খাঁটি তীক্ষ্ণধী সমাজ সমালোচক তথা নিপুণ বিশ্লেষকের উদয় হ'ল বাংলা সাহিত্যে। তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারার দুচারটি সরস কথাচিত্রের নমুনা দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ঊনপঞ্চাশীতে "ধর্মের সোল এজেন্সি" নক্সাটিতে পণ্ডিতজী বলছেন:

"বিনা পরিশ্রমে রাতারাতি কিছু লাভ হয় শুনলে আমাদের দেশের লোক একেবারে লাফিয়ে উঠবে। তারপর রাস্তার ধুলো, ঘুঁটের ছাই আর বটের আটা মিশিয়ে একটা মহাপুরুষত্ব লাভের অব্যর্থ বটিকা-টটিকাও করতে পারো। কেবল বিজ্ঞাপন দেবার সময় ব'লে দিও যে, বটিকা-সেবনের ফলে লোকে মহাপুরুষ যদি নাও হয়, তো পুরুষ নিশ্চয়ই হ'তে পারবে। এ-দেশে পুরুষের চেয়ে মহাপুরুষের সংখ্যা যে-রকম বেড়ে চলেছে—তাতে কোন্‌টা যে এখন বেশি দরকার, তা বোঝা মুস্কিল।"

"ত্যাগের ভোল" নক্সায় পণ্ডিতজী বলছেন: "ত্যাগ ব'লে যে একটা ধর্ম আছে তা তো আমি জানি নে। ত্যাগ কাউকেই যে ধ'রে রাখে না; আর যা ধ'রে

রাখে না তা ধর্ম হবে কী ক'রে ? ত্যাগের গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, ভগবান্ সৃষ্টি ক'রে একেবারে ল্যাজেগোবরে হ'য়ে পড়েছেন, এখন সৃষ্টি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন—এই না ? আর এই কথাটাই সংস্কৃত ক'রে বললেই তার নাম হ'বে শঙ্করভাষ্য। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, তা নিয়ে টিকি-ছেঁড়াছিঁড়ি যত ইচ্ছে করতে পারো ; কিন্তু ভগবান্‌কে এতবড় না-মরদ ব'লে তো আমার কখনই মনে হয় না। ভগবান্ আর যাই হোন্ না কেন, তিনি গোঁসাইও নন, নির্বাণলোভী উদাসীও নন !"

"মন আমার" নক্সাটি বড় বিচিত্র। মনকে উপেনদা জিজ্ঞাসা করছেন : "মন, কী চাও ?" এ ও তা প্রশ্ন সুরু করেন, মন বলে ; উঁহুঃ। চুটিয়ে পাশ, টাকার গদি, রাঙা বৌ, কংগ্রেসের সভাপতি সব তাতেই সে মাথা নাড়ে—অবশেষে মনকে য়ুরোপের জাতিসংঘে প্রয়াণ করবার কথা বলতে মন বলে : "ধেৎ ! ওটা তো জাতিসংঘ নয়, ও হ'ল মাতব্বরদের বজ্জাতি-সংঘ।"

অগত্যা উপেনদা মনকে পাঠিয়ে দিলেন এ-বিংশ শতাব্দীর সর্বতাপহরা শান্তির কৈবল্যধাম—রুশিয়ায়। দাদা বলছেন "(মনকে নিয়ে) চললুম রুশিয়ায়—সেখানে নাকি সব ভেদাভেদ রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে লেনিন মানুষকে সমান ক'রে গড়বে। গিয়ে দেখলুম, হাঁ—একটা নতুন রকমের কল বসেছে বটে। মানুষকে সেই কলের মধ্যে ফেলে, কারও মাথাটা ছেঁটে দিয়ে, কারও ঠ্যাংটা ভেঙে দিয়ে, সকলকে সমান ক'রে গড়বার চেষ্টা হচ্ছে বটে। যার নাকটা একটু বড়—দাও ইঞ্চি-খানেক কেটে। যার চোখ দুটো একটু গোল-গোল, দাও ছুরি দিয়ে পটলচেরা ক'রে। একেবারে ভীষণ রকমের সাম্য ! কর্তার যদি জ্বর হয় তো সবাই খাও সাগু ; কর্তা যদি পাশ ফিরে শোন—তো কেউ চিৎ হ'য়ে শুতে পাবে না। শুনলুম এর নাম কম্যুন (commune) ! মন আমার ব'লে উঠল : 'বাপ' !"

কিন্তু এটুকু প'ড়েই থামলে চলবে না। এ হ'ল তাঁর নেতির দিক যার ওপিঠে আছে ইতি। পরমুখাপেক্ষিতাকে তিনি ঘৃণা করতেন, তা সে পরাসক্তি সেকেলেই হোক বা একেলেই হোক। তিনি যে বিশ্বাস করতেন ভারতের আত্মায়। তাই এর পরেই লিখছেন যে মনকে ফিরিয়ে আনলেন বিদেশের কাছে হাত পাতা থেকে।

"ছুট, ছুট, ছুট।—একেবারে ছুটতে ছুটতে তুর্কীস্থান, কাবুল, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ভেদ ক'রে বাংলার মাটিতে ন্যাংটো হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ কোথায় তুমি আমার স্বপ্নের বাংলা মা ? দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্যে ভূষিত হ'য়ে

তুমি একদিন বাঙালি সাধকের মানসপটে ফুটে উঠেছিলে, আর আজ দেখি সবাই আমারই ম'ত জীর্ণ, ক্লিষ্ট, ক্ষতবিক্ষত দেহ প্রাণ নিয়ে পরের পায়ে ভর না দিয়ে প'ড়ে আছে।

"ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম—মন আমার চোখ বুজে একেবারে চুপ হ'য়ে গেছে। শুধু অন্তর্যামিনীর পদপ্রান্তে তার কাতর প্রার্থনা মাথা কুটছে—একবার 'এসো মা, এসো মা!'"

ভারতের মাটিতেই ভারতীয় আত্মার আবাদ হবে এইই ছিল তাঁর প্রাণের কামনা। তাই মহাত্মা গান্ধির যেদিন জেল হয় সেদিন তিনি এঁকেছিলেন একটি অতি স্মরণীয় নক্সা যা এক তিনিই আঁকতে পারতেন: "মহাত্মার দান"। কী অপূর্ব চিত্র! উপেনদা- দেশের নানা ধামাধরা স্তাবকতা ও অহিংসার শূন্যগর্ভতা বর্গীয় অসার মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গের তীরন্দাজিতে ধূলিসাৎ ক'রে লিখছেন। ("স্বাধীন মানুষ" ২৪ পৃষ্ঠা):

"তর্কটা ক্রমে ঘুসোঘুসির দিকে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় আমাদের চাকর ভজুয়া সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কাগজ খুলে দেখি, বড় বড অক্ষরে লেখা রয়েছে—মহাত্মার ছ বছর জেল!

"তর্কটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। আমাদের পালোয়ান বন্ধু আর এক কাপ চা ঢালতে লেগে গেলেন। কলেজী বন্ধু বললেন: 'ইস্! ছ বছর?' কংগ্রেসী বন্ধু বললেন: 'আজ একটা প্রোসেশন বের করলে হয় না?'

"ভজুয়ার দিকে চেয়ে দেখলুম—মুখে তার কথা নেই, চোখ জলে ভ'রে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কিরে? তুই কাঁদছিস কেন? গান্ধি মহারাজের জেল হয়েছে, তা তোর কি?' ভজুয়া চোখের জল মুছতে মুছতে বললে: 'বাবুজি, ওকথা বোলো না—তিনি যে আমাদের আপন লোক।'

"কাগজের দিকে চেয়ে দেখি, মহাত্মা বিচারককে বলেছেন—'I am a farmer and weaver by profession.' তিনি ব্যারিস্টার নন, দেশের নেতা নন, সমাজ-সংস্কারক—এমন কি ভদ্রলোকও না। তিনি চাষা ও তাঁতি!

"অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। (খৃষ্টের সম্বন্ধে) 'No man spake like this man'. জেলে অনেকেই গেছে। কিন্তু এমন কথা তো আর কেউ বলে নি! দেশের মাটির সঙ্গে এমন ক'রে তো আর কেউ নিজেকে মিশিয়ে দেয় নি!

আমাদের ভজুয়া জাতে কাহার। তার চোখের জলের ইতিহাস তখন বুঝতে পারলুম। বুঝলুম—এই জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মার শ্রেষ্ঠ দান কী।"

"বন্ধুদের বললুম : 'ভদ্রলোক যদি কখনো প্রাণের টানে আবার ছোটলোক হয়, তখনই এ-জাতের উদ্ধার হবে। তার আগে নয়।'

(উপেনদা মডারেটদের নরমগরম উদ্দীপনার নাম দিয়েছিলেন ক্রন্দোলন অর্থাৎ ক্রন্দন ও আন্দোলনের সমাহার !)

উপেনদা দ্বিজেন্দ্রলালের মতনই বাণ হেনেছেন প্রায় সব কিছুকেই—কাউকেই রেয়াৎ করেন নি, কিন্তু তাঁর সব শরসন্ধানেরই মূলে ছিল তাঁর প্রাণের কান্না। আন্দামানের দ্বীপান্তরে যে কী নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁরা দিন কাটিয়েছেন বারো বৎসর ধ'রে—তার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাই তাঁর অপূর্ব আত্মজীবনী "নির্বাসিতের আত্মকথায়"—যার তুল্য স্বাদেশিক আত্মকথা আর কোনো বিপ্লবীই আজ পর্যন্ত লিখতে পারেন নি। কিন্তু তবু সেখানেও তিনি কাঁদেন নি, কেঁদেছেন প্রথম দেশে ফিরে দেশবাসীর অধোমুখী মনোবৃত্তি দেখে। তিনি চাইতেন মানুষ আগে ভাবতে শিখবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে—গোলে হরিবোল দিয়ে কেবল সস্তা দাপাদাপির হরির লুটেই পকেট ভরতি করবে না। প্রতি পদেই তাই তিনি তাঁর গুরু শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ মেনে ভেবেচিন্তে বাজিয়ে নিতেন টাকাটা মেকি না সচল। উদাহরণ দেই : একসময়ে আমরা সবাই বলতাম—যার আজ ফের পুনরাবৃত্তি দেখছি হিন্দীভাষার জয়ধ্বনির ডামাডোলে—যে (উপেনদার ভাষায়ই বলি—উনপঞ্চাশী)

"ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে : আপনি কি বলতে চান যে আমরা বাঙালী এই সংকীর্ণ ভাবটা গিয়ে যদি আমরা ভারতীয় এই বড় ভাবটা আমাদের আসে, তাহ'লে আমাদের মঙ্গল হবে না ?"

"পণ্ডিতজী একটু হেসে বললেন : বাংলা বড় কি ভারত বড় এ-কথার উত্তর গজকাঠি দিয়ে মেপে ব'লে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাঙালিত্ব বড় কি ভারতীয়ত্ব বড় এ-প্রশ্নের উত্তর ও-রকম মেপেজুপে বলা চলে না। দুধ থেকে দই, ক্ষীর, ছানা, সর, মাখন হয়েছে ব'লে বলা চলে না যে, এগুলো সব দুধের চেয়ে ছোট বা সংকীর্ণ। বাংলা, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি সব বাদ দিলে যেমন ভারতবর্ষ ব'লে আর কিছু বাকি থাকে না, তেম্‌নি বাঙালিত্ব, হিন্দুস্থানিত্ব, পাঞ্জাবিত্ব এ-সব বাদ দিলে তোমার All-India consciousness-টা অশ্বডিম্ব হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের যা নিয়ে ভারতীয়ত্ব, সেই জিনিসটাই বাঙালীর মধ্যে বাঙালিত্ব,

হিন্দুস্থানীর মধ্যে হিন্দুস্থানিত্ব, মারাঠির মধ্যে মারাঠিত্ব হ'য়ে ফুটেছে। বাঙালীর বাঙালিত্ব মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভারতীয়ত্ব মারা যাবে। ভারতবর্ষের যেটা মানস রূপ বাংলায় সেইটাই বাঙালিত্ব হ'য়ে ফুটেছে।"

সাহেবি প্রবচনে বলে না—চ্যারিটি বিগিন্‌স্ এ্যাট হোম?

স্বাবলম্বী তীক্ষ্ণবুদ্ধির এই অকুতোভয় বিচারশক্তি বারীনদারও ছিল কিন্তু বারীনদা বেশি ঝুঁকেছিলেন যোগের দিকে, সাধনার দিকে। উপেনদা—সমাজের দিকে, চিন্তার দিকে। তাই বাংলার অগ্নিযুগের এই দুই মহামতির মধ্যে বাংলার দুটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল যা দেখলে শুধু যে চোখ জুড়িয়ে যেত তাই নয়, মনে হ'ত বৈ কি যে, যে-বাংলা এমন স্থিতধী মহাজনের জননী তার অকালমরণ অসম্ভব। উপেনদার মধ্যেও এ-বিশ্বাস ছিল ব'লেই তিনি একেলে বুলিবাজদের মতন বাঙালীর বাঙালিত্বকে 'প্রাদেশিক' এই নাম দেগে নস্যাৎ ক'রে দিতেন না।

উপেনদার আর একটি আশ্চর্য শক্তি ছিল তাঁর কথায় ছবি আঁকবার প্রতিভা যাকে বলে word-portraiture; তিনি তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা"-য় বিপ্লবী জীবনের যে-স্মৃতিচারণ করেছেন তার ছত্রে ছত্রে এ-অঙ্কনশক্তির পরিচয় মেলে। এ-শক্তি সাহিত্যক্ষেত্রে কেবল প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধরের মধ্যে দিয়েই স্ফুট হ'তে পারে। আঁকব বললেই আঁকা যায় না—এ-ও যে পারে সে আপনি পারে। স্থানাভাবে শুধু একটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

মহাত্মা কানাইলাল দত্ত তখন জেলের মধ্যে রাজগুপ্তচর নরেন গোঁসাইকে পরপারে চালান দিয়ে নিজে "ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান" গাইতে প্রস্তুত হয়েছেন সেই সময়ে তাঁর সম্পর্কে উপেনদার বর্ণনা অতুলনীয়:

"যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার ম'ত জিনিস বটে। আজও সে-ছবি মনের মধ্যে স্পষ্ট জাগিয়া রহিয়াছে—জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইয়ের মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে-মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের ম'ত যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে—সে-ই পরমহংস। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন।

প্রহরীর নিকট শুনিলাম—ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর কানাইয়ের ওজন ষোলো পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগল যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের এমন পথও আছে—যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।

"তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ-শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা। কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক প্রশান্তি ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। একজন য়ুরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল: 'তোমাদের হাতে এ-রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?' যে-উন্মত্ত জনসংঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।"

উচ্ছ্বাস আবেগকে সংযত রেখে কথাচিত্রে পাঠকের বুকে এমন অপূর্ব সংহত আবেগের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ দুচারজন প্রতিভাধর ছাড়া আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা"য় তিনি যে কী অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন নানা ছোট বড় চরিত্র-চিত্রণে—কিন্তু না, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি: ফুল ছিঁড়ে বাগানের শোভা দেখানোর প্রয়াস বিড়ম্বনা। বাংলা সাহিত্যে উপেনদার উনপঞ্চাশী, নির্বাসিতের আত্মকথা ও অনন্তানন্দের পত্র বর্গীয় রচনা বর্ণনাশিল্পের জন্যে অমর হয়ে থাকবে—কারণ এ-বর্ণনা শুধু সাহিত্যচর্চানৈপুণ্যসঞ্জাত নয়—একটি মহামতি মানুষের হৃদয়ের রক্তরাগ-রঞ্জিত।

উপেনদার গুরুভক্তি ছিল গভীর, অথচ গুরুবাদী বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না ব'লে অনেকে তাঁকে দোষ দেন। কিন্তু আমি এজন্যে তাঁকে কোনোদিনই অপরাধী মনে করি নি। স্বামী বিবেকানন্দর কথায়ই আমার মন বেশি সাড়া দেয় যে, গুরুকে "ভালোবাসবে সর্বান্তঃকরণে কিন্তু স্বাধীন চিন্তাকে বরখাস্ত ক'রে নয়। অন্ধ বিশ্বাসকে বরণ ক'রে নিস্তার নেই। নিজের মুক্তির পথ তোমার নিজেকেই কেটে নিতে হবে।"* শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই কথাই বারীনদাকে লিখেছিলেন স্বহস্তলিখিত বিখ্যাত বাংলা পত্রে। উপেনদা প্রায়ই এ-চিঠিটির উল্লেখ ক'রে বলতেন: "দাদা কলিযুগে হরের্নামৈব কেবলম্-এ মুক্তি হবার জো নেই, সেই সঙ্গে চাই আত্মারাম

---

*"Love him (the Guru) heart and soul but think for yourself. No blind belief can save; work out your own Salvation" (Inspired Talks)

—সেল্‌ফ্‌-রিলায়্যাণ্ট হওয়া। কর্তার বারীনকে লেখা ঐ-চিঠিখানি আমাদের মতন জীবের কাছে শুধু টনিক নয় দাদা—চাবুক।"

শ্রীঅরবিন্দ এ-ভাবুক-চিঠিটির একজায়গায় লিখেছিলেন: "মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন, আধুনিক জগত হ'ল জ্ঞানীর জয়ের যুগ—যে বেশি চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপে দেখবে দুটি জিনিস: অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সমুজ্জ্বল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেখানে এই শক্তির বলে জগৎকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। খানিকটা আমাদের পুরাকালের তপস্বীর ম'ত—যাঁদের প্রভাবে দেবতারাও ভীত হতেন।··তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giant ছাড়া সর্বত্রই average man যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারত চায় সরল চিন্তা—সোজা কথা। য়ুরোপ চায় গভীর চিন্তা—গভীর কথা। সামান্য কুলিমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায় মোটামুটি জেনেই সন্তুষ্ট নয়—তলিয়ে দেখতে চায়। তবে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি—nebulous metaphysics, yogic hallucination—ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছুই ঠাহর করতে পারে না।······আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের গুণে, আর যার সেই অধ্যাত্মবোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের ম'ত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে-শক্তি পাবার জন্যে শক্তির সাধনা দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই—সহজের উপাসক। সহজে শক্তি পাওয়া যায় না।"

উপেনদা প্রায়ই বলতেন সোচ্ছ্বাসে যে, শ্রীঅরবিন্দ বাঙালীকে তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখে চিনে নিয়েছিলেন এক আঁচড়ে, বলতেন প্রায়ই: "দাদা, কর্তা একসময়ে গুরুবাদের কথা বলতে বলতে আগুন হ'য়ে উঠতেন, বলতেন আমরা কর্তাভজার দেশ।" এই কথাটি উপেনদা সে-যুগে তাঁর "সনাতন নাবালক" শীর্ষক একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের "নারায়ণ" পত্রিকায়—খানিকটা শ্রীঅরবিন্দের কথাই তাঁর রোখালো ঝাঁকালো ভাষায় সাজিয়ে। কী ভাবে—দেখাতে শ্রীঅরবিন্দের ঐ পত্রটি থেকে আর একটু উদ্ধৃত করি উপেনদার ভাষণটি পেশ করবার আগে।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন বাঙালীর অবনতির কারণ দেখাতে : "বাঙালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের শক্তি আছে, ইনটুইশন আছে—এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলি যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর বিচারশক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের আনন্দ ও ক্ষমতা জোটে তাহলে বাঙালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হ'তে পারে। কিন্তু বাঙালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়—চিন্তা না ক'রে জ্ঞান, পরিশ্রম না ক'রে ফল, সহজ সাধনা ক'রে সিদ্ধি। তার সম্বল শুধু ভাবের উত্তেজনা। কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ।··· অধ্যাত্মসত্যের কয়েকটি সহজ মোটামুটি কথা ধ'রে ভাবের তরঙ্গে কয়েকদিন নেচে বেড়ায়, তারপরে অবসাদ, তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি, জীবনীশক্তির হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙালীর নিজের দেশে কি হয়েছে?—খেতে পায় না, পরবার কাপড় পায় না; চারদিকে হাহাকার! ধনদৌলত, ব্যবসাবাণিজ্য জমিচাষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে। আমরা শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।"

এর পাশাপাশি ধরা যাক উপেনদার বিশ্লেষণ তাঁর "সনাতন নাবালক" প্রবন্ধে। তিনি কর্তাভজা মনোবৃত্তির কথা পেড়েই লিখেছিলেন : "অপর দেশের লোকে হুকুম পেলেই আগে জিজ্ঞাসা করবে—'কেন?' কিন্তু আমাদের দেশে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া বিষম বেয়াদবি। মুখটি খুলেছ কি তোমার জন্যে হয় ঐহিক না হয় পারত্রিক নরকের বন্দোবস্ত। সমাজপতির কথার উপর কথা কইবার দুঃসাহস যদি কারো হয়, তো তার ধোপানাপিত বন্ধ, রাজার উপর কথা কইলে পুলিশের ডাণ্ডা, আর গুরুজীর উপর কথা কইলে রৌরব নরক।"

অতঃপর উপেনদা চালিয়েছেন যে-চাবুক তাতে বিছুটির রস :

"আমাদের লেখাপড়া শেখা মানে কতকগুলো পরের-ভাবা কথা মুখস্থ করা, আমাদের সামাজিক হওয়া মানে কতকগুলো বাঁধাধরা বিধিনিষেধ মানা··· আমাদের দেশহিতৈষিতা মানে পরের কথাম'ত চোখ বুজে চেঁচানো। সন্ন্যাসীর কর্মত্যাগ করা উচিত কেন? —শঙ্করাচার্য ব'লে গেছেন ব'লে। কর্মত্যাগ করা উচিত নয় কেন? বিবেকানন্দ বলে গেছেন ব'লে।—মা-বাপের শ্রাদ্ধ করতে হবে কেন?—মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব'লে গেছেন ব'লে। আর করতে হবে না কেন?—মিল বেন্থাম বলেন নি ব'লে। ইংরেজি শিক্ষা ভালো—যেহেতু রবিঠাকুর বলেছেন। ইংরেজী শিক্ষা মন্দ—যেহেতু গান্ধি মহারাজ বলেছেন।"

মনস্বী শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর চিন্তাপূর্ণ "সতের বৎসর পরে" গ্রন্থে উপেনদার এম্‌নি আর একটি তীক্ষ্ণ-করুণ বিদ্রূপ উদ্ধৃত করেছেন ৫৩ পৃষ্ঠায়: "বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন: 'তাই তো, ভাবি ব্যাপারটা হইল কি? যে-ব্যক্তি সাতদিন মস্কো ঘুরিয়া আসে সে হইয়া আসে একটা প্রচণ্ড বলশেভিক, রোমে যদি দুদিন থাকিয়া আসে তবে হয় আস্ত একটা ফাশিস্ত, আর নিউইয়র্কে একরাত্রি কাটাইয়া আসিলে হয় একেবারে পাক্কা ডেমোক্রাট। বলি, নিজেদের ঘটে কি কিছুই নাই?"

কিন্তু উপেনদা শুধু নঙর্থক ব্যঙ্গই করতেন না—সদর্থক নির্দেশও দিতেন, প্রাণের সরল আবেগে গভীর শ্রদ্ধায় দিতেন পথের নির্দেশ:

"নিজের দেশের বন্ধন ঘোচাবে? বেশ কথা, কিন্তু যে-মন নিয়ে সেই বাঁধন খুলতে যাচ্ছ সেটা যদি নিজে মুক্ত না হয় তো তাতে বন্ধন ঘুচবে না। একথাটা ভুলো না যে, সব বিষয়েই মুক্তির প্রথম কথা হচ্ছে—'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জানো।···যে-ভারত তোমার আমার ম'ত এই তেত্রিশ কোটি জীবের মধ্যে মূর্ত তার অন্তরের কথাটা একবার বোঝবার চেষ্টা করো।

Withdraw yourselves, realise your own inner selves and get into the heart of your country and understand what she stands for. Strive for it, work for it unceasingly, strong in your faith in that and all outer things will follow···or you will lose your souls and your country will never rise."

"বাইরের কাজে গা ছেড়ে দেবার আগে নিজের সত্তাকে চেনো। দেশের প্রাণের মধ্যে ঢুকে দেশ যে কি, তা বোঝো। তারপর বুকভরা নিশ্বাস নিয়ে কাজ ক'রে যেয়ো—বাইরের সব জিনিষই গ'ড়ে উঠবে।··আর তা যদি না করো, তোমরাও আত্মভ্রষ্ট হ'য়ে পড়বে, দেশও উঠবে না।

"অরবিন্দের এই কথাগুলি তোমরা একটু বোঝবার চেষ্টা করবে কি?"

** ** **

উপেনদার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে আরো অনেক কিছুই লিখতে পারতাম, কিন্তু স্মৃতিচারণের উপজীব্য সমালোচনা নয়—ছবি আঁকাই তার স্বধর্ম। তাই তাঁর সঙ্গে শেষ কথালাপ-কাহিনীর যেটুকু মনে আছে উদ্ধৃত ক'রে এ-তর্পণের সমাপ্তি টানি।

বাইশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন কলকাতায় ডাফ স্ট্রীটে বন্ধুবর ডাক্তার বঙ্কুবিহারী ঘোষের বাড়িতে আসীন। বহু অতিথি অভ্যাগত, খ্যাতনামা মনীষী জমায়েৎ। কিন্তু এঁদের মধ্যে সে-স্মরণীয় সন্ধ্যায় যাঁর সঙ্গে রসালাপ দেখতে দেখতে জ'মে উঠেছিল তিনি উপেনদা। সেই আলাপেরি একটি চুম্বক পেশ করব।

আমাকে দেখেই উপেনদা বললেন: "এ কি, দিলীপ! এ-বৈষ্ণব বেশ! কর্তা তো ভেখ বিশ্বাস করেন না কোনোদিনই।"

আমি হেসে বললাম: "অবাধ্য শিষ্য কি একা আপনিই উপেনদা?"

বলতেই উপেনদা হো হো ক'রে হেসে আমাকে বললেন: "বুকে এসো দাদা, বুকে এসো। এতদিনে পেলাম ব্যথার ব্যথী। হ্যাঁ, শুনেছি তোমার বাহাদুর অবাধ্যতার কথা। তাই না তুমি কর্তার অন্তরঙ্গ হতে পেরেছ—তাঁর ধামা ধরো নি ব'লে। একথা আমি প্রায়ই সবাইকে বড় গলা ক'রেই ব'লে থাকি। কিন্তু তবু একটা কিন্তু আছে দাদা, কিছু মনে কোরো না।"

আমি (হেসে): মনে করব কেন দাদা? কেবল জিজ্ঞাসা করি—পীতবাসে আপনার এত আপত্তি কেন? শাদা ধুতির চেয়ে গৈরিকবাস দেখতে সুন্দর নয় কি? অন্তত আমি এ-বেশ পরি ভেখধারী হ'তে নয়। রংটি আমার মনঃপূত ব'লেই।"

উপেনদা: রংটি তোমাকে মানিয়েছে দাদা, মানি। কিন্তু কি জানো? আমার আপত্তি ঐ বোষ্টুমিয়ানাতে। এ-যুগে বৃন্দাবনের ঠাকুরকে নিয়ে চলবে না। এ-যুগে চাই মহিষমর্দিনী কিম্বা নৃসিংহাবতার। পৃথিবী যে অসুরের ভারে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে দাদা। কর্তাও কি তাই বলেন না স্টালিন হিটলারের নাম ক'রে?

আমি (ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে): বলেন বটে, কিন্তু হয়েছে কি জানেন দাদা? আমি—মানে—ঐ স্টালিন কি হিটলারের কথা ভেবে কাবু হই না। আমি বেঁচে বর্তে থাকতে চাই বৃন্দাবনের ঐ ঠাকুরটিকে নিয়েই—মহিষমর্দিনী বা নৃসিংহাবতার আমার মাথায় থাকুন—তাঁদের শক্তি সঞ্চার ক'রে জগৎ উদ্ধার করুন আপনাদের মতন ধনুর্ধররাই দাদা। আমার ভালো লাগে ঐ মীরার গিরিধর গোপালকে নিয়েই ডাকাডাকি কান্নাকাটি করতে—একটু শুনলেনই বা আজ কী কান্না মীরা কেঁদেছিলেন যার রেশ আজও ডুবে যায় নি হাজারো ইস্‌মের সিংহনাদে।

উপেনদা (হেসে): বা বা বা! কর্তার কাছে গিয়ে দেখি কথার আরো খোলতাই হয়েছে দাদা! তা হবে না? তিনি তো শুধু মৌনীদের মুকুটমণি নন, কথারও কাপ্তেন। তা বেশ, গাও না। মীরার কান্নাকাটি শুনতে আমার এখনো সময়ে সময়ে ভালোই লাগে দাদা, কেবল ভাবি কেঁদে কেটে কি কিছু ফল হবে? যাক, গাও দাদা, আমি শুনব—তবে আণ্ডার প্রোটেস্ট, মনে রেখো। কারণ বোষ্টুমিয়ানার দিন গত এ-ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে আন্দামানে বারো বৎসর অশ্রুপাত করার পরে। তার পর থেকে আমি পথ চেয়ে আছি শুধু একটি অবতারের। তিনি কে জানো? কল্কি ঠাকুর। শুনেছি আসবেন তিনি নীল ঘোড়ায় চেপে, দুন্দুভি বাজিয়ে। কেবল আশা করি ঐ সঙ্গে হাতে থাকবে কোনো দুর্দান্ত বোমা। নৈলে এযুগে শুধু বোলচালে কি দামামার ফাঁকা আওয়াজে কিছু হবার নয়, দাদা! যাক, গাও দাদা গাও, এঁরা এসেছেন তোমার গান শুনতে, আমার হাহাকারী বক্তিমে শুনতে নয়।

সবাই শুনছিল উৎসুক হ'য়ে। তিনি যখনই মুখ ছোটাতেন সবাই শুনত কান পেতে—এম্‌নি ছিল তাঁর রসাল বাক্‌ভঙ্গি।

যাই হোক তাঁর অনুমতি পেয়ে আমি গান সুরু করলাম। প্রথমে কয়েকটি বাংলা গান গেয়ে শেষে ধরলাম মীরার বিখ্যাত ভজন:

মেরে গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ…
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ,
অব তো বাত ফৈল গঈ, ক্যা করেগা কোঈ?

ইত্যাদি…গাইলাম প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে। ভাগ্যক্রমে একটু ভক্তিভাব জেগেছিল—ঠাকুরকে ডেকেছিলাম: "দেখো ঠাকুর, একটু ভক্তির ছিটে-ফোঁটা দিও নইলে শেষরক্ষা হবে না…"

কোনো তার্কিক আমাকে কোন্‌ঠেশা করলেই আমি নিতাম এইভাবে ঠাকুরের শরণ, গাইতাম গুনগুন ক'রে মীরার একটি প্রিয় ধুয়া:"

বিনতি সুনো গিরিধারী!
রাখো লাজ হমারী—
মীরা-হৃদয়বিহারী!"

গানের শেষে অনেকেরই চক্ষু সজল হ'য়ে উঠেছিল। উপেনদার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই তিনি চকিতে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে তৎক্ষণাৎ: "দাদা! বলব একটা কথা?"

আমি: কী দাদা?

উপেনদা: তুমি লোক ঠকাচ্ছ। শোনো ভাই, আমি বোকা হ'লেও বুদ্ধি রাখি। এ তো মীরার ভজন নয় দাদা, এ-গান যে তোমার নিজের প্রাণ থেকে উঠেছে। "তাত মাত বন্ধু" ছেড়ে কে কী করবে বলবে তার তোয়াক্কা না রেখে তুমি যে এককাপড়ে ছুটেছিলে বৈরিগি হ'য়ে পণ্ডিচেরিতে কর্তার কাছে ধর্না দিতে—এ যে তারই ইতিহাস দাদা! তুমি জানিয়ে দিলে তানে সুরে আঁখরে—কেন সংসার তোমার ভালো লাগেনি—কেন তুমি কর্তার শরণ নিয়েছিলে। (একটু থেমে, হেসে) কিন্তু সে অন্য কথা। হয়েছে কি, আজ আমার মতন অবিশ্বাসীকেও তুমি একটু ভাবিয়ে দিলে—আর কেন জানো? তোমার গান শুনতে শুনতে আমার সংশয়ী মনেও পাল্টা সংশয় হানা দিচ্ছিল—কোনোমতেই যার মুখচাপা দিতে পারছিলাম না। সে বলছিল: তবে কি বৃন্দাবনের বঙ্কিমচন্দ্র সত্যি গতাসু হন নি—আজো বেঁচে বর্তে আছেন? না থাকলে তাঁর সেকেলে বাঁশির সুর তোমার কণ্ঠে বেজে উঠল কী ক'রে দাদা? কেমন ক'রে তুমি গাইলে অমন হাহাকার ক'রে: যাকে অধর মুরলী চরণ নূপুর গলবিচ বনমালা—আরো কত কী আঁখর দিলে তাঁর মুরলীর আয় আয় ডাকের! কী ব্যাপার এ?—ভাবছিলাম আমি বারবারই, কারণ যদি বৃন্দাবনের এ-বাঁকা ঠাকুরটির দিন সত্যিই সেকেলে টাকার মতন অচল হ'ত তবে তাঁকে ভাঙিয়ে তুমি খাচ্ছ কী ক'রে? শুধু তোমার নিজের কান্নাই তো নয়, আর পাঁচজনকেও যে কাঁদালে—এও তো স্বচক্ষেই দেখলাম দাদা!

কোনো ভক্তবিশ্বাসীর কাছেও কি আমি আমার ভজনকীর্তনের এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট পেয়েছি?

বিদায় নেবার সময় প্রণাম করতেই উপেনদা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন: "গাও দাদা গাও। দেশ উদ্ধার না হয় মুলতুবিই রইল—খানিকক্ষণের জন্যেও তো চারিদিকের কর্কশ শোরগোল ছাপিয়ে একটা বাঁশির সুর বেজে উঠল—এ দারুণ দুর্ভিক্ষ আক্রাগণ্ডার দিনে এইই কি কম লাভ?"

* * *

অতুলপ্রসাদের একটি চমৎকার বাউল গানে আছে :

আমি তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে ?
ওগো, শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে নাও বুকে।

উপেনদার সম্পর্কে এর পাঠান্তর আমার মনে বেজে ওঠে আজও :

তোমায় করবে সাহস অবিশ্বাসী বলতে কে ?
তুমি সত্যের মান রাখতেই চাও মিথ্যের কান মলতে যে !

পাঁচ

এক একজন মহাপ্রাণ মানুষ দেখা যায় যারা জন্মায় অফুরন্ত জীবনশক্তির মূলধন নিয়ে। বাইরে থেকে দেখলে অনেক সময়ে এমনও মনে হয় বৈ কি যে এ-মূলধন যেন তারা ঠিক ম'ত খাটাতে পারল না, ফলে খাতায় জমার চেয়ে খরচের যোগফলই হ'য়ে উঠল বেশি। চলতি ভাষায়: এ-জীবনীশক্তি যেন তাদের অকারণ ঘুরিয়েই মারে। কারণ যে-ঐকান্তিক সংসারিয়ানার নির্দেশে চললে তবে মানুষ কীর্তির গোলকধামে পৌঁছে দেশের ও দেশের একজন হ'য়ে ওঠে, এ-জাতীয় ছন্নছাড়া মানুষ কিছুতেই স্বস্তিবোধ করতে পারে না সে-সংসারী মুরুব্বিয়ানার সভ্য-ভব্য আশ্রয়ে। কেন না এ-শ্রেণীর মানুষ জন্মায় এমন মন নিয়ে যে তাদেরকে সব রকম খুঁটি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রওনা ক'রে দেয় এক নাম-না-জানা স্বপ্নলোকের পানে। আর এ-অচিন পথের পাথেয় যোগায় কোনো মার্কামারা সংসারা সুবুদ্ধি নয়—এক দুর্বোধ্য অভী রোখ। সচরাচর আমরা এদের উপাধি দিই ঝোঁকালো—ইম্‌পাল্‌সিভ। পাষাণচাপা উৎসমুখ হঠাৎ খুলে গেলে যেমন টগবগে প্রস্রবণ ফেটে পড়ে যে থামতে জানে না—এ-শ্রেণীর মানুষ যেদিকেই মোড় নেবে তেম্‌নি ফেটে পড়বে, চলবে অকুতোভয়ে। দুঃসাহস এদের প্রাণ-মালার জপমন্ত্র। সুভাষ ছিল এই জাতের মহাজন, তাই সে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় তাদের পানে—যাদের আমরা এককথায় "বিপ্লবী" নাম দিয়ে ভাবি হদিশ পেয়ে গেছি। কিন্তু সুভাষ জানত যে এদের তল পাওয়া ভার। এই অগাধ দুঃসাহসীদের মধ্যে যাঁকে সে সব আগে ভালোবেসেছিল—যাঁর ছোঁয়াচে তার নিজের সুপ্ত দুঃসাহস সবপ্রথম জেগে উঠেছিল তাঁর কথাই আজ কিছু বলব—

আরো এইজন্যে যে, তাঁর কাছে আমার নিজের ঋণও অশেষ। তাঁর নাম মহামতি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—দেশবল্লভ "বারীনদা"—শ্রীঅরবিন্দের প্রিয়তম অনুজ, তাঁর অগ্নিযুগের জীবনের সতীর্থ তথা উত্তরযোগজীবনের শিষ্য, বন্ধু, সহযাত্রী—কী নয়? দেশযাজ্ঞিক শ্রীঅরবিন্দের মর্মজ্ঞ ছিলেন বহু বোমারু। কিন্তু তাঁর অগ্নিহোত্রে যাঁরা সর্বস্ব আহুতি দিতে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা শুধু বিপ্লবী অরবিন্দেরই খবর রাখতেন, মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের কোনো ধারই ধারতেন না। বারীনদা ও উপেনদা এ-দুজন মহাপ্রাণ বিপ্লবী ছিলেন মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের উভয়রূপেরই জহুরী, সমজদার, দরদী তথা পদাঙ্কানুসারী। বারীনদা এরও উপরে ছিলেন তাঁর "সেজদা"-র পরম সহায়, দক্ষিণ হস্ত—আন্দামানে বারো বৎসর অজ্ঞাতবাস ক'রে ফিরে গুরু অগ্রজের শুধু শিষ্য নয়, একজন প্রধান রসদদার হ'য়ে কলকাতা থেকে তাঁকে নিয়মিত প্রণামী পাঠাতেন। (শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ও পাঠাতেন কখনো কখনো)

পণ্ডিচেরি আশ্রমে বারীনদা টিঁকতে পারেন নি নানা কারণে—একটি কারণ: তাঁর নানামুখী উৎসাহ ও নিষ্পরোয়া প্রাণশক্তি সেখানে রকমারি চাপে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু পণ্ডিচেরি থেকে বিদায় নিয়ে আসার পরেও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির উচ্ছল জোয়ারে কখনো এতটুকুও ভাঁটা পড়ে নি। পড়বে কেমন ক'রে? তাঁকে শুধু প্রাণ ঢেলে ভালোবাসাই তো নয়—তাঁর সেবায় যে বারীনদা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর যোগশিষ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে।

স্বভাবে গুরুবাদী না হয়েও উপেনদা ও বারীনদা যে শ্রীঅরবিন্দের দিকে প্রথম থেকেই ঝুঁকেছিলেন তার একটি কারণ এই যে, তাঁর এই দুই শিষ্য (গুরুর মতনই) শুনেছিলেন ঘরছাড়া বাঁশির ডাক। তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা"য় উপেনদা বারীনদা সম্বন্ধে চমৎকার রেখাচিত্র এঁকেছেন এখানে সেখানে। এক-জায়গায় প্রাক্ আন্দামান "অগ্নিযুগ"-এর কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে লিখছেন:

"বাহিরে কাজকর্ম তুমুলবেগে চলিতে লাগিল; কিন্তু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শক্তির অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। এই যে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, ইহার শেষ কোথায়? এই যে এতগুলো ছেলেকে ক্রমশঃ মরণের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছি, মরণের ভয়টা কি আমাদের নিজেদের মন হইতে সত্য সত্যই মুছিয়া গিয়াছে?···পথ যে নিজের চোখেই ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে! বারীনের মনে এ-সময়ে কী হইত জানি না। কোনো দুঃসাহসের কাজে তাহাকে

এ-পর্যন্ত কখনো ভয়ে পিছাইয়া আসিতে দেখি নাই। তবে সে-ও মাঝে মাঝে নিজের ভিতর ঢুকিয়া শক্তিসংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত মনে হয়।"

এই স্বভাব-অন্তর্মুখিতাই বারীনদাকে যোগজিজ্ঞাসু করেছিল এবং তাঁর উত্তর-আন্দামান জীবনপর্বে তাঁকে টেনে এনেছিল শ্রীঅরবিন্দের চরণে যোগদীক্ষায় দীক্ষিত হ'তে।

পণ্ডিচেরিতে কোনো কোনো বিজ্ঞম্মন্য লোকের গম্ভীর রায় শুনতাম—বারীনদার শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে টিকতে-না-পারা তাঁর চরিত্রের অনপনেয় কলঙ্ক। এঁরা শুধু নিদানবেত্তাই নন, ভবিষ্যদ্বক্তাও বটে, তাই বলতেন—বারীনদা জীবনে ব্যর্থ হবেনই হবেন নাকি এই জন্যেই। এ-ধরনের নিশ্চয়োক্তি শুনে আমার প্রথম প্রথম ভারি অবাক্ লাগত, কারণ কোনো জিজ্ঞাসু তার সন্ধানে কী পেয়ে কোন্ পথে কৃতকৃত্য হয় তার যখন কোনো বাহ্য অভিজ্ঞানই নেই তখন এঁরা কী ক'রে টের পেলেন—বারীনদা জীবনে নিশ্চয়ই খতিয়ে অকৃতার্থ হ'তে বাধ্য? বারীনদাকে যে একবার ভালোবেসেছে– (আর খুব কম লোকই তাঁকে না ভালোবেসে থাকতে পারত)—সে তাঁর শেষ জীবনের স্নিগ্ধ হাসি ও সহজ প্রীতিসম্ভাষণ থেকে কিছুতেই এ-সিদ্ধান্ত করতে পারত না যে তিনি সত্যসন্ধানের ডুবুরি হ'য়ে শুধু ঝিনুকই পুঁজি করেছিলেন, মুক্তা না। বারীনদার সঙ্গে আলাপ হ'তে আমার চোখে পড়েছিল একটি জিনিস: যে তিনি ছিলেন—না চলন-বলনে গড়পড়তা, না স্বভাবে গতানুগতিক। কিন্তু হ'লে হবে কি, যারা গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে চ'লে ভরপুর খুশি থাকে তারা সেসব মহাপ্রাণ মানুষের মূল্যায়ন করতে পারে না যাঁরা নিজের পথ নিজেই কেটে চলতে চলতে গ'ড়ে ওঠেন, কোনো চলতি ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে পারেন না। বারীনদা তাঁর অন্তরে আপ্তকাম হয়েছিলেন কিনা সে হদিশ দিতে পারে শুধু অখিলের অন্তর্যামীর অন্তর্দৃষ্টি, সমালোচকের চর্মচক্ষু নয়। শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে ১৯৫২ সালে যখন বারীনদার সঙ্গে আমার উনশেষ দেখা হয় বাইশ বৎসর বাদে, তখন তাঁর মুখের চির প্রশান্ত হাসি আমি তো কই একটুও ম্লান দেখি নি, কিম্বা তাঁর সদানন্দ আলাপের উচ্ছলতায় এতটুকুও ভাঁটা পড়েছে মনে হয়নি! শুধু তাই নয়, আমাকে তিনি তাঁর সাধনার কয়েকটি উপলব্ধির কথাও বলেছিলেন যে-শ্রেণীর গভীর উপলব্ধি কোনো ব্যর্থকাম সাধকের আয়ত্ত হতেই পারে না। একথাও আমি মেনে নিতে অক্ষম যে, যেহেতু তিনি ১৯৩০ সালে পণ্ডিচেরি থেকে বিদায় নিয়ে গুরুদত্ত বীজকে দূর থেকে লালন ক'রে সাধনা করতে চেয়েছিলেন,

সেহেতু তাঁকে "গুরুদ্রোহী" বলা চলে। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গদের মধ্যেও যিনি ছিলেন অগ্রণী ; শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যিনি বহুদিন ধ'রে রসদ জুগিয়ে এসেছিলেন ; এককথায়, শ্রীঅরবিন্দকে যিনি ভালোবেসেছিলেন তাঁর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত—তিনি গুরুদ্রোহী হবেন কেমন ক'রে? আমাকে তিনি পাইকপাড়া থেকে একটি চিঠিতে লেখেন (২১. ৭. ১৯৫৪) : "তুমি ও ইন্দিরা আমার আশীর্বাদ নিও। তুমি, শুনলাম পণ্ডিচেরি ছেড়ে, পুনায় মন্দির গড়ছ। পণ্ডিচেরির সঙ্গে কি তোমার যোগ আছে এখনও? আমার কী যে ইচ্ছে হয় একবার সেখানে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিমূলে গড় করি ! আহা, যদি কিছুক্ষণের জন্যও তা সম্ভব হত !"

আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "তোমার জন্মদিনের অপূর্ব দান পেলাম : ইন্দিরার ভজনাবলী—'শ্রুতাঞ্জলি'। আমাকে এখনো যে তুমি মনে রেখেছ এ বড় আনন্দের কথা। এই মীরা দেবীর ইন্দিরা দেখছি পঞ্চনদের কন্যা—ধ্যানলোকের রত্নসন্ধানী—একটি দুর্লভ ডুবুরি ! এরা সব ভিড় ক'রে এসেছে—আমার চারপাশেই দেখছি এদের—কে কোথা থেকে ডাক শুনে এসে ব'সে গেছে মধুসাগরের সুখ-সৈকতে ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তার পরেই মহাজ্ঞানী শ্রীঅরবিন্দ—দুজনে পর পর পরাজ্যোতির্লোকের দুয়ার ফাঁক ক'রে খুলে দিয়ে গেছেন আর ঝলকে ঝলকে জ্যোতির্ময় আনন্দের পাগলাঝোরা বেয়ে নেমে এসেছে কত যে এরা ! দেখি, আর অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।"

কোনো কোনো দুর্মুখ শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার পর বারীনদার বিরুদ্ধে রটিয়েছিলেন যে তিনি নাকি মামলা করছেন শ্রীঅরবিন্দের উত্তরাধিকারী হতে। এ-সম্বন্ধে বারীনদা আমাকে একবার লিখেছিলেন—কারণ তিনি জানতেন আমি তাঁকে ভুল বুঝব না : "রুদ্ধ পণ্ডিচেরির সুদূর থেকে তুমি আবার আমার দুয়ারে এসে ঘা দিলে। আশা করি এতদিনে অমুকেরা আশ্বস্ত হয়েছে এটুকু বুঝে যে তুচ্ছ বিষয় বা কর্তৃত্বের লোভে বারীনদা আদালতের আশ্রয় নেবে না ! এই ভুলবোঝাবুঝির বিড়ম্বনা যদি না থাকত তাহলে মানুষের জীবনের অর্ধেক দুঃখ অশান্তি বিলুপ্ত হ'ত। আমি নিজের ওকালতি না ক'রে কালের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার দোষক্ষালনের ভার। আমি বহু অপরাধে অপরাধী হ'তে পারি, কিন্তু তোমাদের স্নেহনীড়টি ভাঙবার দুর্মতি যে আমার কোনোদিনই ছিল না—আমি আশা করেছিলাম এটুকু অন্তত তোমরা কজন বুঝবে। ভুল বুঝো না—কোনো অভিযোগই আমার নেই, এটুকু বলছি শুধু তোমাকে মরমী মানুষ পেয়ে।

"মা-কে বোলো যেন আমার প্রতি আশীর্বাদ রাখেন। বোলো—আমি সংসারে কোনদিনই ঐহিক কিছুর প্রত্যাশী ছিলাম না, আজ তো নই-ই। জীবনে অঢেল নিন্দা অপবাদের ঝড়ঝাপটা স'য়ে এসেছি, এখনো তার জের টানতে হচ্ছে। কিন্তু এজন্যে সত্যিই কোনো খেদ নেই, এসবই যে সমদর্শী ও স্থিতধী হবার দীক্ষা দেয়। সংসারে কিছুই ফেলা যায় না ভাই, সবই কাজে লেগে যায়। মনে পড়ে রামপ্রসাদের গান—তুমিই গাইতে :

প্রসাদ বলে—ভবার্ণবে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা,
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।

দু'চার লাইন লেখা এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি—তুমি মরমী মানুষ ব'লে। অবসর পেলে মনে কোরো। ভালোবাসা নিও।

তোমার নিত্যশুভার্থী বারীনদা।"

গড়পড়তা সাধকের কণ্ঠে এমন উদার নির্বেদের সুর ফুটতে পারে কখনো? এ-সম্পর্কে আর একটি কথা আমার মনে গেঁথে আছে : শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রয়াণ করবার কয়েকমাস আগে হঠাৎ নিজে থেকেই বারীনদাকে একটি আশীর্বাদী তার করেন—১৯৫০ সালে। ১৯৫২ সালে সহৃদয় বন্ধু বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে যখন বারীনদার কলকাতার বাসায় যাই তখন বারীনদা শিশুর ম'ত উচ্ছল আনন্দে সর্বাগ্রে দেখান এই তারটি—তিনি ফ্রেমে বাঁধিয়ে সযত্নে তাঁর মন্দিরবেদীতে সাজিয়ে রেখেছেন ফুল দিয়ে—বিগ্রহের মতন। আজো কানে বাজে শ্রীঅরবিন্দের এক জন্মোৎসবে তাঁর অপূর্ব স্পন্দিত ভাষণ :

"আমি যে দেখেছি এ-মহাভাগকে দেশের জন্যে সর্বস্ব পণ ক'রে ফাঁসিকাঠকে উপেক্ষা করতে। আমি যে দেখেছি এ-মহাজ্ঞানীকে তাঁর দীপ্ত ব্যক্তিরূপের ছোঁয়াচে যত্র তত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে। সবশেষে, আমি যে দেখেছি এ-মহাযোগীকে দেশের চেয়েও বড় যিনি তাঁর সাধনায় নিরন্ন অবস্থায়ও অনন্যমনে দিনের পর দিন যোগসাধনা করতে মানুষের মুক্তির পথিকৃৎ হ'য়ে। এ-ও দেখেছি কী অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যে তাঁর দিন কেটেছে মাসের পর মাস। একবার সামান্য ত্রিশটাকা বাড়িভাড়া পর্যন্ত দিতে পারেন নি ব'লে প্রায় পথে দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে—দেখেছি স্বচক্ষে। কেবল দেখি নি কোনোদিন এ-মহাপুরুষকে মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হ'তে। তাঁকে দেখে আমার কেবলই মনে হ'ত গীতার একটি অপরূপ উপমা : 'আপূর্যমানম্ অচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ'—রাজ্যের চঞ্চল ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রের

বুকে কিন্তু অম্বুধি থাকে শান্ত, অনাহত টইটুম্বুর! মহাকবি, মহাধ্যানী, মহাদার্শনিক, মহাবিপ্লবী, জাতীয়তার মহাপুরোহিত, অতিমানসলোকের এ-মহাকবিমনীষীকে ভাবুকদের মধ্যেও কজন বুঝেছেন? তাঁকে দেখে আমার কেবলই মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের একটি গান: 'সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগি নি'! জাগলে কি দেশ আজো পরাধীন তামসিকতায় ডুবে থাকত? আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভাগ্য এই যে, তাঁর পায়ে আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম—এ-অযোগ্যকে তিনি ভালোবেসে জাগৃতির মন্ত্র দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন—এ-কলিযুগে রথহীন অ-পার্থের কাছে এসেছিলেন পার্থসারথি হ'য়ে···।" শুনতে শুনতে সারা ইন্স্টিট্যুট কেঁপে উঠেছিল। সেদিন সে-অগ্নিগর্ভ ভাষণ শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা কোনোদিনো ভুলতে পারবেন না অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সে-মাল্যদান অগ্নি-উৎসকে। আমি সবশেষে তাঁকে প্রণাম ক'রে শুধু বলেছিলাম: "প্রেমের কথা অনেকেই বলে বারীনদা, কেবল হৃদয়ের তাপে প্রেমের মশাল জ্বালতে পারে কেবল সে-ই যার হৃদয়ের শোক-তাপ গ'লে আলো হ'য়ে উঠেছে।" বারীনদা আমাকে তাঁর স্নেহালিঙ্গন দিয়ে ধন্ত ক'রে আশীর্বাদ করেছিলেন: "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ—তোমার পথ নির্বিঘ্ন হোক্।"

যেমন বারীনদা জানতেন শ্রীঅরবিন্দ কী বস্তু, তেমনি শ্রীঅরবিন্দও জানতেন বারীনদা কী বস্তু। তাই তো তিনি অনুজকে এত কাছে টেনে নিয়ে এত শত মনের কথা লিখতেন ফলিয়ে। তাঁর একটি বিখ্যাত বাংলায়-লেখা চিঠিতে তিনি একবার বারীনদাকে লিখেছিলেন সস্নেহ তিরস্কারে: "তুমি লিখেছ—'আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে লোহা।'···দেবতা কেউই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবতা আছেন, তাঁকে প্রকট করাই জীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। 'বড় আধার ক্ষুদ্র আধার' আছে জানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে-বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) ব'লে গ্রহণ করতে পারছি না। তবে আধার যেরূপই হোক্, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হয়, তারপরে বেশিকম, ছোটবড় এসবে বিশেষ কিছু আসে যায় না···ভিতরের দেবতা সেসব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না, ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল? মনের, চিত্তের, প্রাণের কি কম বাধা? সময় কি লাগেনি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন?—দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত! দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানি না, তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান্ যা গড়তে চেয়েছেন। তাই যথেষ্ট। সকলেরই তাই আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।"

এ-ধরনের গভীর অন্তরঙ্গ কথা মানুষ বলতে পারে কাকে ?—কেবল স্নেহাস্পদ বন্ধু বা শিষ্যকে। বারীনদা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ সহযাত্রীদেরও শিরোমণি, প্রিয় হ'তে প্রিয়, বিশ্বস্ত সচিব, সতীর্থ, সহযোগী। তাই তো যোগিরাজ এ-যোগার্থী স্বজনকে তাঁর নানা পত্রে শুধু যে মূল্যবান্ নির্দেশ দিতেন তাই নয়—বরণ করেছিলেন নিজের নানা স্বপ্ন অভীপ্সার সমর্থকরূপে। শ্রীঅরবিন্দের বারীনদাকে-লেখা আরো কয়েকটি পত্র আমি আমার ডায়ারিতে টুকে নিয়েছিলাম, কিন্তু সেসব উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে সম্ভব নয় ব'লে শুধু এই চিঠিটিরই আর একটি অংশ উদ্ধৃত ক'রে ক্ষান্ত হব :

"ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধ বা ধর্মের অভাব নয়, (আমাদের অবনতির প্রধান কারণ) চিন্তাশক্তির হ্রাস, জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার···চিন্তা করবার অক্ষমতা বা চিন্তাফোবিয়া।··· আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্র সাঁতরে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন, বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও ক'মে গেল—আমাদের সভ্যতা হ'য়ে দাঁড়ালো অচলায়তন, ধর্ম—বাহ্যের গোঁড়ামি।"*

বারীনদার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের লেনদেনে এই কথাটাই তাই চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবার দাবি করতে পারে যে তিনি বাইরের দিক থেকে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজের পথে চলেছিলেন তখনো শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন তাঁর দিশারি, বন্ধু, গুরু, আপন হ'তে আপন। এ-সংসারে শ্রীঅরবিন্দকেই যে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন একথা আমি প্রথম জানতে পারি যখন ১৯২৮ সালে সব ছেড়ে পণ্ডিচেরি প্রয়াণ করি। কিন্তু সেই সময়ে বারীনদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার স্নুরু হ'লেও তাঁর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয় অনেক আগে···সম্ভবত ১৯২৩ সালের শেষে। আজো স্পষ্ট মনে আছে—বারীনদার সঙ্গে কী পরিবেশে প্রথম দেখা হয়—কৃষ্ণনগরে, একটি ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কক্ষে। আমি তখন সবেমাত্র শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে এখানে ওখানে ঢুঁ মেরে দেখছি—কাকে গুরু করা যায়। কারণ শ্রীঅরবিন্দকে গুরু পাব এমন দুরাশাকে সে-সময়ে সত্যিই মনে ঠাঁই দিতে পারি নি। অন্তরে তৃষ্ণা নিবিড়···শ্রীঅরবিন্দের খবর না নিলেই নয়; কিন্তু উপায়? সে-সময়ে সি-আই-ডি পুলিশের দারুণ উৎপাত আর তাদের নেকনজরে

* এ-বাংলা চিঠিটি পণ্ডিচেরি আশ্রমে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কি না জানি না, তবে দিবাকরের MAHAYOGI বইটিতে এর অনেকাংশের ইংরাজিতে তর্জমা করা হয়েছে।

পড়া মানে প্রাণান্ত···বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা বলে না? কাজেই বারীনদা পণ্ডিচেরি হ'য়ে বাংলা দেশে ফিরেছেন সুভাষের কাছে এ-খবর পেলেও পুলিশ-অধ্যুষিত ভবানীপুরে সটাং বারীনদার ডেরায় হানা দেওয়ার দুঃসাহস হয় নি। তবু ব্যাকুলতা প্রবল হ'লে যোগাযোগ হয়ই হয়—আমারো হ'ল—বন্ধুবর রজনী পালিতের মুখে শুনলাম যে বারীনদা কি কাজে কৃষ্ণনগরে এসে আছেন—কার ওখানে মনে নেই—সম্ভবত রজনীর বাসাতেই। অথ, আর লোভ সামলাতে পারলাম না, গেলাম রজনীর সঙ্গে—লুকিয়ে বারীনদার সঙ্গে দেখা করতে। বুক দুরু দুরু করছিল!—তা অগ্নিযুগের প্রধান গাণ্ডীবী, আন্দামান-ফেরৎ যোগী, "দ্বীপান্তরের বাঁশি"র কবি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নারায়ণ পত্রিকার প্রখ্যাত লেখক এ-বহুমুখী প্রতিভাধরের সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেও বুক কাঁপবে না?

কিন্তু দেখা হ'তে না হ'তে বারীনদা কী সহজ স্নেহেই যে কাছে টেনে আপন ক'রে নিলেন: "এসো এসো দিলীপ! সুভাষের মুখে কত যে শুনেছি তোমার কথা! কতদিন ভেবেছিও—তোমার গান শুনব—" ইত্যাদি কত কথা, সে সব কি আর মনে আছে? শুধু এইটুকু মনে উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে যে তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল যেন কতকালের চেনা—কালিদাসের দুষ্মন্তের ভাষায়: "জনমান্তর সৌহৃদানি"—যেন অতীত কোনো জন্মের স্মৃতির হঠাৎ পুনরভ্যুদয়! সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম—কী গুণে তিনি যুবকদের বশ করতেন যার ফলে তাঁর এককথায় তারা প্রাণ দিতে ছুটত—যেন প্রাণদান ছেলেখেলা! (একথা পরে শুনেছিলাম উপেনদার মুখে।)

সে প্রায় ত্রিশবৎসরের কথা। বারীনদার সঙ্গে সেদিন সকালে আমার যা যা কথা হয়েছিল তার বারো আনা ভুলে গেছি। কেবল মনে আছে তিনি বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁদের সকলের গুরুপম উপদেষ্টা বিষ্ণুভাস্কর লেলের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। বারীনদা বলেছিলেন ফিক্ ক'রে হেসে: লেলে ভয় দেখাল: 'এসব বোমারু বিপ্লব ছাড়ো, নৈলে ভীষণ বিপদে পড়বে।' আমি তুড়ি দিয়ে বলেছিলাম: 'মরার বাড়া গাল নেই জী! বিপদ্ আর কী? ঝুলিয়ে দেবে তো? তার জন্যে গলা তো বাড়িয়ে দিয়েই আছি।'" হ্যাঁ, তিনি আমাকে আরো বলেছিলেন আন্দামানে বারো বৎসর কাটিয়ে ফিরে শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি যোগদীক্ষা নিয়েছিলেন প্রধানতঃ এই ভরসা পেয়ে যে ভারত স্বাধীন হবেই, তাই শ্রীঅরবিন্দ এক নব ভাগবত শক্তির নির্দেশে কয়েকটি পূর্ণযোগী গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সে-স্বাধীনতাকে অধ্যাত্ম বিকাশের দিকে চালনা ক'রে সমৃদ্ধতর সিদ্ধির ভিত্তিতে

সফল ক'রে তুলতে। এর পরে একদিন ভবানীপুরে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের এক শাখা-আশ্রমে একদিন যাই ও গান করি। সেখানে আরো কয়েকজন সাধক সাধিকা ছিল যাদের নিয়ে বারীনদা ধ্যানচক্রে বসতেন। এই শাখা থেকেই চাঁদা আদায় ক'রে তিনি পণ্ডিচেরিতে প্রণামী পাঠাতেন, এবং এই শাখার অনেকগুলি সাধক পরে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে প্রয়াণ করেন। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা এবং বর্তমান প্রসঙ্গে খানিকটা অবান্তর। তাই বারীনদার কথায়ই ফিরে আসি।

বারীনদা কৃষ্ণনগরে একটি কথা বলেছিলেন চমৎকার তথা অবিস্মরণীয়। আমি জাতীয় শিক্ষার প্রসারের কথা তুলতে বলেছিলেন: "ভাই, জাতীয় শিক্ষার প্রসারে এইটুকু লাভ হবে বৈ কি যে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ খাসা খাসা যুক্তি জড়ো করতে পারবে—কেন আমার জাত ছত্রপতি হবার ঐশী আদেশ পেয়েছে আর বাকি সব জাত জন্মেছে আমাদের হুকুমবরদার হ'তে। য়ুরোপের বুদ্ধিমন্তরা ধুয়ো তুলেছেন জগতের দুঃখ দূর হবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ১৯১৪ সালে কুরুক্ষেত্র বাধালো যারা তাদের কেউ কি কম শিক্ষিত ছিল—বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানে জগজ্জয়ী জর্মণ জাত? না দিলীপ, না। শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই ধরেছেন যে, নীতিপাঠের প্রচারে বা প্রসারে মানুষের মুক্তি নৈব নৈব চ—মুক্তি মিলতে পারে শুধু আমাদের চেতনার আমূল রূপান্তরে। তিনি এক নব দিশারি আলোর খবর পেয়ে আজ তপস্যায় তন্ময়·তাকে পৃথিবীতে নামাতে। সে-কর্ণধারের নির্দেশে আমাদের চেতনাকে ঢেলে সাজাতে পারলে তবেই আমাদের বুদ্ধির খেয়াকে রওনা ক'রে দেওয়া যাবে সেই বন্দরের পানে যেখানে ভরাডুবি হ'তে পারে না আর। এই জন্যেই এই আশ্চর্য মানুষটি দেশের ও দশের কাজ ছেড়ে বসেছেন যোগাসনে বুদ্ধের ম'ত—সিদ্ধিলাভ না ক'রে নড়ব না ব'লে: নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যতি।"

শুনে মুগ্ধ হ'য়ে ঝোঁকের মাথায় আমি বলেছিলাম, "আমি কি এ-যোগে দীক্ষা পেতে পারি না তাঁর কাছে?" তাতে তিনি ফের সেই মার্কামারা হাসি হেসে বলেছিলেন—বেশ স্পষ্ট মনে আছে: "এমন লাল ছেলে তুমি ভাই—এত তাড়া কি? এখন এদিক ওদিক ঢুঁ মেরে কিছুদিন কাটালেই বা রসের সন্ধানে। শ্রীঅরবিন্দের যোগে দাঁত বসানো বড় কঠিন রে দাদা। বড় একলার পথ সে—তুমি হ'লে পাঁচজনের। খুঁচিয়ে ঘা করা কি ভালো?"

নিরাশ হয়েছিলাম বৈ কি, কিন্তু এটুকু বুঝতে বেগ পেতে হয় নি যে বারীনদা আমাকে এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিলেন—আমার যে তখনো সময় হয় নি, আমি

যে-সত্যিকার ডাক শুনিনি সব ছেড়ে যোগে বসবার এটুকু টের পেয়েছিলেন তাঁর যৌগিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই হবে। এসূত্রে মনে পড়ে, দশবারো বছর বাদে পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে এসে বারীনদা "সোনার সিঁড়ি" ব'লে একটি উপন্যাসে লিখেছিলেন এই ধরনেরই একটি কথা। নায়ক বলছে নায়িকাকে : "তুমি কি একা চলতে পারবে? লতার ধর্ম আশ্রয় নেওয়া, গাছের ধর্ম আশ্রয় দেওয়া। মানুষ সব কি সমান? জোর ক'রে উপবাসী থাকাকে তো 'ছাড়া' বলে না। ত্যাগের কামনা আর ভোগের কামনা দুইই সমান উৎকট হ'তে পারে। সমতা তো তা নয়।"

বারীনদা অসামান্য প্রাণশক্তিমান্ ছিলেন ব'লে নানা ডাকেই সাড়া দিতেন। তাই হয়ত তিনি এত বেশি চাইতেন সমতা-কে। গীতার বাণী যখন তখন উদ্ধৃত করতেন : "সমত্বং যোগ উচ্যতে···সর্বত্র সমদর্শনঃ"···ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ নেপোলিয়নের একটি কথা তিনি উদ্ধৃত করতেন প্রায়ই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাস্যে। এক বিলাসিনী স্বৈরচারিণী নেপোলিয়নকে একদিন বলেছিলেন যে তিনি সতীত্বকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। নেপোলিয়ন হেসে বলেছিলেন : "মাদাম! আমরা তাই সবচেয়ে ভালোবাসি যা আমাদের নেই।"

তা ব'লে আমাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। আমি বলছি না বারীনদা স্বধর্মে যোগী ছিলেন না। বলছি শুধু এই কথাটি যে তাঁর ব্যক্তিরূপটি বৃহৎ ছিল ব'লেই তাঁর মধ্যে নানা জটিলতার মিশেল ছিল—বাইরে থেকে দেখতে যাদেরকে খানিকটা পরস্পর-বিরোধীই মনে হ'ত। তাই মলাট দেখে যারা তাঁকে বিচার করত তারা তাঁকে নানা উপাধি দিত—প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশি, রসরাজ, স্নেহশীল, সর্ববান্ধব। কিন্তু যারাই তাঁকে একটু তলিয়ে দেখেছে তারাই জানত যে এসব বাহ্য, তিনি অন্তরে ছিলেন যোগীই বটে যে ভয় কাকে বলে জানত না ব'লেই এককথায় সর্বস্ব ছাড়তে পারত। পণ্ডিচেরিতে আমি প্রথম টের পাই তাঁর এই অন্তঃশীলা যোগিপ্রকৃতির কথা—তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে দিল্‌খোলা ঢঙে বলতেন তাঁর নানা উপলব্ধি দর্শনাদির কথা, আর আমি শুনতাম উৎসুক তৃষ্ণায়। ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতায় আমাকে বলেন যে তাঁর বহু বৎসরের সাধনা সফল হয়েছে অবশেষে পুরীতে। সেখানে একদিন ধ্যানে তাঁর একটি আশ্চর্য উপলব্ধি হয়—শাস্ত্রে যাকে বলেছে একরস-এর অখণ্ড অনুভূতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে মহামুনি আরুণি তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুত্র শ্বেতকেতুকে 'তত্ত্বমসি' উপলব্ধির ব্যাখ্যায় বলছেন দুটি সূত্রে (৬. ৯. ১-২): যে যখন মৌমাছিরা নানা গাছের রস লুটে এনে একটি

রসে পরিণত করার পর সে-রসের কণিকারা জানে না কোন্ কণিকাটিকে কোন্ গাছ থেকে আহরণ করা হয়েছিল, শুধু জানে নিজেকে একটি অখণ্ড রস-রূপে—তেমনি নানা প্রাণী এক "সৎ"-এ লীন হ'লে আর জানে না নিজেদেরকে আলাদা আলাদা ক'রে, কাজেই সৎ-রূপকে যে পেয়েছে তাও বলতে পারে না—কারণ তখন আলাদা ক'রে একথা বলবারই কেউ আর থাকে না।

কথাটি শুনে আমার চমৎকার লেগেছিল এইটুকুই বলতে পারি, যদিও ছান্দোগ্যকার (বা বারীনদা) এ-উপলব্ধি বলতে কী বুঝেছিলেন আমি জানি না—এ-সৎ-স্বরূপের অখণ্ড একত্ব আমি আজো উপলব্ধি করতে পারি নি ব'লে। তাই বলি যা জানি বা জেনেছি এ মহামতি সাধকের সম্বন্ধে।

যতবারই তাঁর কাছে গিয়েছি জেনেছি—উপলব্ধি করেছি—একটি কথাই ফিরে ফিরে: যে, তিনি প্রেমময় সদানন্দ পুরুষ, সহজেই পরকে পারেন আপন ক'রে নিতে। 'একরস' আমি বুঝি না, কিন্তু এ-স্বার্থান্ধ জগতের আত্মপর মানুষের মধ্যে যখন অহেতুক প্রেম বা পরার্থনিষ্ঠা দেখি তখন তার মহিমা-কীর্তনে উজিয়ে উঠতে আমার বাধে না। এহেন প্রেমঘন ব্যক্তিরূপ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পঁচিশ বৎসরে এক মহাপ্রাণ ভোরুস্বামী ছাড়া আর কারুর মধ্যে বিকশিত হ'য়ে উঠতে দেখি নি।

বারীনদার আর একটি গুণ ছিল এই যে, তিনি রেখেঢেকে কথা বলতে পারতেন না, জীবনে যেসব মহৎ অনুভূতির স্বাদ পেয়েছেন অবাধে অপরকে ডাকতেন তার ভাগীদার হ'তে—গোপনিকতা, সাবধানতা, গুরুগম্ভীরতার ধারও ধারতেন না। আশ্রমে অনেকে লম্বা লম্বা কথা বলত শ্রীঅরবিন্দের নজিরে। শুনে তিনি শুধু হাসতেন, বলতেন প্রায়ই: "দাদা, এদের 'পরে আমার রাগ হয় না, কৃপা হয়—যারা ভাবে শ্রীঅরবিন্দের বুলি কপচেই এক একটি শ্রীঅরবিন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মরুকগে, বারীনদার কথাই বলি।

তাঁর মধ্যে দেখতাম প্রধানতঃ চারটি মহাগুণের সমাহার: শিশুর অপরিণামদর্শিতা, রসিকের রসালতা, ভাবুকের ভাবুকতা ও বিশ্বপ্রেমিকের বসুধৈবকুটুম্বকতা—পরকে আপন ক'রে নেওয়ার বিরল শক্তি। না, তাঁর আরো একটি চারিত্রসম্পদ ছিল—অনমনীয় পৌরুষ—জীবনের হাজারো ভূমিকম্পেও যাকে টলাতে পারে নি। তাঁর দেহাবসানের বৎসর দুই আগে—যখন তিনি প্রায় চলৎশক্তি হারিয়ে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল শ্যামবাজারে একটি দীন কক্ষে। সে অসহায় বার্ধক্যেও তাঁর মুখের শান্তদীপ্তি এতটুকু ম্লান দেখি নি—

যৌবনের উচ্ছলতা ছিল না অবশ্য, কিন্তু সেই স্নেহের সম্ভাষণ, বেপরোয়া চালচলন, নির্মল হাসি ও নিজেকে নিশানা ক'রে ব্যঙ্গ তাঁর প্রতিকথায় ঝ'রে পড়ত।

পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যখন আমি প্রথম আশ্রয় নিই—১৯২৮ সালে—তখন বারীনদা একান্তে থাকতেন গীতার "বিবিক্তদেশসেবিত্ব" বাদী হ'য়ে না হোক্—"বিরতির্জনসংসদি"-কে বরণ ক'রে। শ্রীঅরবিন্দের ঘরের ঠিক সাম্‌নেই ছিল তাঁর সাধনকক্ষ। তিনি প্রায় মৌনব্রতী জেনেও বিপদে পড়লেই আমি তাঁর কাছে ধর্না দিয়ে জুড়োতাম। আশ্রমে আমার মন ঘড়ি ঘড়িই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত, আর তখন আমাকে শান্তি দিতে ছিল শুধু গুরুদেবের পত্র, আর সান্ত্বনা দিতে বারীনদার স্নেহ। কী সরল অকুণ্ঠ ছন্দেই না তিনি আমার মতন কাঁচা সাধকের সঙ্গে যোগজীবনের নানা গভীর তত্ত্ব তথা আশ্চর্য তথ্য নিয়ে আলোচনা করতেন—যেন আমি অভিজ্ঞতায় বা জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ! তিনি প্রায়ই হেসে বলতেন: "আমাকে এত বড় ক'রে দেখো না দিলীপ, যদি দেখতে চাও তাহ'লে কিন্তু আমি পাল্‌টা জবাব দেব: 'তুম্ ভি মিলিটারি, হম্ ভি মিলিটারি।' আর গীতার কথা ভুলো না—'নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ'—যোগে দীনতা ভালো কিন্তু আত্মধিক্কার—self-pity—নৈব নৈব চ।" তাঁর আত্মবিশ্বাস আমাকে প্রায়ই উদ্বুদ্ধ করত ব'লেই আত্মধিক্কারী নিরাশার দ-য়ে পডতে না পডতে আমি তাঁর কাছে দরবার করতাম, আর তিনি টেনে তুলতেন নিজের অনুরূপ আত্মধিক্কার না হোক, রকমারি হা-হুতাশের কথা ব'লে। আর এসব সময়ে প্রায়ই তিনি ভরসা দিতেন গুরুশক্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের নানা উপলব্ধি অনুভূতির এজাহার পেশ ক'রে। "ভয় কি ভাই?"—বলতেন তিনি প্রায়ই দিলাশা দিয়ে—"তোমার আমার কি যে-সে গুরু না কি? সাক্ষাৎ সেজদা!" বলতে না বলতে তাঁর উচ্ছল রসনা উপমার ফুলঝুরি কাটত: "দাদা! ঐ মানুষটির কেউ কোনোদিন তল পায় নি, পাবে না।—জানো? আমি সেজদার উপমা খুঁজি—কিন্তু আমার এ উর্বর মস্তিষ্কও হার মানে—সে বলে: বাঁধভাঙ্গা বন্যা উনি, প্রতিভার পরশপাথর, ডিনামাইটের ডামাডোল, উল্লাসের সিন্ধুকল্লোল—কিন্তু মন খুঁৎ খুঁৎ করে, বলে: উঁহুঁঃ, উপমা অনুপ্রাসে শানাবে না।" এই ধরনের সে কত হাসি, কত গল্প, কত উচ্ছ্বাসের আল্পনা!

সত্যি, কী চমৎকার চমৎকার উপমাই যে তিনি দিতেন মুখে মুখে—আর ঘরোয়া ভাষায় বাংলার নানা জোরালো ইডিয়ম কী সহজেই না ফোটাতে পারতেন! আমার মনে হয় আজো যে যদি তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে "একান্তী" হতেন তাহ'লে

সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু ঐ যে বললাম—তাঁর দুরন্ত প্রাণ ও দামাল মন নিত্যই উধাও হ'ত নানা দিকে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: "Always he journeys but nowhere arrives"—চিরযাযাবর, তবু পারে না কোথাও উত্তরিতে।

কিন্তু একথা তাঁর পণ্ডিচেরি-জীবনপর্ব সম্বন্ধে খাটলেও তাঁর শেষ জীবনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁর ঔপনিষদিক "একরস"-এর গভীর অনুভূতির কথা। কী ভাবে এ-ভূমিতে তিনি খানিকটা স্থিতিলাভ করেছিলেন আমি জানতে চেয়েছিলাম ব'লে তিনি একবার "অলখ গীতা" নাম দিয়ে একটি চিন্তাচিত্র এঁকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে একটু উদ্ধৃতি দেই—আরো তাঁর চমৎকার ভাষাশৈলীর পরিচয় দিতে:

সৃষ্টির পিছনে সকল অস্তির পটভূমিরূপী এই শিবতা—এ যে কী বস্তু, বলবে কে? অসীম সমুদ্রে যেমন থেকে থেকে আচম্‌কা দ্বীপমালা ভেসে ওঠে ও ডুবে যায়—এই আমি-জ্ঞানে-উদিত জীবসত্তাগুলি তেম্‌নি অস্তিজ্ঞানের পরিচ্ছিন্ন দ্বীপের জটলা। এরা উঠছে, লয় পাচ্ছে পিছনের ঐ অস্তিত্বের মহাসিন্ধুকে নিয়ে—তারই সমগ্রের কোলে, দেশকালবোধের তুলির টানে তাতেই মূর্ত হ'য়ে।

"সে-সিন্ধু তাহলে স্বরূপতঃ কি? সে অনির্ব্বচনীয় অথচ সর্বরসাধার, সর্বভাবমন, নিখিলরূপগন্ধস্পর্শমুখর—অথচ সে এসবের কিছুই নয়। তাকে আস্তি ভাবলে সে পরম অস্তিত্ব, নাস্তি ভাবলে পরম কৈবল্য। সে কী নয়? তাই তো সে হ'তে পেরেছে যুগপৎ সর্বাতীত অথচ সর্বময়। সব ছাড়তে ছাড়তে সব কিছুকে নেতি-নেতির সিঁড়ি বেয়ে অতিক্রম ক'রে গিয়ে তাঁকে পাই পরম ত্যাগের মাঝে সর্বাতীত রূপে, আবার দেখি তারি অনির্বচনীয় শ্রীঅঙ্গ কি কৌশলে দৃষ্টিময়, বোধরূপী, জ্ঞানঘন হ'য়ে ফুটে উঠেছে অনন্ত রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে!"

এর পরের ভাবস্ফূর্তির দার্শনিকতা আরো কবিত্বে নিটোল:

"সহজ জ্ঞানে বুদ্ধিতেই বুঝা যায়—আমরা শূন্যে পৃথক্ হয়ে নেই, পূর্ণে মিশে তন্ময় হয়ে আছি। তা যদি না হ'ত তাহ'লে তুমি কাছ দিয়ে চ'লে গেলে আমার বুকে তরঙ্গ দুলে ওঠে কেন, কেন গন্ধ টানে, বাতাস জুড়োয়, দূরের ভেসে-আসা-তান আকুল করে। অথচ সেই সঙ্গে মন টোকে: 'আমি ফাঁকায় একাই আছি, পৃথক হ'য়ে শূন্যে আমার বাস।' মনোলোকে নেমে-আসা মানেই স্থূলে অবতরণ, ভেদের গোলকধাঁধার আথান্তরে পড়া—'এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি।'

মনই খণ্ডের ভেদের বিধাতা, অমনাই স্বরূপে-স্থিতি। আমরা মনসাগরের ঢেউ তাই আমাদের চিন্তা, গতিবিধি, সুখদুঃখ সবই মনের জলে দাগকাটা, আকাশে পাখীর পদচিহ্ন। এটুকু দেখতে পেলেই স্বরূপে-স্থিতি—ছুটি।"

বলা বাহুল্য, এসব তিনি আমাকে পত্রযোগে লিখে জানিয়েছিলেন কোনো চর্বিত-চর্বণের মামুলি স্বাদের সুখবর দিতে নয়। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে সাধ্যমত বোঝাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন—সে কোন্ অখণ্ড ঐক্যের (একরসের) আভাস পেয়ে তিনি "আনন্দী" হয়েছিলেন। আর এই আনন্দই তাঁকে দৃষ্টিপ্রদীপ জুগিয়েছিল যার আলোয় তিনি ইন্দিরাকে চিনতে পেরেছিলেন দেখবামাত্র, আমাকে বলেছিলেন তাঁর কলকাতার বাসায় ঃ

"ইন্দিরার মতন মহাসাধিকা তোমার সাধনশিষ্যা হয়েছে জেনে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে দিলীপ, কী বলব? এইবার তুমি পাবে সেই চাবি—শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ হ'য়ে যে-চাবি তুমি হাতে পেয়েও তালা খুলতে পারোনি, যদিও এজন্যে তোমাকে খুব দোষ দিতে পারি না, কারণ এ-চাবি দিয়ে তালা খোলার কৌশলটি একলা সাধনায় আয়ত্ত করা যায় না, দুজন চাই। এ-শুধু আমার কথা নয়, শ্রীঅরবিন্দের কাছেও শুনেছি বহুবার। কেবল এখন বসে যাও কোথাও একান্তে, ব'সে যাও—আর গড়িমসি না করে। শ্রীঅরবিন্দ যে-মন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছেন সে-মন্ত্রে সিদ্ধির শঙ্খধ্বনি আমি স্বকর্ণে শুনেছি ভাই, বিশ্বাস কোরো—তাঁকে নাস্তিকেরা দুয়ো দেয় দিক্—তুমি-আমি তো জেনেছি তিনি ছিলেন কী গনগনে আগুন আর আমাদের দিয়েছিলেন কোন্ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা! তবে? সংশয়কে নাই দাও কেন এখনো? কেন ভাবলে বজ্র-আঁটুনিতে তাঁর গেরো ফস্কে গেছে? না না না, আমি বলছি তোমাকে —আমি পুরীতে আভাস পেয়েছি শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা ব্যর্থ হবার নয়—অতিমানস আলো নেমে আমাদের চেতনার ভোল বদলে দেবে—দেবেই দেবে। কবি শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে মানুষের নবপ্রগতির যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সে বাণী কবিকল্পনা নয়, ঋষিবাক্য। তাই তোমাকে শুধু বলি—তুমি নিরাশ হোয়ো না—শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষা ভুলে হার মেনো না ভাই, এইই তোমার বৃদ্ধ বারীনদার শেষ অনুরোধ।" ব'লেই ইন্দিরার মাথায় হাত রেখে ঃ "মা ইন্দিরা! দিলীপকে তুমি দেখো—বিপথে পা দিতে দিও না—রাশ টেনে ধোরো। ওকে শক্তি দিও, আর এ শুধু তুমিই পারবে"……ইত্যাদি।

আর একটি প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখে আমি মুগ্ধ হতাম ঃ যে, তিনি সব কিছুই

তলিয়ে ভাবতেন, ক'ষে নিয়ে তবেই গ্রহণ করতেন—তা সে আপ্তবাক্যই হোক বা গুরুবাক্যই হোক। তাঁর নানা রচনায়ই তাঁর এই বিশিষ্ট বলিষ্ঠতা তথা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় মেলে। দু-একটি উদাহরণ দেই তাঁর "সোনার সিঁড়ি" থেকে :

"মানুষের দেহ চায় নিছক দেহভোগ, প্রাণ চায় রূপ যৌবন ও স্পর্শের বিদ্যুৎ, হৃদয় চায় প্রেম, আর মন চায় আন্তর সৌন্দর্যের নিখুঁৎ আদর্শ। এই চার যখন এক সঙ্গমে মেলে তখন সে-ই হয়ে দাঁড়ায় শ্রেষ্ঠ ভোগ—যার আগুনে দেহের ক্লেদও আর ক্লেদ থাকে না।"

এ বিরক্ত বৈরাগীর কথা নয়, ভাবুক দ্রষ্টার বাণী।

মেয়েদের সম্বন্ধেও কী চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন তিনি তাঁর নানা রচনায়। যথা "সোনার সিঁড়ি"তে :

"মেয়ে মানুষের সবই বিপরীত, এদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়; বুদ্ধি থাকলে হবে কি, ভাবের খেয়ালে এরা যেন হাউই বাজি, থাকে থাকে—ফোঁস ক'রে আকাশে ওঠে, তারপরেই ফট্ ক'রে হৃদয়ের বেগে ফেটে চৌচির! পুরুষ মানুষ একা দুটো ছেড়ে পাঁচটাকে নিয়ে ঘর করতে ভালোবাসে, কিন্তু নিজের সুবিধে-অসুবিধের হিসেববুদ্ধি হারায় না, কোন্‌খানে শক্ত মুঠোয় ধরতে হয় আর কোথায় আল্‌গা দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হয় বেশ বোঝে। কিন্তু মেয়েরা চলবে চোখ বুঁজে, হৃদয়ের ঢেউয়ে, হাসিকান্না, রাগ-ঈর্ষা,আদর-অনাদরের দমকা হাওয়ায়।"

বারীনদা তাঁর দুই দাদা শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমনোমোহন ঘোষের মতন বিশিষ্ট কবিপ্রতিভা নিয়ে না জন্মালেও তাঁর প্রাণটি ছিল কবিরই বটে। তাঁর "দ্বীপান্তরের বাঁশি"-তে ও আরো নানা কবিতায় এ-কথার প্রমাণ মিলবে। তবে আমার মনে হয় তাঁর কবিত্বশক্তি বেশি স্ফুট হয়েছিল তাঁর নানা গদ্য রচনায়—বিশেষ ক'রে বর্ণনায়। তাঁর স্বভাব কবিত্বের কিছু পরিচয় না দিলে তাঁর ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ব'লে তাঁর একটি অনুপম বর্ণনা একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বারীনদা এক জায়গায় "সোনার সিঁড়ি-তে" লিখছেন :

"পশ্চিম আকাশে চাপ চাপ মেঘের পাহাড়। তার ওপারে সূর্য অস্ত গেছে। মেঘে মেঘে রঙের হাট বসেছে। তলায় কালো বাদল, কালো ঠিক নয়—ঘন ধূসর শ্যাম।…তপন-দেবের সঙ্গে নবোঢ়া সন্ধ্যাবধূ বাসরসজ্জায় গেছেন; তারই শ্যামাঞ্চলের ঘেরে সিঁথায় নব এয়োতির সৌভাগ্য রেখাটুকু ঐখানে জলজ্বল করছে, এখনি বুঝি মুছে যাবে।…হয়ত বা ও একই মেয়ে নানান্ সাজে একই বরের সঙ্গে

ক্ষণে ক্ষণে নতুন ক'রে বাসরশয্যা পাতে। এ-মেয়ে বড় বিলাসিনী। উষায় গৌরী-দানের বালিকাবধূর সাজ—ললাটে সাদা মেঘের কনেচন্দন-আঁকা; একটু পরেই আবার সে জম্‌জমে সাজে কিশোরী বধূ; তারপরে ভরা দুপুরে হীরকপ্রভা পূর্ণ-যৌবনা; গোধূলিতে গৌরাঙ্গী প্রৌঢ়া; সন্ধ্যায় ক্ষীণাঙ্গী শ্যামা। এছাড়া চাঁদনি রাতে তার সে-মাধবীরূপের একেবারে নগ্ন বিলাস, আর অমানিশায় লাখো তারার চুম্‌কি-বসানো আগুল্‌ফকুন্তলা প্রখর মূর্তি। কালো মেয়ের এ-আলোকরা ছবি কি তোমরা দেখেছ? এ-মেয়ে অনন্ত প্রেমময়ী, তার বিশ্বনাথের মন পাবার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে কত মনমজানো সাজেই না সাজে! কত সিঁথি, চুড়ি, কাঁকন, হার! কত নূপুর, চরণচাঁপ, গোটের ছড়া, বাজুর দুল খোলে, আবার পরে! কত রং-বেরঙের শাড়ী, আংরাখা, ঘাগরা, কাঁচুলি বদলায়—তার কি হিসেব আছে? তাই বলি—নটরাজের এ-নটরাণীটি বড়ই বিলাসিনী।"

এ-তিনি পারতেন কারণ তিনি তুলি নিয়ে ছবি আঁকতেও ভালোবাসতেন। অবনীন্দ্রনাথকে একবার বারীনদা বলেছিলেন, যে তিনি ধ্যানে যা দেখেন অনেক সময়েই আঁকতে বসেন। আমি চিত্রজ্ঞ নই তাই বারীনদা কেমন ছবি আঁকতেন বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু আমি অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, তাঁর দৃষ্টি ছিল শুধু কবির বা ধ্যানীর নয়—তীক্ষ্ণ দ্রষ্টার। নৈলে বিশেষ ক'রে মেয়েদের ভাষাভঙ্গির এমন ফুলঝুরি কাটতে তিনি পারতেন না কখনই। এদিকে তিনি ছিলেন নির্ভেজাল রসসভার সভাসদ—তাই রসিকতায়ও ছুঁৎমার্গী ছিলেন না কোনোদিনই। তাঁর রসিকতার দু-একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাচিত্রটি শেষ করি: "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি মেনে।

কোনো প্রবীণ সাধক পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে একবার বাংলাদেশে ফিরে চকিতে বিবাহ ক'রে পণ্ডিচেরিতে ফিরে যান। মাঝে মাঝে তিনি বাংলাদেশে ফিরতেন। আমি একদিন বারীনদাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি ইনি পণ্ডিচেরি থেকে কবার দেশে ফিরেছিলেন। বারীনদা ফিক্ ক'রে হেসে বললেন: "রোসো ভাই, গুনি: এক দুই তিন—তিনটি ছেলে না ওর?" আমি অবাক হ'য়ে বললাম: "হ্যাঁ।" বারীনদা ফের তাঁর সেই মার্কামারা হাসি হেসে বললেন: "তাহ'লেই হয়েছে—ইউরেকা! ও তিনবার দেশে ফিরেছিল।"

১৯২৮ সালে আমি যখন পণ্ডিচেরি যাই তখন সেখানে মিস্টার ও মিসেস এক্স নিরিবিলি একটি ফ্ল্যাটে যোগসাধন করতেন। এঁরা আমেরিকান দম্পতি—

শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগ দীক্ষা নিয়েছিলেন কথা দিয়ে যে, স্বামী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য করবেন—থাকবেন ভাইবোনের ম'ত। বারীনদাকে একদিন সপ্রশংস ভঙ্গিতে ওঁদের এই কঠিন সংকল্পের কথা বলতেই বারীনদা টুকলেন ফের ফিক ক'রে হেসে: "সংকল্প তো অনবদ্য দাদা, কেবল রাখা ভার—এই যা।" সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, তবু আমি বুঝতে না পারার ভান ক'রে শুধালাম: "মানে?" বারীনদা চোখ মিটমিটিয়ে বললেন: "আর মানে দাদা! তুমি মীরাবাইয়ের একটি গান গাও না—'হোনী থী সো হোঈ'—যা হবার তাই হ'ল? কাল আমি একটি কাজে মিস্টার এক্সকে ডাকতে গিয়েছি পবিত্র গোধূলিলগ্নে। আচমকা ঢুকতেই উঃ, সে কী কাণ্ড দাদা! একটি শয্যায় একটা মানুষ যোগবলে শাঁ ক'রে ছিটকে পড়ল দুটো মানুষ হ'য়ে!" ব'লেই এক চোখ বুঁজে: "প্রায় উপনিষদ্ রে দাদা! তফাৎ এই যে সেখানে এক বলেছিলেন আমি বহু হব। আমাদের আশ্রমে সে হয় দুই—এখন তিন না হ'লে বাঁচি।" আমি হো হো ক'রে হেসে উঠতেই বারীনদা বললেন করুণ সুরে: "হেসো না দাদা—কাঁদো। ভাবো তো—আমাদের বিধাতা পুরুষটি কি সোজা শয়তান? চারদিকেই সাজিয়ে রাখবেন হাজারো মেঠাই, জিভে দেবেন স্বাদ, রঙ্গিনী মিঠাইওয়ালী মুচকে হেসে ডাক দিতেও ছাড়বেন না। কিন্তু তারপর রক্তমাংসের শরীর একটু শিউরে উঠতে না উঠতে বিধাতা পুরুষটি গর্জন করবেন: 'খবর্দার! সাত্ত্বিক নিমপাতা খেয়ে থাকো—হা হা হা'।"

একটি অবিস্মরণীয় মানুষ, বিচিত্র মানুষ, মানুষের মতন মানুষ। তাঁর আটাত্তর বৎসর বয়সে কলকাতায় তাঁর জন্মোৎসবে আমি তাঁকে প্রণাম পাঠিয়েছিলাম ১৯৫৮ সালে জানুয়ারি মাসে:

যোগিবীরেষু,—

অগ্নিযুগের দীপ্র পূজারী, বহুমুখী যার প্রতিভাশিখা;
ওজস অভয় কবচকুণ্ডলের ম'ত যার জন্মটিকা;
বাহিরে কর্মী, অন্তরে যোগী; মনীষী মানসে, রসিক প্রাণে;
সাধনা যাহার সুদূর-প্রসারী; গুরুরে করিয়া আত্মদানে
তবুও স্বাধীন ভাবুক যে থাকে—মিথ্যারে চিনি' মিথ্যা বলি';
সত্যের তরে সহিল দুঃখ হেসে যে নিন্দা ব্যঙ্গ দলি':
সে-তোমার শুভ এ-জন্মদিনে নন্দি' তোমায় পাঠাই নতি—
জন্মে যার কৃতার্থা জননী, কুল পবিত্র—হে মহামতি!

ছয়

ছেলেবেলায় নানা বইয়েই পড়তাম গুরুশিষ্যের মহৎ সম্বন্ধ ও পবিত্র সার্থকতা সম্বন্ধে কত যে ভালো ভালো কথা! বিদ্বান্‌দের মুখেও শুনতাম—বিশেষ ক'রে পিতৃদেবের ব্রাহ্ম বন্ধুদের মুখে—যে শিক্ষকেরাই জাতির মেরুদণ্ড, তাঁদের বিদ্যার আলোয়ই ছাত্রেরা পথ চলে, উপদেশের হাওয়া থেকে আহরণ করে জ্ঞানের নিশ্বাসবায়ু —এই ধরণের সে কী চমৎকার চমৎকার বাণী! কিন্তু হায় রে বাস্তব! কার্যক্ষেত্রে দেখতাম জীবনের বিপরীত এজাহার: ছাত্রেরা শিক্ষকদের ছায়া মাড়াতেও নারাজ, তথা শিক্ষকেরা ছাত্রদের "নোটস্‌" ও পরীক্ষার খাতায় নম্বর দিয়েই খালাস —কী কষ্ট পরিবেদনা! কেবল ভাগ্যবশে আমার জীবনে ছুটি শিক্ষকের সঙ্গে সত্যিকার হৃদয়ের যোগসূত্র গ'ড়ে উঠেছিল—অর্থাৎ যাঁদের স্নেহকে স্নেহ ব'লে চিনতে পেরে ভরসা জাগত প্রাণে, আনন্দ—প্রাণে, কৃতজ্ঞতা—হৃদয়ে। এঁদের মধ্যে একজনের কথা আজ বলব।

তাঁর নাম কে না জানে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—নাইট (স্যর), এফ. আর. এস, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা, গান্ধিজির বঙ্গীয় প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর দোসর, রসায়নের নানা গ্রন্থের প্রণেতা, দরিদ্র ছাত্রদের পরম ভরসা, চা-বিলাসীদের মহা-অরি, চরকার সর্বার্থসাধিকা বাণীর মহাচারণ, বাঙালীকে বাণিজ্যমুখী করার অদ্বিতীয় উপদেষ্টা…কত বলব? প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এস সি-র দুরন্ত রসায়ন শাস্ত্রের চাপে নাকের-জলে চোখের-জলে হবার দুর্লগ্নে প্রায়ই শুনতাম স্যর-এর কত যে গুণকীর্তন তাঁর বহু অনুরাগী শিক্ষক তথা ভক্ত ছাত্রের কাছে: শিবতুল্য, উদারচরিত, ছাত্র-অন্ত-প্রাণ, প্রাতঃস্মরণীয়, দাতা কর্ণ, বালব্রহ্মচারী, মহাপণ্ডিত, নিরভিমান, ক্ষণজন্মা. শিশুসরল…।

আই এস সি ক্লাসে ভর্তি হ'তে না হ'তে পরিতাপে আমি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছি, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি—কেন মরতে বিজ্ঞানের মহলে অনধিকার প্রবেশ করতে গেলাম—এমন সময়ে এক সতীর্থ—তাঁর নাম মনে পড়ছে না, বলা যাক সুশীল—আমাকে নিয়ে গেলেন স্যর-এর কাছে পেশ করতে। বললেন: "তাঁর ছোঁয়াতে তোমার মনে জাগবে রসায়নের প্রতি প্রেম হে!—যেমন সাধুর ছোঁয়াতে জাগে ভগবানের প্রতি ভক্তি।"

বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী আধাআধি সফল হয়েছিল : স্মর-এর মধুর স্নেহ পেয়ে ব্যবহারিক (practical) রসায়ন না হোক পুঁথিগত (theoretical) রসায়নের কিছু কিঞ্চিৎ রস পেয়েছিলাম বৈ কি যার সুফলের কথা বলছি যথাস্থানে—আগে তাঁর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টির প্রসঙ্গটি সেরে নিই। তাঁকে আমরা সবাই "স্মর" বলতাম, এ-নিবন্ধেও সেই অভিধাই কায়েম হোক।

যতদূর মনে পড়ে ১৯১৪ কি ১৫ সালেই হবে—আমার সুশীল-সতীর্থ আমাকে নিয়ে গেলেন স্মর-এর কাছে। তিনি এবং আরো অনেকে—স্মর-এর গুণগানে আত্মহারা হতেন ঘড়ি ঘড়ি, তবে আমার মনে সবচেয়ে গেঁথে গিয়েছিল তাঁদের একটি কথা : যে, স্মর ছাত্র-অন্ত-প্রাণ—পূর্বজন্মের বহু সুকৃতি থাকলে তবেই সে-ধন্য ছাত্র তাঁকে শিক্ষকরূপে পায়—তিনি ছাত্রকে তাঁর সরল প্রেমে ভুলিয়ে দিতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অগুন্তি দুর্ভোগ।

ভাগবতে আছে গোপীরা চোখে দেখার আগেই কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিল তাঁর বাঁশি শুনে। লোকমুখে স্মর-এর অজস্র গুণকীর্তন আমার কানে এম্‌নি বাঁশির সুর হ'য়েই বেজে উঠেছিল—তাঁকে দেখবার আগেই বরণ করেছিলাম স্বতঃস্ফূর্ত পূর্বরাগে। অথ, দুরু-দুরু-বক্ষে পেলাম সায়েন্স কলেজে এই "ক্ষণজন্মা"-কে দেখতে।

সুশীল আলাপ করিয়ে দিতেই স্মর আমাকে কাছে টেনে এনে বললেন : "অ্যাঁ! বলো কী? ডি. এল. রায়ের কুলতিলক—তার উপর শিবরাত্রির সল্‌তে —হা হা হা! তোমার কথা তাঁর জীবনীতে পড়েছি হে—আমিও শুনেছি তোমার গুণগান—তুমি না কি চমৎকার গাইতে পারো। আর কথাটি নয়, ধ'রে দাও তাঁর গান।"

সুশীল হেসে বলল : "দম নিতে দিন ওকে। ও এসেছে আপনাকে দর্শন করতে—"

স্মর হেসে বলে উঠলেন : "কে কাকে দর্শন করে that is the question, "উঁম্?" ব'লেই আমার দিকে চেয়ে : "দাঁড়াও দিলীপ, দেখি নয়ন ভ'রে—হা হা হা।"

(তিনি কথায় কথায় "উঁম্" ব'লে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে মাথা নাড়তেন এমন ভঙ্গিতে যে আজো ভুলতে পারি নি। তবে উঁম্ উচ্চারণ করতেন জিভ দিয়ে নয়—মুখ বন্ধ ক'রে আনুনাসিক উঁ প্রশ্ন করলে যে স্বরটি বেরোয় সেইটিই ছিল তাঁর মুদ্রাদোষ, যেমন শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর ছিল "বুঝেসেন্?")

তারপর উঠল পিতৃদেবের প্রসঙ্গ। স্যর বললেন: "তাঁর স্বদেশী গান আমাদের দেশে সবাইকে কী ভাবে মাতিয়ে তুলত দিলীপ, উঃ! এমন ওজস্—force—উঁম্? যত্র যত্র মেলে না হে। গাও তাঁর ঐ গানটি—না, আর দেরি নয়—আমার কী যে ভালো লাগে—তাঁর ঐ

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ—
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ!

কিম্বা তাঁর ঐ—

সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির!
উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল, মুছ এ-অশ্রুনীর।

শুনলে আমার বৃদ্ধ রক্তও গরম হয়ে ওঠে, কী বলো সুশীল, উঁম্? বাংলা-ভাষার মধ্যে যে এত তেজ গাঢাকা হ'য়ে ছিল কে জানত? এক হেমচন্দ্র জাগিয়েছিলেন এ-আগুন—" ব'লেই ধ'রে দিলেন:

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান—তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান—ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়?"

(এখানে ব'লে রাখি ফের—এ-সব তাঁর মুখের কথার হুবহু উদ্ধৃতি নয়—তাছাড়া আমি নিজের ভাষায়ই বলছি তাঁর নানা মন্তব্য, নানা সময়ের নানা কথা এখানেই বসাচ্ছি শুধু তাঁর যে ছবিটি আমার চোখে ফুটে ওঠে তার রং রেখা সংক্ষেপে ফোটাতে। স্মৃতিচারণ ঠিক ইতিহাস নয়, তার মূল লক্ষ্য—ছবি আঁকা।)

আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে শুধালাম: "কোন্ গানটি গাইব?"

স্যর বললেন: "অধিকন্তু ন দোষায়—দুটোই গাও। না, তিনটে—'আবার তোরা মানুষ হ' গানটিও শুনবই শুনব। জানো দিলীপ, আমি প্রায়ই বলি—এই গানটিই হ'ল ডি. এল. রায়-এর প্রধান বাণী—message, কি বলো সুশীল—উঁম্? কারণ মানুষই দেশকে গড়ে—আমাদের দেশের আজ এ-দুরবস্থা কেন? সত্যিকার মানুষ এত কম ব'লে, নয় কি? উঁম্?"

আমি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে গানের পর গান গেয়েছিলাম মনে আছে—যদিও কী কী গান মনে করতে পারছি না।

হ্যাঁ, আর একটি কথা মনে পড়ছে। স্যর জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি "তরী হেথা বাঁধব না গো আজকে সাঁঝে" গানটি জানি কিনা। আমি "না" ব'লেছিলাম একটু অবাক হ'য়েই বলব। কারণ এ গানটি সে-সময়ে খুব জনপ্রিয় হ'লেও আমার

তেমন ভালো লাগত না, মনে হ'ত বড় বেশি উচ্ছাসী—সেন্টিমেণ্টাল। বিপত্নীক স্বামী স্ত্রীর দেহ যে-শ্মশানে দাহ করেছিলেন সেখানে নৌকা ভিড়োতে চান নি—স্ত্রী তাঁর কী অপরূপা ছিল সেই বর্ণনায়ই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। (শরৎচন্দ্র একবার এ-গানটির সম্বন্ধে আমার বিরূপ মন্তব্য শুনে বলেছিলেন: "কিন্তু মণ্টু, এ তোমার অন্যায়—স্ত্রী হ'লে বুঝতে যদি তার পরে কখনো বিধবা হ'য়ে তাকে নিজে দাহ করতে—হো হো হো!")

স্যর সেদিন আর একজন মহাবরেণ্য কবির প্রসঙ্গেও এম্‌নি উজিয়ে উঠেছিলেন। তিনি শেক্ষপীয়র। বলেছিলেন: "আমি কতবারই যে পড়ি ওঁর নাটক দিলীপ, আর বলি শেক্ষপীয়র শেল্‌ফে মজুদ থাকলে আর কোনো বই না থাকলেও চলে। অমুক বলেছিলেন (নামটা ভুলে গেছি, কার্লাইল কি?) ঠিকই: 'শেক্ষপীয়রের নাটক থাকতে আর কোনো বই পড়ার কী দরকার—অগুন্তিবার তাঁর নাটকগুলিই পড়ো না।"

সন্ন্যাসীদের মধ্যে বারবার শুনেছি হুবহু এই কথাটিই গীতা ও ভাগবত সম্বন্ধে।

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রসঙ্গে প্রথমেই এই তিনটি দৃষ্টান্ত দিলাম তাঁর চরিত্রের তিনটি দিক দেখাতে। অর্থাৎ আজো তাঁর কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিচক্ষে ফুটে ওঠে তাঁর এই তিনটি বিভিন্ন রূপ—তিনি সহজেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন দেশ ভক্তিতে, কারুণ্যে ও নাটকীয় ভাবাবেগে।

ধর্ম তিনি মানতেন কিনা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না, তবে আচার আদৌ মানতেন না। না, কম বলা হ'ল, তিনি প্রায়ই বলতেন আচার ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদ এই ত্রিশূলেই আমাদের বিঁধে মেরেছে। বিশেষ ক'রে শুচিবাই-বর্গীয় কুসংস্কারকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা ছিল তাঁর একটি প্রধান আমোদ। মনে আছে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার এক সতীর্থের কথা। তার টিকি ছিল মস্ত—তাই নাম দেওয়া যাক "দীর্ঘশিখী"। স্যর প্রায়ই তাকে নিশানা ক'রে ব্যঙ্গবাণ ছুড়তেন। একবার করেছিলেন এক কাণ্ড! আমরা ক্লাসে এসে বসতেই তিনি বাঁ হাতে একটি হাড় ও ডান হাতে একটি পাত্রে কিছু ভস্ম নিয়ে দীর্ঘশিখীকে ডেকে বললেন: "তুমি সায়েন্সে বিশ্বাস করো নিশ্চয়ই, নৈলে বি. এস-সি পড়ছ কেনই বা? তাই শোনো বলি—এই যে হাড় এ হ'ল ওঁ শ্রীরামপক্ষীর ঠ্যাং। আর এই যে ভস্ম এ হ'ল ঐ পক্ষীরই হাড়-পুড়িয়ে-পাওয়া ভস্ম। এই দেখ, আমি এই ভস্ম মুখে দিলাম। আমার জাত গেল, না রইল? উঁম্?"

দীর্ঘশিখীর মুখ লাল হয়ে উঠল : "এ কী রকম ঠাট্টা স্যর ?"

স্যর হো হো ক'রে হেসে তার পিঠ থাবড়ে বললেন : "রাগই পুরুষের লক্ষণ, কী বলো ? উঁম্ ? তবে এ আমার ঠাট্টা নয়—হাটে জলজ্যান্ত সত্যের হাঁড়ি ভাঙা।· আমার জাত যায় নি বোঝাতেই এ-ডিমনস্ট্রেশন। অর্থাৎ হাড় পুড়োলে সে oxidized হয়ে একেবারে একটি আলাদা জিনিস হ'য়ে যায়, কি না—calcium carbonate".

(ক্যালশিয়াম না কি বলেছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ঐ ধরণেরই একটা কথা)

দীর্ঘশিখী ক্লাসের সকলের হাসিতে বিব্রত হ'য়ে গুম্ হ'য়ে গেল। স্যর হেসে বললেন : "অত রাগ কেন ? সায়েন্স যদি পড়তেই চাও তবে সায়েন্স থেকে যা শিখবার আছে তা শিখতে আপত্তি করলে চলবে কেন ? উঁম্ ? সায়েন্সের একটি মস্ত কাজ হ'ল বস্তুবিচার ক'রে মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা—অন্তত খানিকটা। তাই এ-ভস্ম খেলে তোমারো জাত যেত না, পরখ ক'রেই দেখ না কেন ? উঁম্ ?" আবার ক্লাসে হাসির হর্‌রা প'ড়ে গেল। দীর্ঘশিখী তো রেগে আগুন! পরে আমাকে বলেছিল : "এ কী রকম শিক্ষক ? আমাদের পড়াতে এসেছেন—পড়ান। জাত তুলে কথা কইবেন কেন ?"

আই. এস-সি পাশ করার পরের ঘটনা এটি—যখন আমি স্যর-এর রসায়ন ক্লাসে সবে ভরতি হয়েছি। ইতিপূর্বে আই. এস-সি-তে দুবছর রসায়ন শাস্ত্র পড়তে আমার সত্যি কান্না আসত—যে কথা আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে ফলাও ক'রেই লিখেছি। কিন্তু স্যর-এর কাছে রসায়ন পড়তে পড়তে দেখি অবাক্ কাণ্ড—রসায়নে একটু একটু রস পাচ্ছি বৈ কি! ফলে তৃতীয় বার্ষিকী কলেজ পরীক্ষায় একশোর মধ্যে ৭৭ পেয়ে প্রথম হলাম। (ব'লে রাখি—এ অসাধ্যসাধন করেছিলাম আমি শুধু স্যর-এর প্রিয়পাত্র হ'তে। পরের বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বি. এস-সি-তে এই রসায়নেই আমি ফেল করি—১৯১৭ সালে।) স্যর-এর সে কী আনন্দ—ভুলব কী কোনোদিন ? চতুর্থ বার্ষিকী ক্লাসে উত্তীর্ণ হ'য়ে ছুটির পরে তাঁর ক্লাসে প্রথম ঢুকেই সে কী কাণ্ড! আমি কোনো পরীক্ষায়ই আর কখনো প্রথম হই নি—তাই হয়ত স্যরের সেদিনকার হুলুধ্বনি আজো আমার কানে বাজে।

হুলুধ্বনি ব'লে হুলুধ্বনি! স্যর আমাকে (তথা আরো অনেক ছাত্রকেই) স্নেহে আলিঙ্গন করেছেন একাধিকবার, কিন্তু সেদিন করলেন এক কাণ্ড! আমরা

ক্লাসে ঢুকতেই স্তর চেঁচিয়ে আমাকে "প্রথম" ব'লে অভিনন্দিত ক'রে কাছে ডেকে আমার খাতার একটি পাতা খুলে সবাইকে ঝাণ্ডার মতন নেড়ে দেখালেন সগর্বে : "দেখ হে, দেখ সবাই! আমাদের দিলীপ শুধু ফার্স্ট হয় নি, কী রকম মোক্ষম রিটর্ট (retort) ও বানসেন বার্নার (Bunsen burner) এঁকেছে দেখ চেয়ে! ব্রাভো!" ব'লেই খাতা রেখে দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে উঠে দুপা লতিয়ে আমার কটিবেষ্টন ক'রে বৃদ্ধশিশু ঝোঝুল্যমান আমার বুকে। এ একটুও বাড়িয়ে বলছি না—তাছাড়া এ-ধরনের অঘটন চেষ্টা করে কল্পনা করা কঠিন। শুধু কি তাই? ক্লাস শুদ্ধু ছেলে হুলুধ্বনি দিয়ে হেসে উঠল। একজন ছাত্র হেসে ব'লে উঠল চেঁচিয়ে : "স্তর, ভাগ্যে দিলীপ মুগুর ভাঁজে, প্যারালেল বার করে, তাই আপনার ভার বইতে পারল। আমি হেসে পিঠপিঠ উত্তর দিলাম (তখন আমার সাহস এসে গেছে তো, ফার্স্ট হয়ে) "স্তর জ্ঞানেই ভারি, দেহে ফেদারওয়েট। মুগুর না করলেও বইতে পারতাম।" অমনি রসিক স্তর হেসে জবাব দিলেন : "ভুল করলে দিলীপ, জ্ঞানী ভারী কোথায়? শাস্ত্রেআছেঃ "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া'—কি না অজ্ঞান যে সে তিন মণ দশ সের, জ্ঞানী যে সে শোলার মতন। হা হা হা!" ক্লাসের সে কী হাসির হর্‌রা! এ ছবিটি কি ভুলবার?

সত্যি, আজও স্তর-এর কথা ভাবতে মন আর্দ্র হ'য়ে ওঠে : কী সরল সহজিয়াই না ছিলেন তিনি! বলতে ইচ্ছা হ'ত তাঁকে একটি গানের আস্থায়ী ভেঁজে : "তোমার তুলনা তুমি।" ছাত্রদের এমন স্নেহ করতে পারে কজন? সংস্কৃত তিনি ভালোই জানতেন, বলতেন কথায় কথায় ; "সর্বত্রং জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"—সর্বত্রই জয় চাইবে, কেবল পুত্র ও শিষ্যের হাতে পরাজয়।

এই সময়ে মাঝে মাঝে যেতাম সায়েন্স কলেজে তাঁর কাছে—তাঁকে গান শোনাতে তথা তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ করতে। একবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই যথা পূর্বং তথা পরং—বিরাট হল ঘর : একটি খাটিয়া, একটি টেবিল আরো দু'চারটি ছোটখাটো আসবাব মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে ঘরটি প্রায় শূন্যই মনে হ'ত—যেন বাসের জন্যে নয়, পান্থশালা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হ'ত কখনো কখনো। একদিন তাঁকে আমি বলেছিলাম : জানেন শরৎদা, স্তর-এর মতন একজন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক যে এভাবে কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীর মতন দীনবেশে রিক্ত ঘরে দিনের পর দিন এমন পরমানন্দে কাটাতে পারেন এ আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।"

সত্যিই বিশ্বাস হবার কথা নয়—আরো এই জন্যে যে স্যর-এর মাসিক আয় ছিল প্রচুর : বেঙ্গল কেমিকাল, বইবিক্রি, মোটা মাইনে—সর্বসাকুল্যে তিন চার হাজারের কম নয়। (আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে তিন হাজার এখনকার দশ-বারো হাজারের সামিল—মনে রাখা চাই।) কাজেই এ-বিপুল আয়ে তিনি সে-যুগে রাজার হালেই থাকতে পারতেন। কিন্তু "স্বভাবস্তু প্রবর্ততে" তো—কাজেই এ-স্বভাবে দাতাকর্ণ তথা সন্ন্যাসী মানুষটি পারতেন না দান ছেড়ে আত্মসুখসর্বস্বতাকে বরণ ক'রে বিলাসে গা ঢেলে দিতে। শরৎচন্দ্র প্রায়ই বলতেন : "স্যরকে দেখে সব আগে মনে হয় বিদ্যাসাগর-এর কথা—দয়ার সংযমের অবতার—আর দেখ : জ্ঞানের উদয়ে যে সরলতার আলো ছড়িয়ে পড়ে কেমন সহজে!"

আমার মনে নেই সেদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে স্যর-এর কি কি কথা হয়েছিল—কেবল একটি কথা ছাড়া। স্যর বলেছিলেন : "শরৎবাবু, আপনার লেখার আমি এত ভক্ত কেন জানেন? কারণ আপনার সৃষ্ট চরিত্র প্রত্যেকটিই রক্তেমাংসে গড়া মানুষ—পড়ে আবার ওঠে। প্রলোভনে যারা কোনোদিন টলে নি তারা তো পাথর, পাথর, পাথর। উঁম্?" শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছিলেন : "বাস্তববাদের—রিয়্যালিস্‌মের—এই-ই তো প্রাণের কথা।" হ্যাঁ, আর একটি কথা মনে পড়ছে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন হেসে : "দিলীপ বলেছে আমাকে তার সতীর্থ দীর্ঘশিখীর দুরবস্থার কথা। আপনি জানেন নিশ্চয়ই ওর বাবা টিকি নিয়ে কী ঠাট্টাতামাশাই করতেন—গাও না মণ্টু, স্যরকে শুনিয়ে দাও সেই 'হয়েছি হিন্দু' গানের টিকি-মাহাত্ম্য।" আমি খুশি হ'য়ে ধ'রে দিলাম :

(আহা) কী মধুর টিকি আর্যঋষি কী বানিয়েছিলেন কল গো!
(ও সে) আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে (অথচ) চতুর্বর্গ ফল গো!
(আহা) এমন কম্র, এমন নম্র, আছে গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে!
(অথচ সে) সব একদম করিছে হজম (কী) বিষম হজমিগুলি এ!

আমার জীবনের নানা অঙ্কে নানা লাভ হয়েছে, কিন্তু একটি মস্ত লাভ হয়েছে মহাজনদের পাশাপাশি দেখা : দ্বিজেন্দ্রলাল-গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ, রাসেল-রোলাঁ, গান্ধিজি-আবদুল গফ্‌ফর খাঁ, দেশবন্ধু-সুভাষ...ইত্যাদি। আমি ভাগবতের একটি কথায় চিরদিনই বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, মহৎ প্রেরণা আমাদের অন্তরে বীজের মতন উপ্ত হ'য়ে থাকলেও অঙ্কুরিত হ'য়ে

ওঠে মহাজনদেরই সংস্পর্শে। আজো মনে পড়ে—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের কথা। ইতিপূর্বে আমি লিখেছি এ সম্বন্ধে, তা থেকে উদ্ধৃত করি—স্মৃতিচারণে এটুকুও উৎকীর্ণ রেখে যাওয়া মন্দ কী? উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি একটি প্রবন্ধ থেকে—৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখেছিলাম :

"রবীন্দ্রনাথ এসেছেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসদনে, শরৎচন্দ্রও সেদিন উপস্থিত। বঙ্গসাহিত্যের সূর্যচন্দ্র একই আকাশের আসরে—যেন পূর্ণিমার পরের দিন স্বর্যোদয়লগ্নে। শরৎদার 'দেনাপাওনা'-র প্রসঙ্গ উঠল। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'শরৎ, তুমি আমাদের সমাজকে দেখেছ ভিতর থেকে। আমি দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকেই বলব—আমার যৌবনে ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ খানিকটা একঘরে ক'রেই রেখেছিল তো। তাই তোমার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখি নি ব'লেই আরো খুশি হয়েছি যে এ-ধরনের চরিত্রকে নিয়েও তুমি সার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছ। কেবল মুস্কিল এই যে তোমার ভৈরবীকে দেখলে গানের সুরে 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' বলতে ইচ্ছে হ'লেও মনে হয় গল্প নাটক নভেলে তো বিভীষিকাই জাগবার কথা—অন্তত নাম শুনলে।"

"শরৎদা হেসে বলেছিলেন : 'ভৈরবী নামটা শুনলে মন "ও বাবা!" ব'লে ওঠে মানি। কিন্তু আমার ভৈরবী তো কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মতন ভয় দেখায় না—ভালোই বাসায়'।"

রবীন্দ্রনাথের এ-মন্তব্যটি আমার আজো মনে আছে আরো এইজন্যেই যে কথামৃতে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথা পড়লেও আমাদের সমাজের যে-স্তরে ভৈরবী-ভৈরব তান্ত্রিক-কাপালিকদের যাওয়া-আসা সে-সমাজের সঙ্গে আমাদের মতন ইঙ্গ-বঙ্গদের সত্যিই কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু অবান্তর ছেড়ে প্রাসঙ্গিকের কোঠায় ফিরি।

প্রফুল্লচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রায়ই আমার কাছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। যতদূর মনে পড়ে শরৎচন্দ্রকে প্রথম আমিই তাঁর কাছে নিয়ে যাই তাঁর অনুরোধে। তবে এ-ধরনের খুঁটিনাটিতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয় তাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র কী ভাবে উজিয়ে উঠতেন সে-প্রসঙ্গ বলি আর একটা কথা যা স্মৃতিপটে আজো জলজ্বল করছে।

শরৎচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি নানা বিষয়েই সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, কে না জানে? কেবল একজায়গায় ওঁদের গভীর মিল ছিল : হিন্দুধর্মের আচারপন্থী শুচিবাইয়ের বিরোধী ছিলেন দুজনেই। শরৎচন্দ্র "বামুনের মেয়ে"তে লিপিবদ্ধ ক'রে

গেছেন তাঁর মন্তব্য—গল্পে। প্রফুল্লচন্দ্র আচারের বিরুদ্ধে অভিযান করতেন আমাদের শাস্ত্র ঘেঁটে দেখিয়ে যে আমাদের মুনিঋষিরা ধর্ম ও আচারকে গুলিয়ে ফেলতেন না—তাঁরা যথার্থ জ্ঞানী ছিলেন ব'লেই। আমার কাছে তিনিই প্রথম বলেন সত্যকাম ও জাবালীর কথা। বলেন: "ছান্দোগ্যে দেখতে পাবে দিলীপ, সত্যকে তাঁরা কী দাম দিতেন। সত্যকাম গৌতমকে এসে বলল: 'দীক্ষা দিন'। গৌতম বললেন: 'তোমার কী গোত্র?' সত্যকাম মাকে শুধিয়ে ফিরে এসে অকপটে সত্য বলল: 'মা নানা লোকের পরিচারিকা ছিলেন, তাই বলতে পারলেন না কে আমার পিতা।' গৌতম আশীর্বাদ ক'রে তাকে দীক্ষা দিলেন এই ব'লে যে জারজ হ'য়েও যে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না সে-ই তো যথার্থ ব্রাহ্মণ।" বলতে বলতে স্যর উজিয়ে উঠেছিলেন সেদিন, বলেছিলেন: "এইজন্যেই মহাভারত রামায়ণ উপনিষদ পড়তে পড়তে আমার মন এত খুশি হ'য়ে ওঠে দিলীপ! আমরা প্রায়ই বলি: 'We are proud of our ancestors!' আমার মনে প্রশ্ন জাগে: 'But are they proud of us, their worthy successors?' তাই তো আমি এত চড়াও হ'য়ে বলতে চাই তাঁদের উদারতার কথা—শুধু দেখাতে আমরা আজ কী হ'য়ে পড়েছি—আচার শুচিবাই জাত ছোঁওয়াছুঁয়ি মেনে। এই দেখ না কেন, আমরা ঘড়ি ঘড়ি কী সদর্পেই না বলি: 'গো মাতা! আহা, কী ভাব রে! আমাদের মুনি ঋষিরা কী মাতৃভক্ত ছিলেন!' কিন্তু বেদে ও বৃহদারণ্যকে গোমাংস খাওয়ার বিধি আছে। মহাভারতেও দেখতে পাবে আমাদের মুনিঋষিরা আহারের শুদ্ধতা নিয়ে এত গলাবাজি করতেন না, তাই তাঁরা শুধু যে মাংসাহারের বিধান দিয়েছিলেন তাই নয়, ঘোষণা ক'রে গেছেন বড় গলা ক'রেই—যে গোমাংস পরিবেশন ক'রে বিখ্যাত ভক্ত রাজা রন্তিদেব কী দারুণ যশস্বী হয়েছিলেন! না দিলীপ, এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? নিরামিষ খাও, আমি বুঝি—কিন্তু অমুক মাংস খেলে যদি নরকে না যাই তবে তমুক মাংস খেলে নরকে যেতে হবে কেন? বিবেকানন্দ কি মিথ্যে বলেছেন—আমাদের ধর্ম গিয়ে ঠেকেছে শেষটায় ঐ ভাতের হাঁড়িতে, শুচিবাইয়ে touch-me-not-ism-এ? গান্ধিজিকে আমি এত ভক্তি করি তিনি নিজেকে হরিজন ব'লে থাকেন ব'লে।"

(স্যর-এর কাছে শুনে সেদিন বাড়ি ফিরেই তাঁর নির্দেশে মহাভারত বনপর্ব খুলে পেয়েছিলাম: স্বয়ং মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন (১৭৬ অধ্যায়ে): যে শুধু যে মৃগ পক্ষী অন্নের মতনই মানুষের খাদ্য তাই নয়, বিখ্যাত ভক্ত রন্তিদেব রাজার

রান্নাঘরে প্রত্যহ দুহাজার গরুকে পাক ক'রে সেই মাংসের সঙ্গে অন্ন পরিবেষণ ক'রে তাঁর অতুল কীর্তি হয়েছিল। শ্লোক তিনটি এই :

ওষধ্যো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
অন্নাদ্যভূতা লোকস্য ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥ (৬)
রাজ্ঞো মহানসে পূর্বং রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ!।
অহন্যহনি পচ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা॥ (৮)
সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তিরভবন্ নৃপস্য দ্বিজসত্তম!॥ (৯)

এ-প্রসঙ্গটা এত ক'রে বললাম শুধু মনে আছে ব'লেই নয়, স্থর-এর মুখে এসব কথা শুনে আমার আবাল্য আচারবিমুখতা জোর পেত ব'লেও বটে। এ সম্পর্কে তাঁর একটা কথা আজও কানে বাজে, তিনি বলেছিলেন শরৎচন্দ্রকে : "শরৎবাবু! আপনার পল্লীসমাজ প'ড়ে আমি সবপ্রথম আপনাকে ভালোবেসে ফেলি। আর কেন জানেন? যে, আমরা যে ঘোর তামসিক হ'য়ে পড়েছি একথা আপনি চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন ঐ বইটিতে। আমাদের সমাজের কী যে দুরবস্থা শরৎবাবু, ভাবতেও হাঁপিয়ে উঠি, সত্যি বলছি। কেবল মুস্কিল কী জানেন? —যে, আমি হিন্দুদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এ-ধরনের কথা বললেই লোকে বলবে—বেটা কালাপাহাড়, বেহ্ম—তাই নিন্দে করছে পবিত্র সনাতন, হিন্দুসমাজকে। ঠিক যেমন আমি চা-খাওয়ার বিরুদ্ধে দাপাদাপি ক'রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই ব'লে সম্ভবত আপনারাও বলেন নিজেদের মধ্যে : উনি ডিস্‌পেপ্‌টিক তো তাই চা সয় না ওঁর ধাতে—হা হা হা।"

ফিরবার পথে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে বলেছিলেন : "না দেখলে বিশ্বাস হয় না মণ্টু! ঠিক যেন ষাট বছরের শিশু—কী বলো তুমি?"

কিন্তু শুধু শিশুসারল্যই বা বলি কেন? তার গুণ ছিল কি একটা? "গুণাকর" উপাধিই দিতে হয় তাঁকে। কেবল তাঁর আর একটি গুণের কথা এখানে বলি—যেটি আমার চোখে পড়েছিল, বিশেষ ক'রে কটকে।

কটকে আমি যাই এক খদ্দর কনফারেন্সে। স্থর তখন গান্ধিজির চরকা নিয়ে বিষম মেতে উঠেছেন। আমি তাঁর ও সুভাষের প্রভাবে প'ড়ে খদ্দর পরছি তখন—যদিও খদ্দর পরতে ভালো লাগত না একটুও—আরো বারীনদার কাছে

শোনার পরে যে শ্রীঅরবিন্দ খদ্দর-হুজুককে ছেলেমানুষি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন খদ্দর বিরোধী। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের একটি পরিহাসের কথা ভুলব না কোনোদিনও। তিনি আমাকে বরাবরই স্নেহ করতেন কিন্তু আমার খদ্দর-পরা দেখতে পারতেন না। একদিন বলেছিলেন: "তোমার এ-দুর্মতি দেখে দিলীপ আমার কী হয় বলব? কান্না আসে ঠিক সেই নাপিতের মতন যে গৌরাঙ্গের চাঁচর কেশ মুড়িয়ে দিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল। তাই ব'লে ভেবে বোসো না যেন যে তুমি গৌরাঙ্গ অবতার—হা হা হা।" কিন্তু যা বলছিলাম।

কটকে স্যর ছিলেন প্রেসিডেণ্ট খদ্দর-প্রচারিণী সভার। আমরা উঠেছিলাম সেখানকার জমিদার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু-র বাড়ি। মস্ত বাড়িতে শুধু আরামে নয় পরমানন্দে ছিলাম—স্যর-এর সঙ্গে নানা হাসিঠাট্টায় দিন কাটত ব'লে। এমন সদানন্দ বৃদ্ধ কজনই বা দেখেছি। শীর্ণকায়, খেতে পারেন না কিছুই, কিন্তু কী উৎসাহ, প্রাণশক্তি, উচ্ছলতা! এই সূত্রে আরো চোখে পড়েছিল সাধারণ মানুষকে তিনি কী সহজে কাছে টানতে পারতেন! তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি ছিল গভীর, কিন্তু তিনি ভুলেও চাইতেন না তাদের ভক্তিভাজন হ'য়ে তাদের দূরে রাখতে। Standing on one's dignity বলতে যে-মনোবৃত্তি বোঝায় স্যর-এর স্বভাব নিত্যই চলত তার উল্টোমুখে—দীন হীন বেশে বিনা প্রসাধনে তিনি যে আসত তার সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিতেন যেন কতকালের আলাপ! স্যর জগদীশচন্দ্র ছিলেন যেমন গম্ভীরাত্মা, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তেম্‌নি প্রফুল্লাত্মা। নামটি তাঁকে মানিয়েছিল বৈ কি।

কিন্তু যা বলতে কটকের প্রসঙ্গের অবতারণা: কটকে আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়েছিল তাঁর একটি গুণ: তিনি সব কিছুই অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অনুভব করতেন। এ-গুণটি প্রাণশক্তির প্রায় নিত্য-সহচারী। সংসারে দিনগতপাপক্ষয় ক'রে চ'লেই বেশির ভাগ মানুষ তুষ্ট থাকে। খুব কম মানুষই প্রাণের চতুর্দোলায় উধাও হয় উৎসাহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে। এ-জাতীয় মানুষ ভুল করে প্রচুর, ঠকেও কম না, কিন্তু তবু—স্বভাব তো—কথায় কথায় উজিয়ে না উঠে পারে না—মহাপ্রাণদের অনুভবশক্তির ধার ও ভার দুই-ই অসামান্য হ'য়ে থাকে ব'লে। এ সম্পর্কে আর একটি কথা মনে হয়।

যাঁরা চিরদিন সংযত ও জিতেন্দ্রিয় জীবন যাপন ক'রে এসেছেন তাঁদের সচরাচর দুরকম পরিণতি হয়: এক, অপরের দোষ-ত্রুটি স্খলন দেখলে অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠা; দুই, সংযমের ফলে অন্তরে আবেগের তেজ ও দীপ্তি সংহত হ'য়ে ওঠা—

অনুভবশক্তি নিবিড় হ'য়ে ওঠা—যাকে ইংরাজিতে বলে intensity of feeling. সংযমের এই পরিণতিটি যেমন সুন্দর তেম্‌নি 'সৃজনশীল—creative—ও বলদা। প্রফুল্লচন্দ্র দেহে ক্ষীণ হ'লেও এই আন্তর শক্তিতে আশ্চর্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন বহুদিনের সংযম ও ব্রহ্মচর্যের তপস্যায়। ফলে তিনি যাই ধরতেন একবার—আঁকড়ে ধরতেন তাঁর চিরতরুণ উৎসাহের প্রতি তন্তু দিয়ে। কাউকে প্রশংসা করতে হবে—তো ওঠো তার গুণকীর্তনে উজিয়ে, বলো—"শেক্সপীয়রের বই শেলফে থাকলে আর বইয়েই কী দরকার ?" "চরকায় সুতো কাটলে নিরন্ন অন্ন পাবে"—মহাত্মা গান্ধি বলছেন—অতএব হও তাঁর মন্ত্রশিষ্য, সব ছেড়ে অষ্ট প্রহর কাটো চতুর্বর্গদাত্রী চরকার সুতো। চা খাওয়া খারাপ—তো চালাও তার বিরুদ্ধে অশ্রান্ত অভিযান—প্রবন্ধে, ভাষণে, আলাপে, টিটকিরিতে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ—তো বাঙালিকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে উস্কে দাও ব্যবসার দিকে, বলো মাড়োয়ারি হ'তে। আচার-নিষ্ঠতা, ছুঁৎমার্গ মন্দ—তো কলেজে পড়াবার সময়ও রামপক্ষীর হাড়ের পাশে তার ভস্ম রেখে বোঝাতে শুরু করো এ-ভস্ম যখন অ-পক্ষী তখন মুখে দিতে দোষ কি ? সায়েন্স পড়া ভালো—তো কোনো ছাত্র রসায়নে তৃতীয় বার্ষিকী পরীক্ষায় প্রথম হ'লে দোলো তার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে। অনুভবশক্তির নিবিড়তা-সাধনে সিদ্ধিলাভ না করলে আবেগের কি প্রেমের এ-পরিণতি হওয়া অসম্ভব।

এইজন্যেই তো তাঁকে দেখে আরো অবাক লাগত তাঁর চরিত্রের দুটি স্ববিরোধী প্রবণতা দেখে : একদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রবীণ জ্ঞানী—যা ধরেন মোক্ষম ধরেন—বজ্র-আঁটুনি। অন্যদিকে ভোলা মহেশ্বর, দিলখোলা, অনাসক্ত—সত্যিই ষাটবছরের শিশু! মনে পড়ে ১৯২০ না ২১ সালে স্যর-এর সঙ্গে লণ্ডনে হলাণ্ড রোডে একটি বাসায় এক সঙ্গে থাকা। সু-নামে তাঁর একটি ছাত্র সেখানে তাঁর তদারক করত। সে প্রায়ই স্যর-এর "নানা কাণ্ডকারখানা"-র কথা বলতে বলতে হেসে কুটি কুটি হ'ত। এখানে কেবল একটি কাণ্ডের কথা বলি।

সু বলল : "জানেন দিলীপবাবু, আজ সকালে এক টুপির দোকানে টুপি কিনতে গিয়ে স্যর-এর সে কী কাণ্ড! স্যর তো জানেনই প্রায়ই ছাতাটি বগলে চেপে পথ চলেন, তাই টুপির দোকানেও উনিও চলেছেন বগলদাবায় ছাতাও চলেছে parallel to the floor! কাজেই আশ্চর্য কি যে ওঁর ছাতার সামনের বাঁটের দিকটার ধাক্কায় হঠাৎ দমাশ্‌ শব্দে এক গঙ্গা টুপি মাটিতে লুটোবে ছত্রাকার হ'য়ে ? ওরা 'হাঁ হাঁ' ক'রে ছুটে আসতেই স্যর চম্‌কে লাফিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াতেই

এবার ছাতার তলার দিক্‌কার গোড়ালির ধাক্কায় আর্ একটি আলনা তুমুল শব্দে ছড়িয়ে পড়ল। মেজেটা হ'য়ে দাঁড়ালো একেবারে টুপির সমুদ্র! হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড!—দোকানীরা, খদ্দেররা, রাস্তার পথিকেরা—সবাই এল ছুটে। আমি তাদের ঠাণ্ডা করি ব'লে—স্যর পি সি রায় এফ আর এস ইত্যাদি ব'লে। একটার জায়গায় দুটি টুপি কিনতে হ'ল, একটি আমার জন্যে—আমার দরকার না থাকলেও। তখন একটি স্থূলকায়া দিদিমা বললেন গভীর স্নেহে: "Funny old child! why does he carry his umbrella like that—inside a shop?" থেমে সু আর্দ্রকণ্ঠে বলে: "সত্যি, দিলীপবাবু, স্যর-এর সে-ত্রস্ত মুখচোখ যদি দেখতেন—মায়া হ'ত আপনারও, মনে পড়ত মা যশোদার ভয়ে কৃষ্ণের সেই ভয়ে কাঁপা—চোখের জলে সেই বুক ভেসে যাওয়া আর কাজলের কালিতে সারা মুখে কালো ছাপ—আপনিই সেদিন স্যর-এর কাছে বর্ণনা করেছিলেন না?"

ভাগবতের শ্লোকটি শুনে স্যর সেদিন লণ্ডনে চায়ের টেবিলে খুব হেসেছিলেন হাততালি দিয়ে, তাই উদ্ধৃত করলামই বা:

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জন-সম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি-ভীরপি যদ্‌বিভেতি॥

দশ পনের বৎসর পরে আমি এর অনুবাদ করেছিলাম "ভাগবতী কথা"-য়:

হৃদয়ে জাগে নাথ আমার—তব সেই জননীভয়ে দুটি ভীত নয়ন,
করিয়া অপরাধ লভিবে আজ কোন্ শাস্তি ভাবি' ম্লান নত আনন!
কী ছবি অপরূপ! অশ্রুসাথে কালো কাজল মিশি' ঝরে! ভয়ও যারে
নিয়ত করে ভয়—তার ভয়ের ভান! এ-লীলা ভাবিতেও মন যে হারে!

মেম দিদিমার "funny old child" কথাটি প্রায়ই মনে পড়ত স্যর-এর নানা কাণ্ড দেখে। আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, সেখানে ফি রবিবারে কয়েকজন ধার্মিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী গিয়ে বসেন, উপাসনা ও গান হয়। একবার কি একটা উৎসবে লণ্ডনের ক্রমওয়েল ছাত্রাবাসের তদানীন্তন পরিদর্শক তথা হাই কমিশনর এন সি সেন মহোদয় আমাকে নিমন্ত্রণ করেন গান গাইতে। আমি

তখন স্যর-এর সঙ্গে হলাণ্ড রোডের বাসায় ঘরকন্না করি। আমার উপর ভার ছিল তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার। (স্যর পারৎপক্ষে কখনো ট্যাক্সি ডাকতেন না, কেউ ডাকতেও সাহস করত না, কারণ তিনি প্রায়ই আমাদের লেকচার দিতেন—লণ্ডনে এসে বিলাসে "বাপের টাকা" না ওড়াতে। বলতেন প্রায়ই : "A penny saved is a penny gained, কি বলো হে? উঁম্?") অগত্যা আমি তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গুটি গুটি একটি ফুটপাতে দাঁড়িয়েছি। একটি বাস সেখানে এসে থামতেই আমি ঈষৎ উচ্চস্বরে ব'লে উঠেছি : "সাবধান স্যর!" আর যাবে কোথা? স্যর আমাকে চাপাস্বরে ভর্ৎসনা করলেন : "শ্-শ্! এদেশে অত জোরে কথা বলে?" আমি সে সময়ে সত্যিই একটু জোরে কথা বলতাম ব'লে সুভাষও আমাকে প্রায়ই টুকত, তাই ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে স্যর-কে নিয়ে বাস-এ উঠে ব'সেছি সবেমাত্র—এমন সময়ে এক ইংরাজ মহিলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে টুপি খুলে তাঁকে আমার জায়গা ছেড়ে দিতেই স্যর শিশুর মতনই আহ্লাদে আটখানা, বললেন তারস্বরে : "That's right my boy, chivalry, chivalry!" সঙ্গে সঙ্গে বাস্ শুদ্ধু লোকের চোখ পড়ল তাঁর দিকে—দু' একটি মহিলা তো মুখে রুমাল দিয়ে হেসে কুটি কুটি। কিন্তু স্যর-এর ভ্রূক্ষেপও নেই—সবাই চেয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তারস্বরে সমানেই গল্প ক'রে চললেন—তিনি ব'সে আর আমি দাঁড়িয়ে—বিচিত্র চিত্রটি কল্পনীয়! আজো চোখের সামনে ভাসে তাঁর সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ গলাবন্ধ কোট, খাঁজহীন ঝোলা ধূসর রঙের পেণ্টুলুন—আর মাঝে মাঝে টুপি খুলে উস্কো-খুস্কো চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক হাত চালানো। মায়া করে সত্যিই!···সে কি ভুলবার?

স্থু-র কাছে স্যর-এর আরো কয়েকটি এই জাতীয় হাস্যোদ্দীপক কীর্তিকলাপের কাহিনী শুনেছিলাম—কী ভাবে তিনি পারিসে ফরাসি বলতে বলতে অন্যমনস্ক হ'য়ে হঠাৎ ইংরেজি কথা মিশিয়ে ফেলতেন; কী ভাবে একবার সেখানে একটি বড় হোটেলের স্নানাগারে ঢুকে আর বেরুতে পারেন নি—যে-হোটেলে বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে একটি ডিনার দিয়ে সম্মান দেখাতে জুটেছিল। ডিনারের টেবিলে সবাই ব'সে, কিন্তু যার জন্যে ডিনার সেই মাননীয় অতিথিটিই অদৃশ্য! স্থু তার ক্লায়েণ্টকে জানত তো, নক্ষত্রবেগে বাথরুমের দিকে ছুটতেই শুনতে পেল তাঁর কণ্ঠ : "আঃ কী জ্বালায়ই পড়েছি—দোর বন্ধ হয় কিন্তু আর খোলে না ছাই!" "শুধু চিচিং ফাঁকটি বলেন নি স্যর"—বলত স্থু হেসে—"তবে বলতে পারতেন বৈ কি—হা-হা-হা!"

এ ধরনের কাহিনী শুনে আমরা নিজেদের মধ্যে হাসতে হাসতে সত্যি গড়িয়ে

পড়তাম। কিন্তু এমন ছাত্র কেউ ছিল না লণ্ডনে এসব কাহিনী শুনে যার মন ভিজে না উঠত এ-অসামান্য কর্ম-জ্ঞান-দানবীরের একান্ত নিঃসঙ্গতা তথা নাবালক নিঃসহায়তার কথা ভেবে। মহৎ মানুষ প্রায় সবাই নিঃসঙ্গ, নিসাথী। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে অকারণ লেখেন নি: "He who is too great must lonely live." ভাগবতে আছে শুকদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলছেন: যে-সব রূপসী রাণীদের হাবভাব কুহক কটাক্ষে স্বয়ং শিবের হাত থেকেও ধনুক খ'সে পড়ে সেই তিলোত্তমাদের সঙ্গে সহবাস ক'রেও যার মন কখনো এতটুকু চঞ্চল হয় নি এ-হেন চির-অসঙ্গ অবতারীকেও মূঢ় মানুষ নিজের ম'ত মানবধর্মী ভাবে—তিনি মানুষ সেজে মানুষের চালে চলেন ব'লে। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন না কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্টের মতন বাণীবাহ অতিমানব; ছিলেন না সক্রেটিস, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতন লোকোত্তর প্রতিভাধর; ছিলেন না নিউটন, গালিলিও, আইনষ্টাইনের মতন যুগপ্রবর্তক বৈজ্ঞানিক। কিন্তু মানুষ কী হ'য়ে ওঠে নি বা দিতে পারে নি তার বিচারে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না—সে কী হ'য়ে উঠেছে বা দিতে পেরেছে সেই নিকষেই তাকে কষতে হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শুধু শিক্ষকের, আচার্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়—সব জড়িয়ে তিনি এমন একটি আশ্চর্য আদর্শবাদীরূপে ফুটেছিলেন, এত গুণের সমাবেশে তাঁর মহান্ চরিত্র মঞ্জুল তথা মর্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছিল যে তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়—ইংরাজ কবির ভাষায়—to be loved he needs only to be seen! তাই তো তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র ভারতে একটি বরণ্যে মনীষী, প্রেমিক দানবীর তথা সংসারী সন্ন্যাসী ব'লে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁকে সন্ন্যাসী উপাধি দেওয়ার জন্যে আমাদের মামুলিপন্থী ধার্মিকেরা হয়ত আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবেন। কিন্তু সর্ববিধ বিলাসকে বিদায় দিয়ে, নির্বিচল নিষ্ঠায় স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ ক'রে, নিজের হাজার হাজার টাকা মাসিক আয়ের সাড়ে পনের আনা পরার্থে দান ক'রে, ক্ষীণ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও দিনের পর দিন "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়"—আদর্শের ডাকে যিনি আকুমার ব্রহ্মচারী থেকে হাসিমুখে নিরন্তর শ্রমস্বীকার ক'রে গেছেন শুধু অন্তরের তাগিদে—তাঁকে প্রেমিক সন্ন্যাসী উপাধি দিলে কি অতিশয়োক্তি হ'তে পারে কখনো? আমার মনে পড়ে —উত্তর-বঙ্গ-বন্যাত্রাণ সমিতিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার পরে সুভাষ তাঁর কথা বলতে বলতে কী রকম উজিয়ে উঠত। তাঁর পরার্থনিষ্ঠার দীপ্ত দৃষ্টান্তে ও সরলতায় সে সত্যি সত্যি এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে প্রায়ই বলত তাঁর নাম ক'রে: "এই-ই তো ভারতের আদর্শ: plain living and high thinking—শঙ্করাচার্যের বাণী:

'জাগর্তি কো বা ?—সদসৎবিবেকী'।" আমি শুধু আর একটু জুড়ে দেব : জ্ঞানের সঙ্গে দানের রাজযোটক তথা—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—Make of thy way a daily pilgrimage : তোমার জীবন হোক প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রাব্রত।

আমি জানি তাঁর নানা ভক্ত তাঁকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাঁর পুণ্য জীবনের স্পর্শে ধন্য হয়েছেন। প্রতি মহাজনেরই নানা গুণ নানা ভাবে নানা লোকের মন টানে—না টেনে পারে না ব'লে। আমি শুধু আমার ক্ষুদ্র সাধ্যম'ত যতটা পারি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি—আমি আমার নিজের পথচলায় কী ভাবে তাঁর কাছ থেকে পাথেয় আহরণ করেছি, তাঁর অনাবিল স্নেহাশীষ আমাকে কেন এত মুগ্ধ করেছে, তাঁর কোন্ কোন্ কীর্তি আমাকে নিত্য প্রেরণা দিয়েছে। আমার কাছে তিনি চিরদিন প্রণম্য থাকবেন আরো এইজন্যে যে, তাঁর মধ্যে আমি দেখেছিলাম একটি সনাতন ভারতীয় প্রবণতার অপরূপ বিকাশ : প্রবৃত্তির জগতে বসবাস ক'রে নিবৃত্তির পথে চলতে পারা, সবার মধ্যে থেকেও অনাসক্ত থাকা—মরমিয়াদের ভাষায় : "জৈসে জলমে কমল অলেপ"—জলের মধ্যে পদ্ম যেমন নির্লিপ্ত থাকে। কারুর কাছে কিছু না চেয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিজেকে ও নিজের যা কিছু পরার্থে এমন উজাড় ক'রে বিলিয়ে যাওয়া দুহাতে—এ-ও যে পারে সে আপনি পারে। আর সেই বলতে পারে বড় গলা ক'রে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

আপনা ভুলি' সহজ সুখে ভরুক তব হিয়া,
পথিক, তব পথের ধন পথেরে যাও দিয়া।

বলেছি, স্যর-এর সঙ্গে ভগবান্ নিয়ে কখনো আলোচনা হয় নি। ইচ্ছা যে হয় নি এমন কথা বলতে পারি না, তবে আমি জানতাম তো যে আমি ষোলো-আনা প্রতীক-পূজারী, গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবপন্থী এবং তিনি বিজ্ঞানের উপাসক তথা ব্রাহ্ম তাই ঘা খাবার ভয়ে আমার কাছে যা সব চেয়ে আদরণীয়—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্—সে-প্রসঙ্গ সাবধানেই এড়িয়ে গেছি। স্বভাবে আমি অভিমানী, স্নেহবিলাসী ও প্রশংসাপ্রিয়—তাই আমার গানে ও সঙ্গে যে তিনি আনন্দ পেতেন ও আমাকে আন্তরিক ভালোবাসতেন সেই আত্মগৌরবকে মিথ্যে তর্কাতর্কির আঁধিতে ঝাপ্সা হ'তে দিতে চাইতাম না। তবে এটুকু বলতে পারি জোর ক'রেই যে তাঁকে দেখে কোনোদিনই আমার মনে হয় নি যে এ-হেন মহাজন শূন্যবাদী নাস্তিক হ'তে পারে।

শেষ জীবনে গান্ধিজির সংস্পর্শে এসে তিনি চরকার চারণ হ'য়ে উঠেছিলেন—এ-হুজুগে প্রথমদিকে আমি সাড়া দিলেও শেষে বুঝেছিলাম যে চরকাবাদ এ-যুগে চলবে না, চলতে পারে না ব'লে। কিন্তু সে-আলোচনা এ-স্মৃতিচিত্রে অবান্তর। তাই আমি এ-স্মৃতিতর্পণের শেষে শুধু আমার একটি অনুমানের উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হব: যে, আমার মনে হ'ত বরাবরই যে গান্ধিজির শুধু সমাজসংস্কারক-রূপটিই তাঁর মন টানে নি, আস্তিকরূপটিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। একথার স্বপক্ষে কেবল একটিমাত্র প্রমাণ আমি পেশ করতে পারি: আমার মুখে তিনি খুব ভালোবাসতেন অতুলপ্রাসদের কয়েকটি ভক্তিসঙ্গীত শুনতে—বিশেষ ক'রে তাঁর একটি বাউল: "যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হ'ল রে উছল রে ভোলা"—এবং এর কয়েকটি চরণে আর্দ্রকণ্ঠে "আহা আহা" ক'রে মাথা নাড়তেন:

"যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে—তোর থাক্‌না চোখে জল রে ভোলা!
জীবনের হাটে আসি' বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক্‌ সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল রে ভোলা!
অরূপের রূপের খেলা চুপ ক'রে দেখ্‌ দুবেলা,
কাছে তোর এলে কুরূপ, মুখ ফিরিয়ে চল্‌ রে ভোলা!"

সাত

শরৎদার কথা বলতে বলতে মাঝপথে থেমে দীর্ঘ 'প্যারেন্থেসিস'-এর ভঙ্গিতে বাংলার তিনজন মনীষীর প্রসঙ্গ পেড়েছি খানিকটা ঝোঁকের মাথায়ই বলব। কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখতে পাই এতে ক'রে অবান্তরের অবতারণা হয় নি—শুধু এই-জন্যেই নয় যে নানা সভায় এঁদের একত্র রসালাপ উপভোগ করেছি, এজন্যেও বটে যে বাংলার এ-মহাপ্রাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে দুদিক দিয়ে মিল ছিল: এক, এঁরা সবাই বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন ও বাংলার নাড়ীর খবর রাখতেন,; দুই, পদে পদে কথায় লেখায় তথা হাসির মাধ্যমে গভীরের বাণীকে যথাযথ পেশ করতে জানতেন। কিম্বা বলা যেতে পারে—তরলের মাধ্যমে কঠিনের আমদানি করতে পারতেন,

পরিহাসের মধ্যে দিয়ে মানুষকে হাসিয়ে তুলেও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়ে দিতে পারতেন। এ-ছন্দ আমার কাছে চিরদিনই প্রিয়। কিন্তু এখানে কেউ কেউ আমাকে ভুল বুঝেছেন তাই একটু ভাষ্য করি।

হাসিতামাশার পক্ষপাতী হ'তে গিয়ে যদি আমি এমন কথা বলি যে জীবনে গাম্ভীর্যের মূল্য কম তাহ'লে সেটাই হবে হাসির কথা। প্রশান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে যে (গীতার ভাষায়) "আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রের" উদার সুষমা ও সমাহিতি বিরাজ করে এটুকুও যারা বোঝে না, যারা কেবল হাল্কামিকেই সরসতার চূড়ান্ত মনে ক'রে থাকে তাদেরি তো নাম ছেপলা। ভর্তৃহরি কালিদাস প্রমুখ কবিরা মধুর রসিকতার মধ্যে দিয়ে গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন ব'লেই কিছু বলা চলে না যে তাঁদের সবরকম ভাবকেই হাল্‌কা সুরে ফুটিয়ে তুলতে না-পারাটা তাঁদের কৃতিত্বের অভাবই সূচনা করে। প্রকৃতির মধ্যে যেমন ফুলের হাসি, পাতার মর্মর, পাখির কাকলি আছে, তেম্‌নি আছে পর্বতের মহিমা, সমুদ্রের ঔদার্য, মেঘের ডমরুধ্বনি। গাম্ভীর্য ও হাসি, মন্ত্রসাম ও পদলালিত্য, সূক্ষ্ম লাবণ্য ও উদার ব্যাপ্তির মিছিল মানবজীবনে চ'লে এসেছে আবহমানকাল। একটা অন্যটাকে সম্পূর্ণতা দেয়, নিটোল করে—এ কে না মানবে? কিন্তু এ সব মেনেও বলতেই হবে যে আমাদের জীবনের নানা সংকটমরু আমাদের কাছে সুসহ হয় প্রাণের আনন্দধারাসম্পাতে। তাই নিছক গাম্ভীর্যকে নিয়ে যারা নিরন্তর ঘর করে তাদের পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না বললে অত্যুক্তি হবে না। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। বলি।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতিতে গম্ভীরাত্মা ছিলেন একথা মানতেই হবে। তাঁর কাব্য নাটক নিবন্ধাদিতে হাল্কা রসের দৃষ্টান্ত নেই বললেই হয়। কিন্তু তা ব'লে তিনি হাসতে জানতেন না একথা বললে ভুল হবে। আমিই হয়ত সবপ্রথম তাঁর কাছে দরবার করি "একটু হাসুন, গুরুদেব লক্ষ্মীটি! আপনার আর্ষ বাণী প'ড়ে বহু মানসসম্পদ পেলেও প্রাণেরও কিছু খোরাক চাইতো। যখন আপনাকে নীরবে দর্শন করতে যাই তখনও আপনার প্রশান্ত জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখে মুগ্ধ হলেও চাই—আপনি পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীর মতন একটু রসিকতাকেও আমল দিন। দোহাই ধর্ম, একটিব্যার—একগাল হাসতে যদি নাও পারেন—অন্ততঃ ফিক্‌ ক'রে হাসবেন—যখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করব।"

অতঃপর তিনি আমাকে দেখলে যথাবিধি সহাস্যেই বরণ করতেন। একবার আমার মনের এক বিষম সংকটে আমার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা খানেক আলাপ ক'রে

উচ্ছল হেসে আমার মনের ভার লাঘব করেছিলেন। তারপর চিঠির পর চিঠিতে রসিকতা করতেন দিনের পর দিন। সে-সব দৃষ্টান্ত আমার "Sri Aurobindo Came To Me" বইটিতে লিখেছি ব'লে এখানে তাদের অবতারণা বাহুল্য হবে। এখানে শুধু বলি যে, যদি তিনি আমাকে ধমকাতেন এই বলে যে হাল্কামি ক'রে তিনি তাঁর প্রগাঢ় গাম্ভীর্যরসকে তরল করতে পারবেন না তাহ'লে তাঁকে আমি বরণ করতে পারতাম না পরম বন্ধু ব'লে। তবু একটা উদাহরণ দেই তাঁর রসিকতার।

একবার আমার এক বন্ধু পণ্ডিচেরিতে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে আমার যত প্রতিভাই থাকুক না কেন গুরুদেবকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবার সাহস আমার নেই। আমি মরিয়া হয়ে বলি "আচ্ছা"। কিন্তু বলার পরে ভয় হ'ল। কখনো একটা ডিমও ফুটিয়ে খাই নি—গুরুদেবকে তো অখাদ্য রেঁধে পাঠানো চলে না। শেষে করলাম কি, অমিয়া নামে এক রন্ধননিপুণা সাধিকার শরণাপন্ন হলাম। তিনি যেভাবে বললেন—কোনো সাহায্য না ক'রে—সেই অনুসারে রাঁধলাম একটি আলু কপি ও মটরশুঁটির তরকারি। গুরুদেবকে সব জানিয়ে ব্যঞ্জনটি পাঠিয়ে দিলাম সলজ্জে লিখে যে, আমি নিজে হাতেই কুটনো কুটে বাটনা বেটে রেঁধেছি বটে কেবল অমিয়া আমাকে ফিসফিস করে নির্দেশ দিয়েছেন (whispering directions)।

গুরুদেব তরকারিটি খেয়ে লিখলেন : "Your cooking is remarkable and wonderful If you had not disclosed the secret about Amiya's 'whispers' I would have been inclined to claim it as a yougic miracle. (তোমার রান্না অদ্ভুত চমৎকার। যদি অমিয়ার ফিসফিসানির কথা না বলতে তাহ'লে আমি বলতামই বলতাম যে এ-অঘটন ঘটিয়েছে আমার যোগশক্তি।) কিন্তু এবার হারানো খেই ধরে ফিরে আসি শরৎদার প্রসঙ্গে।

সবাই জানেন সাহিত্যে তিনি কী অপরূপ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন—তাঁর নানা গল্পের ছত্রে ছত্রে পরিচয় পাওয়া যায় হাসিকে তিনি কী ভালোই বাসতেন। মনে পড়ে আজও তাঁর হাসি : "মণ্টু, আমার পল্লীসমাজে ধর্মদাস কেমন বলেছিল বলো তো : 'বাবা রমেশ, বললে বিশ্বেস করবে না—ক্ষীরমোহন আমি বড়ই ভালোবাসি'।" তাঁর শ্রীকান্ত, নিষ্কৃতি, রামের সুমতি, দত্তা, বৈকুণ্ঠের উইল আরো কত গল্পেই কারুণ্যের ও মহত্ত্বের প্রশান্ত প্রবাহের তলে তলে ব'য়ে চলেছে একটি স্নিগ্ধ হাসির রসধারা। কিন্তু এবার বলি—কথালাপেও তিনি কী ভাবে তাঁর অপরূপ রসিকতায় আমাদের মনোহরণ করতেন।

বোধ হয় ১৯২৪ কি ২৫ সালে একবার শিবপুরে গিয়ে শরৎদাকে ধরলাম—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেয়ালী আবদুল করিম আমাদের থিয়েটার রোডে গান গাইবেন। আসতেই হ'বে আপনাকে। শুনবেন কী অপূর্ব গান!"

শরৎদা: অপূর্ব? হবে। কিন্তু হিন্দি যে।

আমি: বা রে! ওস্তাদে কি বাংলা গাইবে!

শরৎদা: তাই তো মণ্টু!...যেতে পারি...কেবল যদি একটু ভরসা দাও।

আমি: ভরসা? কী?

শরৎদা: তিনি থামেন তো? *

আমরা হেসেই কুটি কুটি। শরৎদা আমাদের হাসি থামলে বললেন: "তোমরা হাসলে কিন্তু আমি কেঁদেছিলাম—জানো কি?"

আমি (হেসে): কেঁদেছিলেন?

শরৎদা: কান্নার বাড়া হে। বলি শোনো। একবার গিয়েছি তোমার ঐ আবদুল করিমের মতনই এক ওস্তাদের গান শুনতে। সে তো আর থামে না—কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তানের চরকিবাজি ক'রে শোমে ফিরে এসে হোঁচট খেয়ে বলে: সৈঁয়া! তু কাঁহা গৈঁয়া?...আরে মেরী সৈঁয়া! তু কাঁহা গৈঁয়া রে?...শেষে আমি আর থাকতে পারলাম না, ফরশির নল মুখ থেকে ফেলে দিয়ে গর্জে উঠলাম: 'আরে, সৈঁয়া তোর কাশী মিত্তিরের ঘাটে গৈঁয়া। তারপরে কী হ'ল বল্ না?'

আর একবার গিয়েছি তাঁর শামতাবেড়ের বাড়িতে রূপনারায়ণের ধারে। কথায় কথায় জাতিভেদ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। শরৎদা বললেন: "কথা যখন উঠলই—বলি শোনো। একদিন এক কায়স্থ আর এক বৈদ্য এসে আমাকে সালিশি মানল। কী ব্যাপার? না, কায়স্থ ঠাকুর বলেন: 'আমরা পৈতে নেব, তোরা বেটারা অসিদ্ধ বদ্যি, পৈতে নিস্ কোন্ মুখে?' বৈদ্য মহাপ্রভু পাল্টা মুখ ভেংচে বলেন: মরি মরি! অখাদ্য কায়েতের আবার পৈতে! তেলাপোকাও পাখি!' এইভাবে তো চলল তুমুল ঝগড়া: কে বড়—কায়স্থ না বৈদ্য? কে পৈতে নেবার অধিকারী? শেষে আমি আর সইতে না পেরে বললাম হুহুঙ্কারে: 'এ বিংশ শতাব্দীতেও জাতিভেদ! লজ্জা করে না তোদের? যা বাড়ি যা—ব্রাহ্মণ মাথার উপরে, আর সব সমান। আর কথাটি না—যা!'

* রবীন্দ্রনাথ পরে একদিন এ-রসিকতাটি উদ্ধৃত ক'রে একগাল হেসে বলেছিলেন: "শরৎ মোক্ষম রসবাণ হেনেছে হে, যাকে বলে ক্লাসিক!"

সুভাষ আমাকে বলেছিল যে ও জেলে শরৎদার বই প'ড়েই তাঁর মহাভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর শরৎদার সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা হওয়ার ফলে সুভাষের শরৎ-প্রীতি আরো গভীর হয়। সে যে কী হাসি হাসতে পারত সে কথা আগে বলেছি। সচরাচর সে ছিল গম্ভীরই বলব, কিন্তু যেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠত অমনি যেন এক মুহূর্তে তার ভোল বদ্‌লে যেত : মনে হ'ত ঠিক যেন একটি ছোট শিশু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমাদের থিয়েটার রোডে আমি মাঝে মাঝে সুভাষকে ও শরৎদাকে নিমন্ত্রণ করে গান শুনিয়ে খাওয়াতাম চর্বচুষ্য লেহ্যপেয়। শরৎদা বলতেন হেসে : "এই তো চাই মণ্টু! ভজন ভালো বই কি, কিন্তু ভোজনেই হয় শেষ রক্ষা!" সুভাষের অম্‌নি একগাল হাসি। শরৎদার দিকে তার সতৃষ্ণ নেত্রে তাকিয়ে থাকা আজও মনে পড়ে : ভাবটা—"বলুন মজার কথা যা মনে আসে, আমরা মুখিয়ে আছি রসগ্রাহী হ'য়ে।"

একদা নিমন্ত্রণ করেছি সুভাষ, শরৎদা, কিরণশঙ্কর রায়, তুলসী গোস্বামী প্রভৃতিকে। সুভাষ তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছে—কোন্ সনে ঠিক মনে পড়ছে না। সুভাষকে কৃশকায় মনে হ'ল—দুর্বল। বললাম : "সুভাষ এবার তোমাকে একটু বিশ্রাম নিতেই হবে, নৈলে ছাড়ছি না। আমি বলি কি, চলো নৌকা-বিহারে—সুন্দরবনের গঙ্গায়। সব বন্দোবস্তের ভার আমার।"

কিরণশঙ্কর হেসে বললেন : "এইই তো বন্ধুর কাজ দিলীপ বাবু! সুভাষের একটু বিশ্রাম নেওয়াই চাই—আর আপনি জোর করে ওকে টেনে নিয়ে না গেলে —আপনার পিতৃদেবের ভাষায় 'খেটে খেটে খেটে ওর শরীর হবে মেটে'।"

সুভাষ হেসে বলল : "তোমার সঙ্গে বিশ্রাম নিতে যেতে কি আর আমার অসাধ দিলীপ, শুধু বিশ্রাম না—নৌকাবিহারে রোজ তোমার গান শোনা,—লোভ না হয় কার? কিন্তু হ'লে হবে কি বলো—কংগ্রেসের কাজে কর্মীর আজ একান্ত অভাব, অথচ কাজ অগুন্তি।" ব'লেই হেসে শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে : "তবে যদি শরৎবাবু বি পি সি সি-র * প্রেসিডেণ্ট হ'তে রাজি হন তবে আমি তাঁর হাতে সব কাজ তুলে দিয়ে দুদিন জিরুতে পারি।"

শরৎদা (তৎক্ষণাৎ) : সুভাষ, আমি দেখতে বোকা বটে, কিন্তু আসলে বোকা নই মোটেই।

* Bengal Provincial Congress Committee.

সুভাষ (সচকিত বিস্ময়ে) : কি রকম ?

শরৎদা : মানে, বি পি সি সি-র প্রেসিডেণ্টের গদি আমার মাথায় থাকুক। জেলে যাওয়া আমার পোষাবে না।

সুভাষ (হেসে) : আহা জেলে যেতে হবে—কে বলছে?

শরৎদা : মন, আর কে—যে বলে দুই আর দুয়ে চার হবেই হবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সুভাষ (হো হো করে হেসে) : মা ভৈঃ, শরৎবাবু, আপনাকে ওরা কিছু বলবে না।

শরৎদা : আর যদি বলে—তখন ? ম্যাও ধরবে কে শুনি ?

সুভাষ : সে কি ?

শরৎদা : আর সে কি। কী হবে "শেষের সে-দিনে"—আমি বুঝি জানি না ভেবেছ ?—ওরা আসবে সদলবলে—হাতে পরাবে বালা—ওদের বন্ধ গাড়িতে টেনে তুলে সরাসর পুলিপোলাও পাঠাবে হরিণবাড়ি—আমি হাপুশ নয়নে কাঁদতে থাকব—আর ঠিক সেই সময়ে তোমরা সদলবলে এসে মালা ছুঁড়ে জেলের দিকে আমাকে তোফা ঠেলে দিয়ে হেঁকে বলবে : 'বন্দেমাতরম্' ! ব্যস্। তারপরে আমার অজ্ঞাতবাসে পাঁচটি বৎসর। (একটু থেমে) তার উপর শুনি সেখানে আফিং দেয় না—না সুভাষ তোমাদের বি পি সি সি-র ক্ষুরে দণ্ডবৎ, ওতে আমি নেই।

ঘরভরা লোকের কলহাস্যে কক্ষ মুখর হ'য়ে উঠল।

খানিকবাদে কথায় কথায় শরৎদা ফের বললেন : অ সুভাষ ! তোমাদের চরকা প্রসঙ্গে রবিবাবুর সঙ্গে তর্ক করে যে মহাপাপ করেছিলাম—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে। হবে না ? গুরুর সঙ্গে বিতণ্ডা—এত বড় কুকর্ম—পার পাব কোত্থেকে ?

সুভাষ (হেসে) : সে কি ?

শরৎদা : আর সে কি ! খদ্দর হে, খদ্দর। বাড়িতে চাকরাণী টেঁকে না আর। তারা বলে ধুতি কাচতে বালতিতে ডোবাতে পারে, কিন্তু আর ওঠাতে পারে না—আহা, অবলা তো, পারবে কোত্থেকে ? (সুভাষের অট্টহাস্যের মাঝে) না এরও পরে আছে হে ! খদ্দরের ধুতি কোমরে থাকতে চায় না। তার উপরে ঘষ্টে ঘষ্টে কোমরে 'গান্ধি-বিদ্ধ' হ'য়ে গেল দাদা !"

আর একদিনের কথা মনে পড়ে স্পষ্ট। প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি শরৎদাকে সম্বর্ধনা করতে ধুম লাগিয়েছে। আমিও তাদের মধ্যে একজন— গান গাইতে, অভিনন্দন পড়তে, কিসে নয়?

অভিনন্দন পড়া শেষ হ'লে অধ্যাপক নৃপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: "এবার আপনার পালা শরৎবাবু, বলুন তো কেমন লাগল অভিনন্দন?"

শরৎদা (উঠে): অভিভাষণ? হ্যাঁ—তা—ভালোই লাগল। অবশ্য অনেক বিশেষণই অত্যুক্তি—লজ্জা ক'রে বৈ কি, (মৃদু হাততালি) কিন্তু তবু— বেশ খাসাই লাগে—মানতে হবে।

* * *

আর একদিনের কথা—গিয়েছি কৃষ্ণনগরে—সেখানে এক সাহিত্যপরিষৎ শাখাসভার সভাসদেরা মহোৎসব করবেন শরৎদাকে নিয়ে। নানা সভ্য সভায় করলেন তাঁর গুণকীর্তন। আমিও পড়লাম একটি প্রবন্ধ "শরৎ সাহিত্যে আদর্শবাদ।" তারপর গাইলাম শরৎদার উপরে একটি গান নিরুপমা দেবীর রচিত: "বাহিরের নও তুমি আমাদেরি, আমাদেরি একজন।"

সভা শেষ হ'লে ওখানে এক বিশিষ্ট উকিল শ্রীললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিরাট ভোজ। শরৎবাবুকে বসানো হ'ল মাঝখানে মখমলের আসনে—পাশেই আমি, যেহেতু শরৎ সম্বর্ধনায় আমি বরাবরই থাকতাম প্রধান উদ্যোক্তাদের দলে।

ললিতবাবু: দিলীপ, তোমার গান কী যে চমৎকার—

একজন অধ্যাপক: সত্যি। আর আপনার অভিনন্দনটিও—

আর একজন আর একটি মন্তব্য করলেন আমার আবৃত্তি সম্বন্ধে।

শরৎদা (হঠাৎ): থামোঃ। মণ্টুর গান চমৎকার, আবৃত্তি চমৎকার, উচ্ছ্বাস চমৎকার—সবই চমৎকার হ'তে পারে—কিন্তু যেটি সবচেয়ে চমৎকার— তোমরা কেউ জানো না—জানি এক আমি। (সবাই আশ্চর্য হ'য়ে তাঁর দিকে তাকাতে) ওর সব চেয়ে চমৎকার হ'ল ওর পিলে—সাধু ভাষায় লিভার হে, লিভার! বৃন্দাবনে, দিল্লিতে, আগ্রাতে ওর সঙ্গে আমি ছিলাম একত্রে। আমি যাই খাই হয় অম্বল, ও যা-ই খায় হয় সম্বল। ইয়া ইয়া বেলুনের মত পরোটা, ইঁটের মত মালাই, পাহাড় প্রমাণ পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, শিক্‌কাবাব—কিছু কি ও ফেলল কোথাও?—আর কিছুতে কি ওর বদহজম হ'ল? তাই বলি—ওর সবচেয়ে বড় সম্পদ ওর গান নয়, লেখা নয়, আবৃত্তি নয়—ওর পিলে।

দিল্লীর কংগ্রেসে সুভাষের পাল্লায় পড়ে দেশোদ্ধার করতে আমি গেছি রুখে উঠে শুধু ডেলিগেট হ'য়ে—তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়িতে। জীবনে সেই প্রথম তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ। উঃ সে কী কাণ্ড! রাতে বেঞ্চির উপর জানালা দিয়ে পা বার করে সেই শয়ন ত্রিভঙ্গিম ঠামে—সে কি কোন দিন ভুলব?

সকালবেলা সারা গায়ে ব্যথা। শরৎদা স্টেশনে সুভাষকে এগিয়ে নিতে এসেছেন। আমাকে দেখেই বললেন: এ কী! তুমি—মণ্টুলাল!!

আমি (ম্লান হেসে): সুভাষ ছাড়ল না, করি কী বলুন?

শরৎদা: ওর পাল্লায় পড়লে তুমিও শেষে? কথা শোনো বাপু, ফিরতি ট্রেনে আজই ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো। তোমাকে বলছি মণ্টু, মামার বাড়ি হরিণবাড়ির চেয়ে ঢের ভালো।

সেদিন বিকেলে গেলাম এক দারুণ কুয়ো দেখতে। সেখানে একজন পাণ্ডা আশি ফিট গভীর কুয়োয় ঝাঁপ দেয় এক টাকা দিলে। সুভাষ এক টাকা দিতে সে ঝাঁপ দিল। রোমহর্ষক যাকে বলে! সত্যিই গা শিরশির করে উঠল আতঙ্কে।

কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই লোকটি এক দড়ি বেয়ে উঠে এসে আমাকে বলল যে একটি টাকা দিলে সে আবার ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, না—ঝাঁপ দেওয়া দেখেছি—ভয় করে।

সে কিরণশঙ্করকে গিয়ে ধরল। তিনিও না ক'রে দিলেন: "দেখেছি তো একবার।"

শরৎবাবু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে তার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিলেন: "আমি ফের দেখব—ঝাঁপ দাও।"

সে ঝাঁপ দিল। সুভাষ সবিস্ময়ে শরৎদার দিকে তাকাতেই শরৎদা বললেন: "কী?"

সুভাষ: ফের টাকা দিলেন কেন? ও ঝাঁপ দিল এই তো খানিক আগে দেখলেন। তবে?

শরৎদা (হেসে): কে জানে—যদি বেটক্করে প'ড়ে ডুবেটুবে যায় চোট লেগে—সংসারে একটা পাণ্ডা তো কমবে! সে-লাভের পাশে একটাকা লোকসান কী আর লোকসান?

সুভাষের ফের সেই হেসে গড়িয়ে পড়া—ছেলেমানুষের মত!

কী দিনই গেছে—একদিকে সুভাষ, অন্যদিকে শরৎদা।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। আমার মেজমামা খগেন্দ্রনাথ আমার গানের নানা তালফের এত ভালোবাসতেন যে তিনি আমার সঙ্গতকার শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে তবলায় তালিম নেয়া স্থরু করেন। বিশ্বনাথবাবুকে আমরা সবাই পটলবাবু বলে ডাকতাম। শরৎদা তাঁর তবলানৈপুণ্য খুব উপভোগ করতেন, বলতেন: "পটলবাবু বোল পরং তুলেছেন চমৎকার, কেবল দেখবেন ভুলেও নিজের নামটি যেন তুলবেন না, খুব সাবধান!" পটলবাবু খুব হাসতেন তাঁর নানা রসিকতায়।

একবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এক বন্ধুর বাড়িতে আমার গান হয়। মেজমামা, পটলবাবু ও শরৎদাকে নিয়ে আমি সানন্দেই বসলাম্ জাজিমের উপর। শরৎদাকে গান শোনাব, তার উপর আমার প্রিয় পিতৃকল্প মাতুল সঙ্গে—দুজনেই রসিক—আনন্দের দোললীলা।

মেজমামা তাঁর বাঁয়া তবলাটি নতুন কিনেছেন—খুব দামী যন্ত্র। পটলবাবু তো আহ্লাদে আটখানা। আমি ধরেছি সকলের অনুরোধে গিরিশ ঘোষের বিখ্যাত গান—স্বরেন মামার কাছে শেখা:

রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো
দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দেব মাথায় দুটো...ইত্যাদি

পটলবাবু উজিয়ে উঠলেন—বোল পড়নের ফুলঝুরি শুধু নয়—বাঁয়ার উপর সে কী প্রচণ্ড চাঁটি! ঘর সর্গরম হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে।

গান থামতে শরৎদা হঠাৎ বললেন: "মণ্টু! কী নিষ্ঠুর তুমি। তোমার এমন সদাশিব মামার এ-হাল করতে হয়?" সবাই হাসিমুখে তাঁর দুষ্টুমি ভরা চোখের দিকে তাকালাম। মেজমামা বললেন: "সদাশিব মামাটি কি রুদ্রমূর্তি ধরেছিল নাকি?"

শরৎদা: "কিছুই আমার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যায় না ভায়া। তোমার সবে কেনা তবলা—পটলবাবু প্রাণের মায়া ছেড়ে বাঁয়ার উপর দুর্দান্ত চাঁটি দিচ্ছিলেন ব'লে সবাই তাকেই দেখল—কেবল একা আমি দেখলাম তোমার ফ্যাকাসে মুখ: এই বুঝি নতুন বাঁয়ার বাঁয়ালীলা সাঙ্গ হ'ল বা বলে! (হেসে আমার দিকে চেয়ে) তুমি তো চেয়ে দেখনি মণ্টু, কিন্তু আমি দেখেছিলাম পটলবাবুর প্রতি প্রচণ্ড চাঁটি পড়ছিল তবলার উপর তো নয়, তকুর পাঁজরার উপর—হা হা হা!"

কিন্তু যারই আরম্ভ আছে তারই শেষ আছে। গীতার বাক্য—কাটবার জো নাই। তাই এবার শরৎ স্মৃতির সমাপ্তি টানবার সময় হ'ল। শেষ করি শেষ অধ্যায়—

আমাদের শেষ সাক্ষাৎ-এর বর্ণনায়। এ-শেষ আলাপের বর্ণনা আমি শরৎদার তর্পণে লিখেছিলাম আমার "প্রণাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে—আমার "আবার ভ্রাম্যমাণে"। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। তাই তা থেকে উদ্ধৃতি করেই ইতিপাঠ করি :

"দেখা হ'ল কলকাতার বাড়িতে—অশ্বিনী দত্ত রোডে আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে। সারাদিন গান বাজনার পরে শরৎদার ওখানে পৌঁছাতে রাত হ'য়ে গেল। তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ সুরু হ'লে আর ইতি করতেও মন রাজি হয় না। দেখতে দেখতে রাত এগারটা বেজে গেল। কত কথাই যে হ'ল। আজ দুঃখ হয়—লিখে রাখিনি ব'লে। সঙ্গে ছিল আমার জ্যেঠতুতো ভাই শচীন।

"কথাবার্তার শেষে শরৎদা বললেন : 'তুমি আর কতদিন কলকাতায় থাকবে?'

"'গুরুদেবের জন্মদিনের কয়েকদিন আগেই মণ্টুদা পণ্ডিচেরি আশ্রমে ফিরবে।' শচীন বলল : পনরই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। সেই দিনে তিনি দর্শন দেন জানেন তো? তাই মণ্টুদা এগারই বারই নাগাদ রওনা হবে ভাবছে।

"শরৎদা একটু চুপ করে থেকে বললেন : 'তাহ'লে তো আর বেশি দিন নেই।' বলে একটু গুড়গুড়িতে টান দিয়েই 'তোমার সঙ্গে এবার কিছুই কথা হ'ল না মণ্টু। পরে আর হবে কি না তাও জানিনে। কিন্তু তোমাকে আর থাকতেও তো বলতে পারি নে।—তোমার গুরুদেবের জন্মদিনে তুমি অন্য কোথাও কাটাবেই বা কী ক'রে?'

"একটি ছোট্ট মন্তব্য মাত্র, কিন্তু মনের মধ্যে যেন বান ডেকে যায়। বললাম জোর ক'রে হেসেই : 'কিন্তু কলকাতায় তো প্রায় সবাই বলে—কী হবে গুরুবাদে—সেকেলিয়ানা!'

"শরৎদা বললেন : 'শোন মণ্টু! আমি গুরুবাদ, মন্ত্রতন্ত্র, যোগযাগ, জপতপ কিছুই বুঝিনে। কিন্তু এটুকু বুঝি ও মানি যে পাওয়ার মতন কিছুই পাওয়া যায় না প্রণাম করতে না শিখলে।'

"একটা উর্দু গজলের ধুয়ো গুনগুনিয়ে ওঠে :

তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়
মরণকে জীবন দেব না—দেব তোমার পায়।

ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল। প্রণাম করে বিদায় নিলাম।"

আট

ভেবেছিলাম শরৎদার প্রসঙ্গ সারা ক'রে তবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ শুরু করব। কিন্তু "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়:" নীতি মেনে চলতে গিয়ে ইতিমধ্যেই শরৎ-অধ্যায়েই রবীন্দ্রনাথ উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন নানা স্থানে। তাই এ অধ্যায়ে তাঁকে আরো একটু টেনে আনি—দো-মিশেলি ঢঙে—আরো এই জন্যে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কৈশোরে আমার প্রথম দেখা হয় শরৎদারই ঘটকালিতে। কী ভাবে, বলতে গেলে এগিয়ে যাবার আগে ফের একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

আমার 'বাল্যস্মৃতি' যদি পড়ে থাকেন তা'হলে দেখতে পাবেন—পিতৃদেবের কাছ থেকে আমি একটি মস্ত দীক্ষা পাই আমার শৈশবেই: যে, পুরুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ হ'ল পৌরুষ, নারীর কমনীয়তা. শিশুর সরলতা। তাছাড়া পিতৃদেবকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ভক্ত তীব্র গালিগালাজ করার ফলে তাঁর সম্বন্ধে আমার এই ধরনের একটা ধারণা জন্মে যায় যে এ-নিন্দুকদের তিনিই উস্কে দিয়েছিলেন। এ-ভুল ধারনাকে ভুল ব'লে জানতে আমার অনেকদিন লেগেছিল, কেন না রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটা বিরূপ ভাব আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি পিতৃদেবের পূর্ণিমা মিলনে এসে আমার চোখকে মুগ্ধ করে-ছিলেন একথা বলেছি। কিন্তু তবু মন তুলত শিরপা, বলত বড় বেশি সুন্দর—কমনীয়। তখন আমি বুঝি নি কবির একটি গূঢ় অভীপ্সার মর্ম যার ইংরাজি নাম পার্ফেকশন। বাংলায় বিশেষ্যলোকে এর প্রতিশব্দ নেই, যদিও বিশেষণলোকে আছে—নিখুঁত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পরে বুঝি—এ পার্ফেকশনের সাধনা কত কঠিন। একটি ইংরাজি কবিতায় উত্তরকালে পড়েছিলাম—মূল কবিতাটি হারিয়ে গেছে, কার কবিতা তাও মনে নেই, তবে ভাবার্থটি এই:

চিত্রী যখন চায়—হবে তার নিখুঁৎ প্রতি ছবি,
ছন্দপতন হয় না যেন—জপে যখন কবি,
দেশব্রতী চায়—তার দেশসেবা নিটোল হবে,
চায় রূপসী—প্রসাধনে তিল ত্রুটি না রবে,
ভুলিয়ে দেব—এ অভিনয়—ঘোষে যখন নট,
চায় পটুয়া—মসৃণ হোক তার প্রতিটি ঘট,
চায় সারথি—ঋজু রেখায় রথ চালাতেই হবে,
জীবনদেবতারই সাধন সাধে তারা সবে।

রবীন্দ্রনাথকে দেখবার আগে এ-কবিতাটির মর্ম ঠিক বুঝতে পারি নি। উত্তরকালে গীতায় এই কথারই যেন একটা স্থূলসার পাই যে, যোগ হ'ল কর্মের কৌশল—শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাই এর পূর্ণ সমর্থন, তথা তর্জমা—Perfection in works : কিন্তু কোনো কবি বা শিল্পী যে তার চলন-বলন বেশ-প্রসাধন দেখাশুনো চিঠিলেখা এমন কি হস্তাক্ষরের উৎকর্ষকেও তার জীবনসাধনার অঙ্গ করতে পারে একথা মনে উদয়ই হয় নি। তাঁকে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে ভালোবেসে তবে বুঝতে শুরু করি যে, তাঁর নিখুঁৎ হবার এ-অভীপ্সাকে তিনি বিধাতারই নির্দেশ ব'লে মেনে নিয়ে রূপ দিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত "জীবন দেবতা" কবিতায়, যেহেতু তাঁর অন্তরের আকূতি তাঁকে বিশ্রাম দেয় নি :

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসর শয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমারি ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্য নব।

কিন্তু শরৎদার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হয় তখনো মনের মধ্যে একটা চাপা বিমুখতা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি। তিনি থেকে থেকে যেন আমার এই অযুক্ত অভিযোগের প্রকাশ্য প্রতিবাদে বলতেন : "মণ্টু, রবীন্দ্রনাথ তা নন নন নন যা তুমি তাঁকে ভাবছ। তিনি একজন সত্যিই বিরাট মানুষ, বিশ্বাস করো। আমাদের এ-দীন দেশে যে তাঁর মতন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে শুধু এই কথা ভেবেই আমার কত সময় মনে হয়েছে যে, তাহ'লে হয়ত আমাদের জাতের অকালমরণ হবে না। এ-যুগে দুটি মহাপ্রাণ মানুষ এদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন : রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু। আর একটি ছেলে আছে বটে—সুভাষ। কিন্তু আমার অনেক সময়েই ভয় হয় যে ওকে হয়ত আমাদের এ-আত্মঘাতী জাতের দিকপালেরা উঠতে দেবেন না, পিষে মারবেন। কিন্তু সে যাক—চলো তুমি আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে।"

আমার লোভও হ'ত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ঠাও বাধা দিত—কেমন যেন মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে দেখলে ঘা খাব, তাই বলতাম : "যাব আর একদিন।"

শরৎদা একদিন আর কিছুতেই শুনলেন না, বললেন : "না, চলো তোমাকে আজই নিয়ে যাই। যেতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ ধরনের বিমুখ ভাব পুষে রাখলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে তোমারই। চলো।"

শরৎদার কথা ঠেলা সম্ভব হ'ল না শেষটায়। গেলাম তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় কবির কাছে। এখন থেকে তাঁকে কবিই বলব।

কবির সঙ্গে শরৎদা আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকলেন কী যে মিষ্টি হেসে! আমি গুটি গুটি গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম—এ-দিকে শরৎদা, ও-দিকে আমি।

কবি বললেন : "তোমার নাম শুনেছি। শরৎ কী যে গুণগান করে তোমার গানের—জানো না। একটা গান শোনাও না।"

তাঁর রূপ ও হাসি দেখে প্রথমেই মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন তাঁর মিষ্ট সম্ভাষণে যেন গ'লে গেলাম। মনের মধ্যে যেন কে এক অপরূপ মাধুর্যরস সঞ্চারিত ক'রে দিল। আমি গাইলাম একটি গান—কী গান গেয়েছিলাম মনে নেই, তবে পিতৃদেবের একটি প্রেমের গান গেয়েছিলাম ব'লে মনে পড়ছে। সম্ভবতঃ "এ-জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি।"

কবি খুশি হ'য়ে তারিফ করলেন—তারিফটা কিন্তু ভুলি নি, যদিও উদ্ধৃত করতে কুণ্ঠা হয়। কুণ্ঠা এ জন্যে নয় যে মনে হ'ল তিনি বাড়িয়ে বলেছেন, এই জন্যে পাছে লোকে ভাবে তাঁর মুখে চাপিয়ে দিচ্ছি—রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় : "শরতের দুরবস্থা দেখে মরতে ভয় করে।" তাই তাঁর সম্বন্ধে এখানে লিখি বিশেষ ক'রে যে-ভাবে তিনি আমার কিশোর ও যুবক হৃদয়ে অভ্যুদিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে শরৎদার কথা আর একটু ব'লে নিই—কেন না তাহ'লে কবির অভ্যুদয়ের ছবি আঁকা একটু সহজ হবে। কেন এ কথা বলছি—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শরৎদার কথা যখনই স্মৃতিলোকে ফুটে ওঠে তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর স্নেহকোমল সম্ভাষণ যার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি ছিল না। জীবনে স্নেহ পেয়েছি অনেক, খ্যাত ও অখ্যাতনামার। কিন্তু যেখানেই স্নেহ স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কাটিয়ে একটুও উঠেছে নিঃস্বার্থের অন্তরীক্ষে সেখানেই সে-স্নেহের মধ্যে দিয়ে এক আশ্চর্য আভাস ফুটে উঠেছে শুধু আনন্দলোকের নয়, মুক্তিলোকের। রবীন্দ্রনাথের ও শরৎদার স্নেহ সম্বন্ধে একথা বিশেষ প্রযোজ্য—এ-হেন দানকে বরণ করতে হয় বিধাতার আশীর্বাদেরই মতন।

কিন্তু তবু সব-কিছুর মতন স্নেহ প্রীতি প্রণয়েরও স্তরভেদ আছে, সব স্নেহই কিছু মনের প্রাণের সব ক্ষুধা মিটাতে পারে না। তাই আগে বলি শরৎদার স্নেহ আমার মনের প্রাণের কী বিশিষ্ট তৃষ্ণা মিটিয়েছিল দিনে দিনে। কবির কথা বলব তারপরে—যথাস্থানে।

যখন পিতৃদেব এ-জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি দেন তখন মনে হয়েছিল—এমন সহজে বুঝি কেউ আর আমার অন্তরের অন্তঃপুরে একান্ত আপনজন হ'য়ে ধরা দেবে না। সত্যিই বুকের ভিতরটায় সময়ে সময়ে এমন খালি খালি লাগত যে, আমি উদ্‌ভ্রান্ত মতন হয়ে পড়তাম, মনে হ'ত এ-ফাঁক বুঝি কোনো দিনই আর পূর্ণ হবে না। সুভাষ ও শরৎদাই প্রথম আমার এ শোকাবহ ধারনার মূর্তিমান্ প্রতিবাদ হ'য়ে হাজিরি দেন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

যাহার লাগি চক্ষু বুজে বইয়ে দিলাম অশ্রুসাগর,
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি—বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

এ-অনুচ্ছ্বাসকে প্রথম দিকে আমার কেমন যেন হৃদয়হীন মনে হ'ত, কিন্তু জীবনের সাক্ষ্য নামঞ্জুর করবে কে? তাই ক্রমশঃ দেখলাম যে, কবির সান্ত্বনা অকাট্য—গভীর শোক আমাদের জীবনকে তার বেদনার রসে সমৃদ্ধ ক'রে রেখে গেলেও তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে জীবনদেবতার অমর্যাদা করা হয়। পরে কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে একথার সত্যতা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করি—বুঝতে শিখি তাঁর একটি বাণীর মর্ম, যেকথা তিনি আমাকে প্রথম লেখেন একটি পত্রে—তীর্থংকর দ্রষ্টব্য—পরে মুখেও বলতেন প্রায়ই: "বলি ব'লেই ভুলি দিলীপ, আর ভুলি ব'লেই বলি।" এই বলার স্তব গেয়েছিলেন তিনি তাঁর একটি গভীর কবিতায় (বলাকা):

ওরে পথিক, ধর্ না চলার গান,
বাজা রে একতারা।
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ,
নাই কো কূল কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্নাহাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণবসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহবাঁধন-হারা।

জীবনের একটি মহাবাণী এই বাঁধনমুক্তি। সুখে সুখ পাওয়ায় ক্ষতি নেই, ক্ষতি আসে সুখে বাঁধা পড়লে তবে। কর্ম মায়া নয়, মায়াফাঁস পরি আমরা কর্মের তাঁবেদারি ক'রে, ফলদাতার কাছে বখশিস চেয়ে। যে-জল সচল তার স্রোতের মুখে আবর্জনাও দাঁড়াতে পারে না, পঙ্কিল হয় সেই জলা যা চলতে ভুলে থমকে গেছে।

কবির "চলি ব'লেই ভুলি আর ভুলি ব'লেই চলি" বাণীটির ভাষ্য খুব ফেনিয়েই লেখা যায় নানা দিক দিয়ে দেখে। কিন্তু সে যাক—বলি শরৎদার দান কীভাবে কবির এ-বাণীর অন্যতম ভাষ্য হ'য়ে দেখা দিয়েছিল আমার জীবনে।

পিতৃদেব আমার জীবনে এসে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন মার বিয়োগব্যথা। শরৎদা তেমনি এসেছিলেন—ঠিক্ ভুলিয়ে দিতে না হোক, সুসহ করতে—পিতৃদেবের বিয়োগবেদনা। অর্থাৎ, তিনি এসে তাঁর স্বকীয় সাহিত্যপ্রীতির সৌরভে যদি আমার চিত্তভ্রমরকে না আবিষ্ট করতেন তা'হলে সে হয়ত ভাবত যে এ-তেলনুন-লকড়ির জগতে সাহিত্যশতদল আমার নয়নমনকে আর তেমন মুগ্ধ করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করছি না কেন না রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে উদয় হয়েছিলেন অনেক পরে। শরৎদার অভ্যুদয় হয়েছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ অভাবের যুগে—আমার সাহিত্যবিয়োগবিধুর লগ্নে। এই কথাটি আর একটু ফলাও ক'রে বলব।

আমি আবাল্য মানুষ হয়েছিলাম সাহিত্য ও সঙ্গীতের আবহে একথা বলেছি। আমার নিযুতপতি মাতামহের স্নেহচ্ছায়ে থিয়েটার রোডের প্রাসাদসুখে ও মোটর-বিলাসে আমি আরাম পাই নি বললে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় সাহিত্যের এমন কি কোনো পলাতক আভাও ফুটতে পারত না। পিতৃদেবের আনন্দনিলয় "সুরধামে" বৈরাগী বলতে যা বোঝায় তা আমি ছিলাম না বটে, কিন্তু ঠিক সংসারী হয়েও গ'ড়ে উঠি নি। একথা বলেছি আমার 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালে'। কিন্তু থিয়েটার রোডে এসে একদিকে কলেজের বৈজ্ঞানিক বই ও ল্যাবরেটরির দুঃসহ ক্লেশ, অন্যদিকে সুরম্য প্রাসাদের বিলাস-বৈভবের অজস্র উপকরণের উদ্‌ভ্রান্তি—এ দুয়ের চাপে আমার সাহিত্যিক সাঙ্গীতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ ঝ'রে না যাক মিইয়ে এসেছিল বৈকি। এহেন দুর্লগ্নে শরৎচন্দ্র আমার জীবনে উদয় হ'লেন আঁধারবিজয়ী জ্যোৎস্নারই মত, আর অমনি আমার কিশোর হৃদয় সাগ্রহে তাঁকে বরণ ক'রে নিল খানিকটা যেমন মরুপথের পথিক বরণ করে সরোবরকে।

পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর তুলনা আমি না ক'রেই পারতাম না। শরৎদার অবশ্য ছিল না পিতৃদেবের দীপ্ত ব্যক্তিরূপ, দরাজ হাস্যপ্রতিভা, সৃষ্টিশীল সঙ্গীতকুশলতা, মর্মস্পর্শী কবিত্ব ও অগাধ পাণ্ডিত্য। কিন্তু তাই বলে একথা বলতে পারব না যে, আকর্ষণী শক্তি বা রসিকতায় শরৎদা এ-যুগের কোনো সাহিত্যিকের চেয়ে বিশেষ পেছিয়ে ছিলেন, কি কল্পনায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তাঁকে ছুঁয়ো দিতে পারত।

তার উপর তাঁর গল্প উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির সে কী আশ্চর্য অফুরন্ত প্রেরণা! আমি ভেবে যেন থই পেতাম না—ঐ কৃশকায় নিরীহ তাম্রকুটবিলাসী ঘরোয়া মানুষটি কোত্থেকে আহরণ করতেন এ-শ্রান্তিহীন জীবনীশক্তি যার আলোয় তাঁর নানা গল্পের সামান্যতম চরিত্রও উঠত এমনই জীবন্ত হ'য়ে যে মনে হ'ত যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি! আর সে কি সহজ প্রাণবন্ততা! অভয়া, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, শাহজী, কিরণময়ী, সাবিত্রী, কমললতা, পিয়ারি বাইজি—ভূভারতে কে কবে এদের চাক্ষুষ করেছে? কিন্তু তবু যেই এ-অপরূপ শিল্পী তাদের বর্ণনায় এমন জেঁকে বসতেন, মনে হ'ত কি কারুর যে এদের একটিও অবাস্তব বা ছায়াময়? আমার এক বন্ধু একবার মেয়েদের অজস্র ব্যঙ্গ ক'রে লিখেছিলেন—না, বলি শরৎদারই ভাষায় আমাকে লেখা একটি চিঠিতে:

"পরম কল্যাণীয়েষু মণ্টু,

সেদিন 'পুষ্পপত্র' মাসিক কাগজে তোমার লেখা পড়লাম। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তুমি ক্ষুব্ধ মনে বু-র নারীবিদ্বেষের প্রতিবাদ করেছ, কারণ অনুসন্ধান করেছ। তাকে তুমি ভালোবাসো, তোমার ভালোবাসায় পাছে ঘা লাগে এর জন্যে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা এবং সঙ্কোচ আছে, তবু মনে হয় কতকটা ভিতরের কথা তোমার জানা দরকার। কে নাকি লিখেছেন—সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরালে যে স্রষ্টা থাকে সে ছোট হলে সৃষ্টিটাও তার বড় হ'তে ব্যাঘাত পায়। * এই কথাটা আমিও বিশ্বাস করি।······বু লিখেছে—

'সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম।' কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায়

---

* এটি রোমাঁ রোলাঁর একটি প্রিয় প্রায়োক্তি—এবং আমিই শরৎদার কাছে উদ্ধৃত করেছিলাম রোলাঁর-লেখা বীটোভনের জীবনী থেকে। রোলাঁ বলতেন প্রায়ই যে কোন শিল্পীর মনটা বামন হলেও তার সৃষ্টি অতিকায় হ'তে পারে একথা যাঁরা বলেন তাঁরা শিল্পীও নন ক্রিটিকও নন—তাঁদের একটি মাত্র উপাধি আছে: অন্ধ।

না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না। তাছাড়া ছেলেটি এইটুকু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জুন উত্তরাকে যখন নাচ গান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে এ-কথা বলা চলে না যে এ-রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচ গান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। ......এ-সব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism ত নেই-ই realism'ও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করবার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। আমার অন্তরের স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা জেনো। ইতি। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।"

বু-র উপরে কিন্তু শরৎদা এ-পত্রে একটু অবিচারই করেছিলেন—শুধু এই জন্যেই নয় যে বু-র সাহিত্য প্রতিভা অনস্বীকার্য, এই জন্যেও বটে যে শরৎবাবু যে-দুই শ্রেণীর স্বৈরিণীর কথা বলেছেন তাদের চোখে না দেখলেও খবর পাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু সাবিত্রীর মতন ঝি কোনো মেসেই যে কেউ কস্মিনকালেও দেখেনি একথা জোর ক'রেই বলা যায়—ঠিক যেমন শ্রীকান্তর অবিস্মরণীয় "দিদি"র মতন বঙ্গবধূও এক শ্রীকান্তের ছাড়া আর কারুর এজাহারেই পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই জন্যেই তো শরৎদাকে বলব আরো অসামান্য শিল্পী, যিনি তাঁর কলাকুশলতায় নয়কে হয় করতে পারেন, অবিশ্বাস্যকেও দাঁড় করাতে পারেন প্রত্যক্ষের মতন অপ্রতিবাদ্য। সমর্সেট মম-এর একটি উক্তি আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতনই মনে হয় যে, বাস্তববাদী উপন্যাসে লেখক যে-কোনো চরিত্রই আঁকবার অধিকারী বটে—কেবল একটি সর্তে যে তাকে দেখলে মনে হবে না—এ অসম্ভব, মনে হবে এমন জীবন্ত যে বিশ্বাস না করেই পারা যায় না। অন্য ভাষায়, বাস্তব চিত্রীর বাস্তবতার নিকষ নয় —তিনি যা আঁকলেন জীবনে তাকে চ'লে ফিরে বেড়াতে কেউ কোথাও দেখেছি কি না, নিকষ হ'ল শুধু এই যে তার চলন-বলন ধরণ-ধারণে পাঠকের বিশ্বাস আসবে আপনি থেকেই, মনে হবে তাকে জীবন থেকেই নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বস্তুতন্ত্রতার বিষয়ে এই-ই শেষ কথা নয়, এর পরেও আছে। অর্থাৎ পিশাচকে একেবারে জাজ্জ্বল্যমান্ পিশাচ ক'রে দাঁড় করানো যে-দরের কৃতিত্ব তার চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের কৃতিত্ব হ'ল—দৈনন্দিনতার হাজারো বাহ্য গ্লানির আড়ালে

আসীন প্রচ্ছন্ন মানবমহিমাকে বিশ্বাসযোগ্য—convincing—ক'রে আঁকা। আমি বলতে চাইছি—শরৎদা কলাকারুর চরম শিখরে উঠেছিলেন সাবিত্রীর ঝি-ত্বকে ফুটিয়ে তুলে নয়—তার ঝি-ত্বের মধ্য দিয়ে তার নারীত্বকে প্রভাময় ক'রে তুলে। শুধু সাবিত্রীই বা বলছি কেন, তাঁর নানা নারীচরিত্রের মধ্য দিয়েই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তাঁর মহৎ হৃদয়ের দরদই বলব, শুধু নিখুঁৎ শিল্পীর নৈপুণ্যই নয়—স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করবার উৎসাহ তো নয়ই। বস্তুত, শরৎদার গল্পে উপন্যাসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নারীচরিত্রই যেন বেশি দীপ্তিময় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু একটু বেশি দূর চলে এসেছি: স্মৃতিচারণের লক্ষ্য নয় সাহিত্যের সমালোচনা, তাই এ-আলোচনা স্থগিত রেখে বলি কেন তাঁকে এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম—যার ফলে পিতৃদেবের বিয়োগদুঃখও আমার মনে খানিকটা নিভন্ত হ'য়ে এসেছিল।

তাঁর কত কথায়ই যে ফুটে উঠত তাঁর অসামান্য অনুকম্পা—তাঁর ভাষায় "বুকের দরদ"। শুধু নগণ্য নারী বৃদ্ধ বা শিশুচরিত্রই নয়, কুকুরের ছবিও কী অপরূপই এঁকেছেন তিনি শ্রীকান্তে—"মহেশ" গরুর তো কথাই নেই।

এই দরদের প্রসাদে আমার মনে হয় তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সমানধর্মী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন তাই নয়, বাঙালি মেয়েকে এমন গৌরবে গৌরবিণী ক'রে তুলে ধ'রেছেন যে পড়তে পড়তে সম্ভ্রমে মাথা হেঁট হ'য়ে আসে, বুকের রক্ত দ্রুত বয়, মন আনন্দে যেন পিতৃদেবের শ্লোকটিতে বদ্‌লে গেয়ে ওঠে:

> ভারতের নারী ভারতের নারী! কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
> নারী-গৌরবে হে মহিমময়ী, স্নেহ করুণার অমলা ধাত্রী!

কিন্তু যেহেতু তাঁর নারীকে জয়টিকা দেওয়ার এ-পরম কীর্তি আমাদের রসিক সমাজে স্বীকৃত হ'তে দেরি হয় নি সেহেতু এ নিয়ে আর বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু যে একথার উল্লেখ করলাম সে তাঁর সাহিত্যের রসমূল্যের বিচার করতে নয়—তিনি কেন আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন সেই কথাটি নিবেদন করতে: অন্য অনেকের মতন তাঁকে আমি শুধু বাস্তববাদী লেখক ব'লেই চিহ্নিত করতে পারি নি এই কথাটি জানাতে। তাঁর অঙ্কিত নানা নারীচরিত্র পড়তাম আর আমার তরুণ বুক গর্বে যেন দশহাত হ'য়ে উঠত যে আমাদের মেয়েরা এমন মহীয়সী! নারী সম্বন্ধে এই আদর্শবাদ তাঁর সহজাত ছিল ব'লেই তিনি বু-র সম্বন্ধে অমন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে পারেন নি।

বু-র কথা যখন তুলেছি তখন আমার পক্ষে তার প্রতিভা সম্বন্ধে নীরব থাকা সত্যাচরণ হবে না। উত্তরকালে আমি মনস্বী মোহিতলাল মজুমদারেরও বিরাগভাজন হই বু-র সাহিত্যপ্রতিভার সুখ্যাতি করার জন্যে। এ-ও আমি শুনেছিলাম যে, বু আমার বিরুদ্ধে নানা কথাই বলতেন। কিন্তু আমার যে নিন্দা করবে তার গুণাবলীকেও স্বীকার আমাকে করতেই হবে সত্যের খাতিরে। অথচ বু-র গুণগ্রাহী হওয়ার দরুণ মোহিতলাল তথা শরৎদার সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদানে ভারি মুস্কিলে পড়তে হত। কারন বু-র গল্প না হোক, কবিতা আমার সত্যিই ভালো লাগত, সে শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের প্রতিভা অস্বীকার করা সত্ত্বেও। শরৎচন্দ্র নিজেও বঙ্কিমচন্দ্রকে খানিকটা খাটো করতেই চাইতেন বলব—যে জন্যে আমি কোনোদিনই তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি। কারণ শৈশবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম—তাঁর নানা রচনা আজও আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু হ'লে হবে কি, এযুগে দেখি বঙ্কিমচন্দ্রকে অস্বীকার করা প্রায় একটা ফ্যাশনের মতনই দাঁড়িয়েছে। তবে এজন্যে আমার মনে ব্যথা বাজলেও একবারও আমার মনে হয়নি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ভবিষ্যতে রসিক বাঙালির কাছে কোনদিনও অনাদৃত হবে। আমাদের দেশে গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও কাব্যে মধুসূদনের দান চিরদিন সকৃতজ্ঞে স্বীকৃত হবে—রুচির নানা সাময়িক ওঠা-পড়ার পরে সাহিত্যদৃষ্টি ও রুচি একটু থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

একথার উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে শরৎদার সঙ্গে এ নিয়ে আমার বিতর্ক বাধত। এখানে আমি রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের সঙ্গেই একমত ছিলাম বরাবরই, আজও আছি যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের গৌরব তথা সাহিত্যের একজন প্রথম পথিকৃৎ। কিন্তু সে যাক্, শরৎদার প্রসঙ্গে ফিরে আসি ফের।

বলেছি শরৎদার কাছে শুধু যে স্নেহ পেয়েই আমি লাভবান হয়েছি তাই নয়—সাহিত্য সম্বন্ধেও অনেক কিছু শিখেছি। যথা, তিনি আমাকে বারবার বলতেন সাহিত্যে রসসৃষ্টি করতে হ'লে সংযমের কৃতিত্ব অর্জন না করলেই নয়। তাঁরই একটি চিঠি উল্লেখ করি এসম্পর্কে। "মনের পরশ" উপন্যাসটি প'ড়ে তিনি সত্যিই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর এ-খুশি হওয়াকে আমার পরমতম পুরস্কার ব'লে মনে করলেও শিখেছিলাম তাঁর তিরস্কার থেকেই বেশি। তিনি লিখেছিলেন ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখের একটি পত্রে :

"আমি বিশেষ ভাল নেই, দেহটা নিয়তই ক্ষীণ এবং অপটু হয়ে আসচে।

তবু আশা আছে তুমি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। তোমার দুখানি বইই বড় মন দিয়ে পড়েছি। মনের পরশের শেষটি বড় মধুর। বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটা দেখতে শিখেচে তার লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে ওঠে এ বইখানি পড়লে তা জানা যায়।

তুমি সদাই ব্যস্ত, তোমার সময় কম; কিন্তু এবার ফিরে এসে তোমাকে লেখার দিকে একটু মন দিতে হবে। রচনার শিল্প বল, কৌশল বল, টেক্‌নিক বল—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ-চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকের দল এমনি কুঁড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ রইল।—তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

আর একটি পত্রে (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৭) তিনি লিখেছিলেন :

"তোমার চিঠির আবশ্যকীয় অংশগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিই। তোমাদের নতুন কাগজ আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যাঁরা, তাঁদেরও নেবার জন্যে ব'লে দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেছ সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেছি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধর-দা তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট ক'রে

দেয়। কেদার বাঁড়ুজ্যে চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। আর এক ধরনের অসংযম দেখতে পাই অ-র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে, কিন্তু এই যাওয়াটা ও এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্গদ আদেক্লেপনা প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে।"

শরৎদার এসব নির্দেশ থেকেই আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম—যেমন পরে শিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নানা নির্দেশ থেকে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার একটি বিশেষ বিতণ্ডার কথা বলতে চাই—ঠিক জায়গায়ই প্রসঙ্গটা এসে গেছে ব'লে এখানেই বলা ভালো।

রবীন্দ্রনাথ তখন বোলপুরে। আমি তাঁকে আমার "মনের পরশ" উপন্যাসটি পাঠাই। উপন্যাসটির তিনি প্রশংসা করেন নি—মোটের উপর। বললেন: "ও উপন্যাস হয় নি দিলীপ। যেখানে সেখানে রাজ্যির তর্ক উড়ে এসে জুড়ে ব'সেছে। অথচ বইটি চমৎকার উপন্যাস হ'তে পারত যদি তুমি মনে রাখতে যে উপন্যাসে সব আগে চরিত্রচিত্রণ ও গল্পের ইমারৎ পাকা হওয়া দরকার।" ব'লে এইভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলেন পরিষ্কার মনে আছে—"আজকাল একটা ধুয়ো উঠেছে যে জীবন যখন বিচ্ছিন্ন অর্থহীন সুসংগতির ধার ধারে না, তখন উপন্যাসও সেই রকম চলবে আপনার খুশখেয়ালে—পারম্পর্য ভেঙে। যেমন জয়েসের উপন্যাস। গল্প চলছিল হঠাৎ এক খাপছাড়া চিন্তা এল—যে চিন্তা আবার আর এক উল্টো চিন্তা টেনে আনল—সে হাজির করল আর একটাকে—ফল দাঁড়াল হিজিবিজি। এঁরা বলেন চিন্তা তো প্রায়ই খাপছাড়া হয়—এর সঙ্গে ওর কোনো যোগই থাকে না। ধরো তুমি আমার সঙ্গে কাব্যরসের আলোচনা ক'রেই তোমার ঘরে যেতে যেতে পা মচ্‌কে পড়লে। ডাক্তার এল, ডাক্তারের সঙ্গে এল একটি নার্স, নার্সটি সুরু ক'রে দিল তোমাকে তার জীবনকাহিনী বলতে। তুমি যেই আর্দ্র হ'য়ে উঠলে অম্‌নি তার নামে এক তার এল, সে গল্প বন্ধ রেখে চ'লে গেল তার গ্রামে বৈদ্যবাটিতে। সেখান থেকে তোমার এক বন্ধু হঠাৎ তোমাকে লিখলেন এই নার্সের বিরুদ্ধে নানা কথা। লিখে শেষ হ'তে না হ'তে বললেন: 'আমার ছেলের একটি চাকরি চাই···' এইভাবে ক থেকে আরম্ভ ক'রে চলল গল্প—ক ঘ ল ব উ ঙ ভ হ শ ঞ এই পর্যায়ে, কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ বা পারম্পর্য নেই। এমন কথাও আজকাল উঠেছে যে

উপন্যাস হবে অবচেতনের (সাবকনশাস) বুদ্বুদলীলার মতন শুধু অকারণ ফোলা আর ফাটা! কিন্তু তোমাকে বলছি আমি—এ পথে গল্পের মুক্তি নেই। কোনো গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা যথাপর্যায়ে না থাকলে সে-গল্প আর্ট হিসেবে নামঞ্জুর। আমি বলছি না মনের পরশের সবটাই নামঞ্জুর। কিন্তু এখান থেকে ওখানে তুমি টপ্‌কে টপ্‌কে চ'লে গেছ যেন রোখ ক'রেই। অমুকের কাহিনী সুরু হ'তে না হ'তে এসে গেল হিউম্যানিটি ওয়াল্‌ট্ হুইটম্যান নিয়ে তর্ক।"

আমি বললাম: "কিন্তু আপনার গোরায়ও কি তর্কাতর্কি নেই অজস্র?"

কবি বললেন: "আছে, কিন্তু সে-তর্ক শুধু যে যথাস্থানে উঠেছে তাই নয়, তার মধ্যে দিয়ে তার্কিকের পরিণতিটা চোখের সামনে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। তোমার মনের পরশের নানা তর্কাতর্কি—বিশেষ ক'রে প্রথম দিকে—এভাবে আদৌ সহজ পথে চলে নি, তুমি নানা সময়ে নানা সমস্যা নিয়ে যত কিছু ভেবে বার করেছ সব লিখে গেছ ঝোঁকের মাথায়—অনেক সময়ে গবেষণা ঠিকই হয়েছে মানব কিন্তু উদোর পিণ্ডি চাপিয়েছ বুধোর ঘাড়ে—সুতরাং পদে পদে হয়েছে রসভঙ্গ। অথচ এ-উপন্যাসটির মধ্যে চমৎকার চমৎকার ভাব আবিষ্কার মনস্তত্ত্ব আছে—তোমার প্রতিপাদ্যটিও পেশ করবার মতন বৈকি—যে মানুষ আজ দেশ কাল সংস্কারের গণ্ডি কাটিয়ে পরস্পরের কাছে এসে পড়েছে—ভবিষ্যতে আরো কাছে আসবে। তাই আমি বলি কি, তুমি এই বাণীটিকেই ফোটাও তোমার গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পের স্বধর্ম বজায় রেখে, মনের পরশে এম্‌নি মালমশলা আনো যা তার বিকাশের অনুকূল। মনে রেখো যে উপন্যাসের কলাকারু স্বধর্মে সিলেকটিভ ব'লে তার নানা উপাদানকে বাছাই করা চাই সব আগে, নৈলে তার ইমারৎ টলমল করবেই করবে। তোমার এ-উপন্যাসটির একটি ধারা আমার সত্যি ভালো লেগেছে।—তুমি প্রপাগাণ্ডা করতে লেখো নি, তোমার একটা বক্তব্য আছে তাকে ফোটাবার তাগিদেই লিখেছ। কিন্তু তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে গল্পকে সব আগে গল্প হ'তে হবে—তাকে গবেষণা দাঁড় করালে সে বিপথে চলতে গিয়ে ডোবে। আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু। আমি মোটেই এমন কথা বলছি না যে গল্পে তর্কাতর্কি বা ভাববিলাসের কোনো স্থানই নেই। এমন কি গবেষণাও গল্পে আসতে পারে যদি তাতে ক'রে গল্পের চরিত্রগুলি ফোটানো ও সে গল্পকে গল্পের খাতে

ঠেলে দেওয়া হয়—অর্থাৎ যদি অবান্তরের আমদানি ক'রে তর্ক গবেষণাকে ফাঁপিয়ে তোলা না হয়।"

আমি এ-কথাগুলি মূলতঃ আমার নিজের ভাষায় সাজালেও (তাঁর অনুপম ভাষা আমি পাব কোত্থেকে?) তাঁর বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছি, আমার কল্পনাকে নয়। অর্থাৎ তিনি শুধু যে এই কথাগুলিই বলেছিলেন তাই নয়। আরো অনেক মূল্যবান কথাই বলেছিলেন। তিনি একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে যে কী আশ্চর্য উপমার পর উপমা তাঁর মুখে ফুলঝুরির মতন ঝল্‌কে উঠত —ভাবতেও আজ মনে শিহরণ জাগে যে, এমন মানুষের স্নেহোপদেশ ও স্নেহ-তিরস্কার লাভ করবার মতন ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছিলাম। কেবল একটি পরিতাপ আজো আমার মনে কাঁটার মতনই খচ খচ করে যে সে-সময়ে আমি আত্মাভিমানবশে অনেক সময়েই দেখেও দেখতে চাইনি যে তিনি আমার লেখার দোষ ধরতেন আমাকে নিরুৎসাহ করতে নয়—আমাকে ঠিক পথে রওনা ক'রে দিতেই বটে। তাই তাঁর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে নানা সময়ে হঠকারী হ'য়ে তর্ক করার জন্যে আজও আমার লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায়—কী ক'রে আমি এমন অবোধ হ'তে পারলাম ভেবে ! এ-চিত্তগ্লানির সময়ে কেবল এইটুকু ভাবতে কিছু সান্ত্বনা পাই যে—রাসেল যে রাসেল তিনিও বলেন—আমরা প্রত্যেকে আসলে কত বোকা যদি সময়ে ঠিক ম'ত জানতাম তবে জগতের অনেক ট্রাজিডিরই নিরাকরণ হ'ত। ব'লে রাসেল ঈষদ্ধাস্য ক'রে লিখেছেন যে আমরা আসলে যে কত বোকা সেটা সবচেয়ে সহজে বোঝা যায় যদি আমরা আমাদের উচ্ছ্বাসী মুহূর্তে লেখা অতীতকালের নানা পত্র আজ পড়ি। কারণ তাহলে পড়তে পড়তে লজ্জায় আমাদের যে আধোবদন হতেই হবে (যদি না আমরা স্বভাবে অতি নির্লজ্জ হই) ভাবতে যে আমি এত বোকা ছিলাম সে সময়ে !

স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি—নিশ্চয়ই ভুলভ্রান্তি আছে কিছু কিছু, তবে মূল প্রতিপাদ্যটি সম্বন্ধে আমার ভুল হবার কথা নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা আমার কাছে মর্মভেদী মনে হয়েছিল, এবং মর্মভেদী জিনিস সহজে ভোলা যায় না।

শুধু তাই নয়—রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি আমি একবার সমর্সেট্ মমকে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি পূর্ণ সায় দেন। ফলে আমার মনের মধ্যে দ্বিধা বেড়ে যায় ও আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি নিস্পৃহ হ'তে। এ আমি দেখেছি যে আন্তরিক চেষ্টা করলে নিস্পৃহ—dispassionate—হওয়া যায় এবং সত্যের নির্দেশ মেঘের

কোলে বিদ্যুতাভাবের ম'তই ঝল্‌কে ওঠে ঠিক কোনো এক সহসাদীপ্ত নিথর ব্রাহ্ম মুহূর্তে। এই আশ্চর্য উপলব্ধির লগ্নে আমি জীবনে অনেকবারই অন্ধকারে আলোর দেখা পেয়েছি। এমনি একটি সুলগ্নেই এই অতি মূল্যবান নির্দেশ আমার কাছে উত্তরকালে হ'য়ে উঠেছিল ভোরের আকাশে প্রথম সোনার বিন্দুর মতন শুধু সত্য নয়—সুন্দর নিটোল।

ফলে পরে মনের পরশকে ঢেলে সাজাই তাঁর (তথা শরৎদার) নির্দেশ মেনে—অবান্তরকে বাদ দিয়ে গল্প ও চরিত্র চিত্রণকেই মুখ্য বলে বরণ করে। ১৯৫৬ সালে ছমাস ধরে এটিকে নতুন ক'রে লেখার ফলে এটি হয়ে দাঁড়ায় আমার মতে—আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস যার আমি নব নামকরণ করি : "ভাবি এক হয় আর।" পণ্ডি-চেরিতে একসময়ে আমি যখন মন দিয়ে কাব্যচর্চা সুরু করি তখন ঠিক এইভাবেই শ্রীঅরবিন্দের নানা নির্দেশ মেনে কাব্য সম্বন্ধে অন্তঃশ্রুতি অর্জন করি। একথাগুলি এখানেই অকপটেই বললাম অনেকে ভুল বুঝবেন জানা সত্বেও। তবু বললাম শুধু এইজন্যে যে আমি আমার জীবনের প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে নানা মহৎ মানুষের সংস্পর্শে যে অভাবনীয় ভাবে আলো পেয়েছি জীবনের সায়াহ্নে আমার স্মৃতিচারণে তার একটা কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি রেখে যেতে চাই তাঁদের জন্যে যাঁরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাকে সন্ধানের পথে একটি সত্য পাথেয় বলে মনে করেন—যাঁরা গীতার বিধানে সায় দেন যে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

প্রতি যুগের সঙ্গেই তার পরবর্তী যুগের নানা রুচি রীতিনীতি ও ধর্মের সংঘর্ষ ঘটে। তাই এক যুগের প্রবীণরা প্রায়ই পরের যুগের তরুণদের দরদী হ'তে এত বেগ পান দেখা যায়। এ না হ'য়েই হয়ত উপায় নেই, তবু মনে আমার কেমন একটা আবছা খেদ জাগে যখন দেখি এ-যুগে শ্রদ্ধাকে মানুষ আর তেমন আমল দিতে চায় না, মনে করে উগ্র ব্যক্তিরূপের মুখরতায় বাহাদুরি বেশি। জানি না হয়ত এ-যুগের তরুণদের শ্রদ্ধার যে-দৈন্য আমাকে দুঃখ দেয় এর পরে তার প্রতিষেধক জুটলে সে গভীরতর শ্রদ্ধায় ফুটে উঠবে—যেমন এ যুগের নাস্তিকতাও হয়ত পরে গভীরতর আস্তিকতার দিকে মোড় নিয়ে সমৃদ্ধতর আস্তিকতাকে স্বীকার করবে আর সে শুভলগ্নে আমরা যে নবতন হার্মনির ভিৎ-এর পরে দাঁড়াব সে ভিৎ হবে আজকের ভিৎএর চেয়ে বেশি পাকা ও সমৃদ্ধ।

কবিগুরু সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানাসূত্রে এখানে ওখানে নানা কথাই লিখেছি। কিন্তু এবার পর পর শুধু তাঁর কথাই লিখব—উপনিষদের "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ" বাণীর অনুসরণে। তাই অবহিত হোন।

কবির কবিত্ব উপভোগ করতে শিখেছিলাম—অবশ্য নিজের বালবোধের অনুপাতে—ছেলেবেলায়ই বলব। কিন্তু মনে আছে সবচেয়ে চম্‌কে উঠেছিলাম প্রথম তাঁর নানা উপমায়—আরো এই জন্য যে, পিতৃদেব তাঁর উপমার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির উল্লেখ করতেন প্রায়ই। বলতেন: "কালিদাসের নানা উপমা আমাদের আধুনিক কালে মামুলি লাগে—রবিবাবুর আশ্চর্য ওরিজিন্যাল উপমার পাশে।"

কবিতায় অবশ্য কবিগুরুর উপমা প্রচুর মেলে। কিন্তু তাঁর উপমাপ্রতিভার সঙ্গে আমার নিজের প্রথম পরিচয় হয় বোধহয় "ছিন্নপত্রে"। বোধহয় বলছি—কেন না আট দশ বৎসর বালকের স্মৃতির কথা একটু ঝাপ্‌সা না হ'য়েই পারে না। তবু একটি স্মৃতি বেশ উজ্জ্বল হ'য়েই আছে—সম্ভবতঃ এই জন্যে যে ঘরে বাতি নিভিয়ে দিলেই যে বাইরে চাঁদের আলোর বন্যা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায় এ-অভিজ্ঞতাটি আমার বাল্যযুগেই হয়েছিল। তাই চম্‌কে উঠেছিলাম "ছিন্নপত্রের" এই বাতি নিভিয়ে দেবার উপমায়—উপমাটি নিশ্চয় আপনারও মনে আছে। যদি না থাকে তবে শুনুন কান পেতে: ছিন্নপত্রে ১৮. ১২. ১৮৯৫ তারিখে কবি লিখছেন—আর তখনই তাঁর কলমে এসে গেছে এ-অত্যাধুনিক রচনাশৈলী—আমরা সে-ভাষার আধুনিকতাকে আজো ছাড়িয়ে যেতে পেরেছি কি?

কবি লিখছেন: "সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরিজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার তর্ক পড়া যাচ্ছিল।... এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে ধাঁ ক'রে মুড়ে ধপ্ ক'রে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশ্যে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবা মাত্রই হঠাৎ চারিদিকের খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপ-হাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল ক'রে রেখেছিল!"

কবি কত সময়ে এম্‌নি কত অমূল্য উপমাই না দিয়েছেন—যার ফলে এক একটি ছোট্ট আভাষে ফুটে উঠেছে এক একটি বৃহৎ সত্য। উপমা মানুষ ভালোবাসে কি সাধে? অনেক ভেবেও যার তল পাওয়া যায় না—একটি ছোট্ট উপমায় তা চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন ছবির মতন জলজ্বলে হ'য়ে! আমাদের অহংবুদ্ধিকে মনে করা যাক ঐ নৌকোর মধ্যেকার দীপশিখা। বাইরে বিধাতার ব্যাপ্ত সত্তার আলো উচ্ছল, কিন্তু চোখে পড়ছে না ঐ একরত্তি অহমিকার চঞ্চল শিখার দরুন। এক দার্শনিক লিখেছেন: "পরম ভাগবত হবে কেমন্ ক'রে জানো? অহমিকাটিকে নিভিয়ে দাও—অম্‌নি দেখবে ভাগবতী করুণার আলোর ঢেউ খেলে যাবে—ভাগবতের ভাষায় "অনাবৃতত্বাৎ বহিরন্তরং ন তে"—অর্থাৎ তোমার অনাবৃত ব্যাপ্তির প্রসাদে ভিতর বাহির হ'ল একাকার ঠাকুর! ঐ ক্ষুদ্র বাতিটি যেমন এই মহাব্যাপ্তিকে আড়াল ক'রে রেখেছিল, ঠিক তেম্‌নি সারা বিশ্বে আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকার চঞ্চল শিখা আড়াল ক'রে রাখে মূর্ত আলোর দীপ্ত লীলাকে।"

কবি ছোট ছোট উপমার মধ্যে দিয়ে এম্‌নি সহজেই পারতেন কঠিনকে সুবোধ্য ক'রে তুলতে। আমি কোনদিন ভুলব না তাঁর বাঁশিওয়ালার উপমা যে-কথা লিখেছি তীর্থংকরে। কিন্তু তীর্থংকর এখন দুষ্প্রাপ্য, তাই যদি একটু উদ্ধৃতি দিই তবে তা শোভনই হবে এ-স্মৃতিকথায়। এ-রিপোর্টটির কবি অনুমোদন করেছিলেন।

সেখানে ছিলাম আমি ও অতুলদা। অতুলদা কবির কাছে গেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত বাউল গান: "আমার এ-আঁধারে এমন ক'রে চালায় যে গো!" কবি তাঁকে বললেন অতুলদার নিয়তিবাদ-এর প্রশ্নের উত্তরে: "আমি ঠিক ও ধরণের (অর্থাৎ নেপোলিয়নের) অদৃষ্ট মানি না। অমি মানি যে, আমাদের স্বাধীনতা আছে ভালো বা মন্দ করবার। অথচ তবু একটা হাত—অদৃশ্য বিধান—আমাদেরকে চালায়··· একটা উপমা আমার মনে হয় এ-সম্বন্ধে। ধরো একজন বাঁশিওয়ালা রকমারি বাঁশি বানিয়েছে। প্রতি বাঁশিই আলাদা আলাদা রকম বাজে। কিন্তু দু'একটা বাঁশি যায় উৎরে—কি ক'রে যেন সবই হয়েছে মাপসই—তার ফুটো ঠিক পরিসরের, কাঠ ঠিক মাপের, আয়তন যেমনটি হওয়া চাই—সব মিলে গেছে। বাঁশিওয়ালা অন্য সব বাঁশিও বাজায় কিন্তু এই উৎরে-যাওয়া বাঁশি কয়টি বাজাতেই তার বেশি ভালো লাগে। মানুষের বেলায়ও ঐ কথা। প্রতি মানুষকেই বিধাতা আলাদা রূপে গড়েছেন আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই ক'রে। কিন্তু কয়েকটা আবার বেশি উৎরে গেল। এদের চরিত্র একটু অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে দেখা

যাবে যে তাদের অভিজ্ঞতার গঠন প্রকৃতি, গুণসমাবেশ, ঘটনার যোগাযোগ সবেরই পিছনে যেন রয়েছে একজন অদৃশ্য কারিগরের—কী বলব—design—মৎলব।"

এতটা বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিলাম আরো এইজন্যে যে কবি নিজেকে কী চোখে দেখতেন তার বড় চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় এই ছোট্ট বাঁশির উপমাটি থেকে—যার ফলে ছবিটি ফুটে উঠেছে নিটোল হ'য়ে। অন্ততঃ আমি তো তাঁর নিজের-দেওয়া এই উপমাটি থেকেই তাঁর ব্যক্তিরূপের মহিমাটি সবপ্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম: মনে পড়ে প্রায় সত্তর বৎসর আগে লেখা কবির "জীবন দেবতা" কবিতাটিতে তাঁর স্বরূপকে দেখা নিজেরি চোখে:

"আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে!

বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজায়, বাঁশি ভাবে সে আপনি বাজছে। কিন্তু সে-বাঁশি যখন বাঁশিওয়ালাকে ঠিক চেনে তখন টের পায় যে স্বর তার মধ্যে দিয়ে ফুটলেও বাজাচ্ছে আর একজন। এই কথাই কবি বলেছিলেন তাঁর আর একটি কবিতায় (অন্তর্যামী):

একি কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই?
অন্তর মাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ মিশায়ে আপন স্বরে।
কী বলিতে যাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই—কোথা ভেসে যাই দূরে!

তাই এত বেশি ক'রে মনে পড়ে আজ কবির আশ্চর্য উপমা জোগাবার প্রতিভার কথা! তাঁর সঙ্গে কত দিন কত আলোচনাই না করেছি! কিন্তু

নিজের তুচ্ছ কথা অহমিকাবশে যদি ভারিক্কি মনে না করতাম তাহ'লে তাঁর আরো কত উপমা মনে রাখতে পারতাম—যা শুনবার সময় মুগ্ধ হ'লেও টুকবার সময় ভুলে গিয়েছি।

কিন্তু তবু ভোলা কি যায়! তাঁর কত কথাই যে আমার তৃষ্ণার্ত মন আকণ্ঠ পান ক'রে তৃষ্ণা মিটিয়েছে কত দিন! আজ ষাটের কোঠায় দেখতে পাই তাঁর কত গভীর বাণীর উড়ে-আসা ভুলে-যাওয়া বীজে আমার মনে ফসল ফলেছে কত গভীর আনন্দের, সম্পদের, প্রেমের। তাঁর একটি কথা কোনদিনই ভুলব না। কথায় কথায় তাঁকে আমি একদিন বলেছিলাম যে আমার পিতৃদেব অতি মহৎ মানব হওয়া সত্বেও যে লোকের পাঁচকথায় কান দিয়ে কবিকে অন্যায় আক্রমণ করেছিলেন এ-দুঃখ আমার আজও যায় নি। শেষে তাঁকে বলেছিলাম: "শরৎদা যখন আমাকে বলেন যে, আপনি আপনার অনুরাগীদের উস্কে দেন নি পিতৃদেবকে আক্রমণ করতে তখন আমি বিশ্বাস করি নি। আমার বিশ্বাস হ'ল প্রথম আপনাকে দেখে। মনে হ'ল এ-মানুষ কখনো এ-হেন নীচ কাজ করতে পারে না।"

উত্তরে কবি বলেছিলেন: "তোমার পিতৃদেবকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতাম ও তাঁর প্রতিভার অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলাম ব'লেই তাঁর আক্রমণে দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখকে আমি ভয় করি না, ভয় করি ক্ষোভকে। আমি জীবন থেকে এই মস্ত শিক্ষাটি চয়ন করেছি যে, যা বাইরের তাকে বাইরে রেখে দিলেই তা থেকে লাভ করা যায়, ভিতরে আসতে দিলেই মহতী বিনষ্টি। কেমন জানো! বড় গাছ প্রখর তাপেও মরে না, কেন না তার মূল মাটির গভীরে। তাই তার ডালপালা তপ্ত হ'লেও সে তার শিকড়কে ঠাণ্ডা রাখে ধূম তাপের নাগালের বাইরে রেখে। সংসারে থাকতে গেলেই ধুলো বালি আঁধি, তাপ ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে হবেই হবে। এদেরকে একবার অবান্তর ব'লে চিনতে পারলে আর ভয় নেই, কেন না তখন বাইরের জিনিসকে বাইরে রেখে দিলেই হ'ল—যেখানে তাদের কাজ আছে—কিন্তু ভিতরে আসতে দিলেই সর্বনাশ, কেন না তাহ'লে দুঃখকষ্ট হ'য়ে দাঁড়াবে ক্ষোভ, আর কে না জানে ক্ষোভের মতন বিষ কমই আছে? ক্ষোভের ফল বিষময় শুধু এইজন্যেই নয় যে সে অশান্ত করে, এজন্যেও বটে যে সে মনকে ছোট ক'রে দেয়। তাই যেম্‌নি দেখি কারুর বিরুদ্ধে আমার মনে ক্ষোভ জম্‌ছে অম্‌নি আমি সাবধান হই, তার বিরুদ্ধে আর কথাটি কই নে। তোমাকে শরৎকে কত সময়ে তিরস্কার করেছি, অনেক সময়ে বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছি। কিন্তু তাতে আমার চিত্তগ্লানি

হয় নি কেন না তোমাদের আমি স্নেহ করি, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভকেই তো আমল দিই নি। কিন্তু যদি দিতাম তাহ'লে তোমাদের সম্বন্ধে চুপ হ'য়ে যেতাম। ক্ষোভকে আমি এইভাবেই ধুলো পায়েই বিদায় দিয়ে এসেছি বরাবর। তোমার পিতৃদেবের বিরুদ্ধে এইজন্যেই আমি তখনো কথাটি কই নি! তাঁকে আমি একথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলাম বিলেত থেকে।"

ফের বলি আমি নিজের ভাষায়ই কবির মূল বক্তব্যটি পেশ ক'রলেও তাঁর মুখে আমার কোনো বানানো কথাই চাপাই নি—এই কথাগুলিই তিনি বলেছিলেন এবং আমার মনে আছে আরো এইজন্যে যে উত্তর জীবনে যখনই কোন বন্ধুর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছি তখনই কবির এই কথাগুলি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছে, আমি নিজেকে বলেছি: "তাপকে বাইরে রেখে দাও, ভিতরে আসতে দিলেই ছোট হ'য়ে যাবে। মনে রেখো বড় মনের মূলধন নিয়ে যে জন্মেছে তার দায়িত্ব আছে—সে মূলধনকে খাটিয়ে আরো বাড়াতে হবে—বড়কে আরো বড় হ'তে হবে—সংসারের আঘাতে ছোট হয় যারা ছোট, বড় যারা তারা আরো বড় হ'য়েই ওঠে।"

এই যে ভিতর-বাহির জীবনসূত্র এর চরম পরিণতি হয়েছিল ১৯৪১ সালে যখন কবি অকুতোভয়ে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোতে। ২৯শে জুলাই-য়ে তাই তিনি লেখেন তাঁর উনশেষ কবিতায়:

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে···
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

ভয়কে জয় করবার সাধনায় কবি যে কোনো দিনই বিরত হন নি—তাঁর মুখে নানা সূত্রেই শুনেছি। শুনেছি একাধিকবার যে, ভয় এক এক সময়ে সত্যিই আসে মায়ারূপ ধ'রে—অর্থাৎ নিজেকে তাই ব'লে জাহির ক'রে যা সে নয়। গীতার ঠাকুরও আমাদের বলেছেন এই মায়ার কথা ও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন কেমন ক'রে তার চৌহদ্দি পেরুতে হয়:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়াঃ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অর্থাৎ

যে-মায়া আমারে ঢেকে রাখে—ঘন সুকঠিন মুখাবরণ তার :
পারে সে-আড়াল পার হ'তে সে-ই—চিরাশ্রয় যে পায় আমার।

কবি এই সত্যটিকে পেয়েছিলেন যেন খানিকটা উল্টো দিক থেকে—অর্থাৎ দুঃখনিশার ভয়ের মুখোশকে আগে মায়া ব'লে চিনে তাকে পেরিয়ে পৌঁছতে চাইতেন মায়েশের অভয় কোলে। অভয় বলতে কবি যে নিজেকে বঞ্চনা করেন নি তার একটা প্রমাণ পাই তার সুদূর যৌবনের লেখা "ছিন্ন পত্রের" পাতায়। তাতে দেখা যায় কবির একদিন কী ভাবে "এইমাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল" ২০শে জুলাই ১৮৯২ সালে। নৌকা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—সকলে ভিড় ক'রে এসে বললে : 'আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নৈলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।'

তার পরের দিনে লেখা কবির ভাষ্য উদ্ধৃতিযোগ্য : "কাল যে-কাণ্ডটি হয়েছিল সে গুরুতর বটে। যমরাজের সঙ্গে একরকম হাউ ড্যু ডু ক'রে আসা গেছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্‌স্‌ট্‌ ডোর নেবার, তা এরকম ঘটনা না হ'লে সহজে মনে হয় না।...অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর ম'ত একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা বড়ো একটা ভাবিনে। যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি, তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে, তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁই দিন—আমি আমার পাল তুলে চললুম।"

এ শুধু মুখের কথা নয়, জীবনের জয়যাত্রায়ও কবি চিরদিন পাল তুলেই চ'লে এসেছেন—নিয়তির হাজারো ভ্রূকুটিতেও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে। তাই না তিনি চিনতে পেরেছিলেন যে মায়ার আসল নাম লীলা—মায়া হ'ল ছদ্মনাম। এই লীলাকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করেছিলেন আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর সাধক : বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক। কবি বৈষ্ণবও ছিলেন না, তান্ত্রিকও না, অথচ দুয়েরি সার লুটে সম্পদ্‌শালী হয়েছিলেন অন্তরে অন্তরে। সে-সম্পদের নাম অভী। এই মুক্তির কথা তিনি তাঁর নানা গানে কবিতায় প্রবন্ধে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ব'লেও ক্লান্ত হন নি। তাঁর একটি গান আমি এক সময়ে খুব গাইতাম পণ্ডিচেরিতে গিয়ে :

"এই কথাটি ধ'রে রাখিস্ মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে-পথ গেছে পারের পানে—সে-পথে তোর যেতেই হবে।"

কিন্তু শুধু ভয়ের কবল থেকে মুক্তি নয়—সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তির অভীপ্সা তাঁর জীবন দেবতা তাঁর মনে বুনে দিয়েছিলেন শৈশবেই। তাইতো তিনি আমাকে বলেছিলেন—যে কথা তীর্থংকরে লিখেছি—১৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

"আমি সত্যিই বহুবার অনুভব করেছি যে আমাকে দিয়ে একটা বিশেষ কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ব'লেই কর্মকর্তা আমাকে কর্মের চাপে ফেলেছেন কিন্তু অপকর্ম করান নি, নানা দুঃখবেদনায় হাবুডুবু খাইয়েছেন কিন্তু তলিয়ে যেতে দেন নি সবরকম অভিজ্ঞতার বোঝাই আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন কিন্তু পিষে ফেলেন নি, নানা বাঁধনে বেঁধেছেন কিন্তু কোনো শিকলে বন্দী করেন নি—যেমন আর পাঁচজনকে করেছেন—বা যা তারা হয়েছে—যাই বলো।"

এই কথাটি কবি যে কতবার কতসূত্রে কতভাবেই বলেছেন তা তাঁর সঙ্গে যাঁরাই একটু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন। মৈত্রেয়ী দেবীর মর্মস্পর্শী "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"-এর ১৫৪ পৃষ্ঠায় কবির আত্মকথন আরো সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে :

"চিরদিন মনে মনে আমি উদাসী—ছোটবেলা কেন, শিশুকাল থেকেই।··· চিরদিন আমি সংসারের শত সহস্র রকম কর্মের মধ্যে রয়েছি—কিন্তু আমার মন, নৌকো যেমন তীরের বন্ধনের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে ভেসে যায়, তেমনি ভেসে চলেছে। ঘাটের বন্ধন আমার জন্যে নয়। তা যদি হ'ত, যদি সংসারের অসংখ্য ছোট বড় বন্ধনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জড়িয়ে পড়তুম, তাহ'লে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যেত। আমার ভাগ্যদেবতা তা হ'তে দেবে না, তাহলে যে সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। তাই আমি একদিন লিখেছিলুম—আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

এই সুদূরের তৃষ্ণা, "বিপুলের ব্যাকুল বাঁশরী"র ডাক কবি শুনেছিলেন ছেলেবেলায়ই, তাই ছোট সুখে ছোট তৃপ্তিতে কোনোদিনই মন বসাতে পারেন নি। কর্ম থেকে মুক্তি নয়—কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি। অপি চ, এই মুক্তির অভীপ্সা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে দেখেছিলেন ব'লেই তাঁর কবি-হৃদয় সোচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়েছিল—কবি এঁকেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ-তর্পণে নিজেরি মনের ছবি :

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত······

এ-সম্পর্কে একটি কথা মনে পড়ে গেল, বলি—বলবার ম'ত। ১৯২২ কি ২৩ সালে, কবি আমাকে একদিন দুঃখ ক'রে বলেন: "শ্রীঅরবিন্দ সকলের সঙ্গ ছেড়ে একলা কী করছেন ভালো বুঝতে পারি না। স্বদেশী যুগে তাঁর লেখায় বিদ্যুৎ ছুটত হে।"

আরো কয়েকটি কথা তিনি বলেছিলেন সেদিন, কিন্তু আমি জানতাম মনে মনে যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর আন্তর শ্রদ্ধার প্রসাদে তিনি একদিন বুঝতে পারবেনই পারবেন যে শ্রীঅরবিন্দ স্বভাবে আলেয়া-বিলাসী মানুষ নন। কিন্তু সে-সময়ে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তো বিশেষ কিছু জানতাম না তাই কবির ধারণা নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করি নি, পরে শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা ক'রে কবির কাছে ফিরতেই তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন: "কী দেখলে বলো।"

আমি আমার উচ্ছ্বাসী ঢঙেই বললাম যা···মনে এলো।

কবি (হেসে): তোমার উচ্ছ্বাস ভালো, কিন্তু বর্ণনা একটু পেলে আরো ভালো হ'ত।

আমি (থতমত খেয়ে): কী ক'রে বর্ণনা করি বলুন? যে অভিভূত হয় সে কি বোঝাতে পারে—ঠিক কেন অভিভূত হয়েছে? কিন্তু আপনি আমাকে যতটা নাবালক ভাবছেন আমি ঠিক ততটা নাবালক নই। তার প্রমাণ দিই শুনুন। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যেরা (আমি তখনো তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি নি) বলেন, তাঁকে দেখলে তাদের মনে হয় ভগবান্। আমার মনে হয় নি তিনি ভগবান্।

কবি (প্রসন্ন): আশ্বস্ত হলাম সত্যিই। কিন্তু কী মনে হ'ল না-র পরে বলা চাই কী মনে হ'ল।

আমি (হেসে): ভয়ে বলব না—নির্ভয়ে?

কবি (হেসে): যে-ভাবে আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করো প্রাণের মায়া ছেড়ে তাতে মনে তো হয় না তুমি ভয়কাতুরে।

আমি (খুশি হ'য়ে): তর্কাতর্কি করবার অধিকার যে দেয় তার সঙ্গেই না আপ্রাণ তর্ক করা চলে।

কবি: সাবাস! তর্ক করবে বৈ কি। জীবনের অনেক আনন্দের মধ্যে তর্কানন্দও তো একটা। কিন্তু বর্ণনার আনন্দও আর একটা। তাই বলো এখন —শ্রীঅরবিন্দকে দেখে তোমার কী মনে হ'ল।

আমি : মনে বেজে উঠল এরি নাম উপনিষদের ঋষি যিনি বলতে পারেন : "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।* আপনি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসুন না কেন—সব সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

কবি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন ক'রে ফিরবার পর আমি জোড়াসাঁকোয় ছুটে যাই। বললাম : "এবার আমার পালা। বলুন কী দেখলেন ?"

কবি : সত্যিই তিনি আছেন এক দীপ্তির মাঝখানে।

মডার্ণ রিভিউয়ে তিনি লিখেছিলেন (যতদূর মনে পড়ে প্রবাসীতেও লিখেছিলেন এই কথাই বাংলায়) :

"His face is radiant with an inner realisation……" প্রবন্ধটি হাতের কাছে নেই তবে তার একটি ছত্র অবিস্মরণীয়—শ্রীঅরবিন্দকে তিনি বলেছিলেন : "You have the word and we are waiting to accept it from you. India will speak through your voice to the world."

এ থেকে আমি দেখাতে চাইছি যে কবি মুক্তিবাদী ছিলেন প্রথম থেকেই, নৈলে তিনি কিছুতেই শ্রীঅরবিন্দের গুণকীর্তনে এমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারতেন না। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর সম্বন্ধে লিখতেন না : "He has been a way-farer towards the same goal as ours in his own way."†

এ-সূত্রে একটি আনন্দ আমার অমর হ'য়েই থাকবে যে, শ্রীঅরবিন্দের কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে ও রবীন্দ্রনাথের কথা শ্রীঅরবিন্দের কাছে ব'লে আমি নানা সূত্রে তাঁদের মধ্যে নবপরিচয়ের সেতু বাঁধতে পেরেছিলাম যার ফল হয়েছিল শুভ সব দিক দিয়েই। আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই একথার স্বপক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবে ছিলেন ঠিক যে কী এককথায় বলা মুস্কিল কেন না তাঁর শুধু যে প্রতিভাই বহুমুখী ছিল তা নয়, ঔৎসুক্যও ছিল অফুরন্ত। কত কিছুই যে তিনি জানতে চাইতেন তাঁর নানা জিজ্ঞাসায়ই পরিস্ফুট হয়েছে। শেষ বয়সে এমন কি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এক বই লিখে বসলেন "বিশ্বপরিচয়"—কী চমৎকার ভাষায় নিপুণ ভাষ্য! এইজন্যে আরো মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারি

* আমি সেই মহান পুরুষকে জানি যাঁর বর্ণ সূর্যের ম'ত, তিনি তমসার ওপারে নিত্যাসীন ?

† "অনামী"-র দ্বিতীয় সংস্করণে পুরো চিঠিটি দ্রষ্টব্য।

না যে "রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক নহেন—মিস্টিক হইলেও তাঁহার কবিত্বই নিষ্ফল হইত।" রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছত্রে ছত্রে মিস্টিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে কাব্যের স্বর্ণচ্ছটায়। পদে পদে তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন শুধু কবি ব'লেই নয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব'লেও বটে। আর মিস্টিক বলতে কি তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অধ্যাত্মসন্ধানী বোঝায় না? তাই মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের ধারণা অতি অপলকা যে রবীন্দ্রনাথের—

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

এ মিস্টিকের সাধনা নয়।" (রবিপ্রদক্ষিণ—রবীন্দ্রকাব্যের কবিপুরুষ)

আসলে মোহিতলাল ভারতের অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করতে চান নি কোনোদিনই—তাই এমন ছেলেমানুষি কথা বলতে পেরেছিলেন যে "রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক হইলে তাঁহার কবিত্বই নিষ্ফল হইত।"

বস্তুত: রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের একটি মুখ্য ধারা বরাবরই প্রবহমান হ'য়ে এসেছে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রকাশের খাতে। আর এ-অনুভূতিকে তিনি সাদরে বরণ করেছিলেন তাঁর কৈশোরেই—নৈলে তিনি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটিতে প্রকাশ করতে পারতেন না তাঁর অসহ পুলক:

"আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগলপারা।"

তাঁর জীবনস্মৃতি-তে "প্রভাত সঙ্গীত" অধ্যায়ে কবি চমৎকার ক'রে নিবেদন করেছিলেন তাঁর একটি গভীর মিস্টিক অনুভূতি:

"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া···· চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। ····সেদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না, এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।······

"সামান্ত কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম।···এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।"

দ্বৈতের মধ্যে যে পরম অদ্বৈত অখণ্ডের আভাস আসে এ অনুভূতিটিও মিস্টিক রবীন্দ্রনাথের "মহিমায় সমাচ্ছন্ন বিশ্বসংসারের" অনুভূতির সগোত্র। এই অনুভবের মধ্যে হৃদয় দিশা পায় এক পরম সমন্বয়ের যার ফল অবিমিশ্র আনন্দ এ আমার পুঁথিপড়া বুলি নয়—একদা আমার নিজের অনুভূতি থেকেই পেয়েছিলাম। একদা পণ্ডিচেরিতে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে ওঠার পরেই এই পরম আনন্দের অনুভূতি আমার হয় যার ফলে আমি লিখি আমার একটি প্রিয় কবিতা: "করুণা জগদ্ধাত্রী"—অনামীতে ছাপা হয়েছে। কবিতাটি এতই দীর্ঘ যে তার নানা অনুভবের নানারঙা বিন্যাসের আভাষ দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। তাই এখানে শুধু আমি দুটি মাত্র স্তবক উদ্ধৃত করব দেখাতে যে ছায়ার বুকেও আলোর কামনা উপ্ত থাকে ব'লে ছায়াও খতিয়ে আলোর সতীর্থই বটে—শত্রু নয়:

হারায়েছি বলি' মনে হয় যারে
কার করুণায় ফিরে পাই তারে?
তাই তো শোকের ব্যথা বিষাদের
তুফানেও বাঁশি উছলে তারি:
যে-আহ্বানের আধহারা রাগ
ফিরে ফিরে তার বিছায় সোহাগ
হৃদিযমুনার জলে কাঁপে যার
আলো—ছায়া যার দুরভিসারী।

এ-পরম ঐক্যের উপলব্ধির ফলে এক গভীর আনন্দ আমার দেহমন ছেয়ে গিয়েছিল, আমি গভীর রাত্রে শুনি এক অপরূপ আবাহনী অন্তরের অতলে :

"আয়　আলোর মন্ত্রে তোর কালের তন্দ্রা ঘোর
　　　টুটিয়া চেতনা-বরদাত্রী !
যুগে　যুগে যার ঝলকন দেখি' নীল-উন্মন
　　　হয় চিরবন্দিনী রাত্রি।

আজ　অজস্র উল্লাসে আয় মা,
বুকে　সহস্র আশা তোরে চায় মা,
চির　দীপ্ত দুরাশে তাই রচে তোর করুণাই
　　　নিত্য প্রতিমা—ধ্যান ধাত্রী !"

এই যে অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে প্রাণে মনে আনন্দের ঢল নামা—চোখের সামনে এক নব দীপ্তির বিচ্ছুরণ—যার আবেগে হৃদয় আত্মপ্রকাশ করতে চায় কিন্তু পেরেও পারে না—এ-জাতীয় নানা অতীন্দ্রিয় উল্লাসের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের অগুন্তি কবিতায়ই পাওয়া যাবে—দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথা প্রমাণ করতে যাওয়া হবে প্রায় স্বতঃসিদ্ধকে সত্য প্রমাণ করবার জন্যে গলদঘর্ম হওয়ার মতনই নিরর্থক।

কিন্তু তবু এথেকে রবীন্দ্রনাথের এ-নামকরণও করা যায় না যে খতিয়ে তিনি মিস্টিকই বটে—আর কিছু নন। না—তিনি ছিলেন এমনি একটি মানুষ যাঁর সহজ বিকাশ এমন সর্বতোমুখী যে তাঁর জাতি বর্ণ এমন কি ব্যক্তিরূপেরও কোনো অনড় অচল অভিধা নির্ণয় করা অসম্ভব। অবশ্য তাঁর সর্ববিধ বিকাশের মূর্ধায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে তাঁর কবি-রূপই বটে, কিন্তু সে-কবির মধ্যেও আরো অনেক রূপচ্ছটা একটি স্বাধীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে এক পরম আত্মসমাহিত দীপ্তিতে দীপ্যমান্। এ যে আমার কথার কথা নয় তা আপনিও নিশ্চয় মানবেন। কারণ বলুন তো—এ-বিচিত্র বহুরূপীকে কি নানা সময়ে আমরা নানা রঙে প্রতিভাত হ'তে দেখি নি? অন্ততঃ আমার নিজের কথা বলতে পারি একটুও না বাড়িয়ে : যে, সময়ে সময়ে আমি যেন দিশা পেতাম না তাঁর কী সংজ্ঞা দেব? যখন তিনি অভিনয় করতেন—মনে হ'ত কী অপরূপ নট! যখন কবিতা আবৃত্তি করতেন—মনে হ'ত কী সুন্দর বলার ভঙ্গি। যখন বক্তৃতা দিতেন—মুগ্ধ হ'তাম তাঁর বাগ্মিতায়। যখন আমাদের সঙ্গে রসালাপ

করতেন মনে হ'ত কী আশ্চর্য রসিক! আবার যখন তর্ক স্থরু করতেন—মনে হ'ত কী অদ্ভুত তার্কিক! কত বলব? তাজমহল যেমন দিনে রাতে নানা আলোর নানা রঙে ফুটে ওঠে অভাবনীয় হ'য়ে—উষালোকে একরকম, দীপ্ত মধ্যাহ্নে আর এক রকম, অস্তরাগে এক রকম, চাঁদনি রাতে আর এক রকম—রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর নানা মুহূর্তে আমার চোখে নানা রঙে প্রতিভাত হ'তেন। আমার আনন্দ হ'ত ভাবতে যে শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমি তাঁর মিস্টিক রূপটিই পেশ ক'রে গুরুদেবকে প্রীত করেছিলাম ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক-রূপ পেশ ক'রে তাঁকে মুগ্ধ করেছিলাম। আমার জীবনে মহাজনদের মধ্যে ঘটকালি করার স্থযোগ ঘটেছিল আরো অনেক ক্ষেত্রেই রোলাঁর সঙ্গে গান্ধি, রাসেলের সঙ্গে রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বা স্থভাষ······আরো কত সজ্জনের সঙ্গে অন্য সজ্জনের সাক্ষাৎ ঘটানো। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমাকে যে কয়টি পত্র লিখেছিলেন "তীর্থংকরে" প্রকাশ করেছি ব'লে উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকু এ-স্থত্রে বলতে চাই আমার এ-স্মৃতিচারণে যে, মহাজনদের মধ্যে মাদৃশ অভাজন নানা সময়ে সেতু বেঁধে যে-গভীর আনন্দ পেয়েছিল সে-আনন্দ আমার কাছে শুধু যে আদরণীয় হয়েছে তাই নয়, আমার জীবনের বিকাশেও কম সহায়তা করে নি।

দশ

গত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি আমার ঘটকালির কথা। স্মৃতিকথায় এ-প্রসঙ্গ নিয়ে বলা সব দিক দিয়েই শোভন যেহেতু এ-স্থত্রে আমি কবির হৃদয়বত্তার প্রমাণ পেয়েছিলাম প্রতি ঘটকালির সময়েই।

কবির কাছে আমি তুলতাম তাঁদেরই প্রসঙ্গ যাঁরা আমার মন টানতেন। তাঁকে লিখেছিলাম বিলেত থেকে রোলাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত ক'রে যাতে রোলাঁ আমাকে দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন যে কবি ফ্রান্সে এসেও তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রেই চ'লে গেলেন!

কবিকে লিখেছিলাম: "রোলাঁ লিখেছেন তিনি আপনার অকৃত্রিম বন্ধু, তাই চান আপনার দর্শন।" এরপরে কবি গিয়েছিলেন তাঁর কাছে, যে-শুভদৃষ্টির কথা রোলাঁ তাঁর "জুর্নাল"-এ বেশ ফলিয়েই বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে রোলাঁর কাছে

গিয়ে আমি করতাম রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধিজির গুণকীর্তন—যার কিছু আভাষ "তীর্থংকর"-এ আছে। এর ফল ফলত আমার মনে বিচিত্রভাবে—আমি দুপক্ষেরই স্নেহ পেতাম বেশি ক'রে—যাকে বলতে পারি আমার উপ্‌রি লাভ।

বলতে মনে পড়ল সুভাষের কথা—কী ভাবে সুভাষের সঙ্গে কবির সংযোগ ঘটিয়েছিলাম যখন সুভাষ ছিল মান্দালয়ের জেলে। সুভাষ সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে তেমন ঝোঁকে নি, অথচ আমার আগ্রহ ছিল যাতে সে বোঝে তাঁর মহিমা, পায় তাঁর মধুর স্নেহ। তাই সুভাষ যখন আমাকে মান্দালয় থেকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখে—যেটি "অনামী"তে ছাপা হয়েছে—সে চিঠিটি আমি কবিকে পাঠাই। তাতে কবি অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। এটিও "অনামীতে" ছেপেছি ব'লে এর খানিকটা উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব। কবি লিখেছিলেন আমাকে :

"তোমার চিঠিখানা কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর··· তার বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা বলেছে তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চ শিখর।"

ফের এসে গেল আশ্চর্য উপমা—অম্‌নি শিখরের সঙ্গে এল মেঘ, কবি ফুটিয়ে তুললেন যুগল-ছবি যার সঙ্গে মাটিও দেখা দিল—তিনে এক একে তিন—কিন্তু যেহেতু ভাবের শিখর উচ্চ ব'লেই দুরারোহ, সেহেতু—

"সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে উঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে ব'লেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বর হ'য়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এম্‌নি ক'রেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না।"

কিন্তু হাল আমলে একটা ধুয়ো উঠেছে যে যা সবাই এখনি এখনি না বুঝতে পারছে তা সেরা আর্ট নয় তাই বড় শিল্পী বলা হোক তাকেই যে এখনি এখনি সর্ব-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করতে পারবে—এরই নাম যে বর্তমান যুগের সেরা উপাস্ত—ডিমক্রাসি। কিন্তু কবি স্বধর্মে কবি ছিলেন বলেই জানতেন হাড়ে হাড়ে যে সর্বজন-বোধ্যতার আদর্শে আর্টের ভরাডুবি কেন না—

"যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায়, তাহ'লেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে।"

এ-কথা কবি চিরদিনই বলতেন যে লিখতে হবে অন্তরের তাগিদে। বাইরের

তাগিদে লিখলে লেখক হবেনই হবেন স্বধর্মভ্রষ্ট—আশু সর্ববোধ্য হবার আদর্শ একটা আদর্শই নয়—আলেয়া মাত্র। শিল্পীর আদর্শ—চিরন্তনের সভায় পাঠানো—সাময়িক সাফল্যের হরিলুট কুড়োনো নয়। কেন—বলছেন এর পরেই ফের উপমা দিয়ে—সকলের অধিকার বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা ক'রে—

"(অন্তর্যামীর) সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরী করতে পারে, তাহ'লে আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হ'লেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে—ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে-ফুল ফোটে সে-ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে, একথা কেমন ক'রে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকরই মন সায় দিলে না ব'লেই কি তাকে দোষ দেব? বলব, তুমি কুমড়ো হ'লে না কেন? বলব কি, গরীবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা—সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হ'য়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগ যুগান্তর ধ'রেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা ক'রে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা না করে।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হ'য়ে গেল উপমার টানে। কিন্তু আর না, সমস্ত চিঠিটি যাঁরা পড়তে চাইবেন তাঁরা যেন "অনামী"র পাতা উল্টিয়ে দেখেন।

এ-সম্পর্কে একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ল। অনেকদিন আগে প্রথম শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবির কল্পনায় উপমার অপর্যাপ্তির দিকে। তিনি বলেছিলেন এই ধরনের একটি কথা: "কবির প্রতিভা দেখে আমার মনে অনেক সময়েই অবাক্ লেগেছে—আমরা যা দেখি তিনিও তাই দেখেন, কিন্তু সেই সব বিশ্লিষ্ট জিনিসের মধ্যে একটা ঐক্য দেখতে পান যাকে ফোটান তাঁর প্রতিভালব্ধ উপমার মধ্যে দিয়ে।"

কোথায় পড়েছিলাম এই কথাই আর এক ভাষ্যে। ভাবুক লিখেছিলেন: "একই ঘটনা দেখি আমরা সবাই, কিন্তু বড় বৈজ্ঞানিক সে-ঘটনার মধ্যে একটা ঋতের (law) আভাষ পান ব'লেই তাঁকে বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা বলি। যেমন গাছ থেকে ফল পড়া আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু আমরা সবাই যেখানে ফলটি পড়া মাত্র ছুটে খেতেই ব্যগ্র হই, সেখানে নিউটন গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেন—ফলটি পড়ল কেন—না পড়লেও ত পারত? অর্থাৎ অভ্যাসকে

ডিঙিয়ে যেতে পারেন তিনি প্রতিভার তাগিদে। এ-তাগিদ না থাকলে নিউটন নিউটন হ'তেন না—আমাদেরি মতন আপেলটি পড়লে খেয়েই আহ্লাদে আটখানা হ'তেন।"

কথাটি যখন পড়েছিলাম তখন উপমা সম্বন্ধে প্রশান্তর চিন্তাশীল মন্তব্যটি মনে পড়েছিল ব'লেই লিখলাম, আরো এই জন্যে যে, কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই অনন্যতন্ত্র প্রাতিভ দৃষ্টি ছিল ব'লে এ-দুই মন্তব্যকে সগোত্র মনে করা চলে। কিন্তু এবার ফিরে যাই স্মৃতিচারণের হারানো খেই ধরতে।

পণ্ডিচেরি আশ্রমে গিয়ে নির্জনবাসের মধ্যেও আমার স্বভাব আমাকে রেহাই দেয় নি। তাই কবিকে শুধু যে অনর্গল নিজের নানা সমস্যার কথা লিখতাম তাই নয়, লিখতাম তাদের কথাও পাতার পর পাতা যাদের কবিত্ব বা চিন্তাশীলতা আমাকে আনন্দ দিত: যথা বুদ্ধদেব বসু, আশালতা, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটি, মোহিতলাল ইত্যাদি। শ্রীবুদ্ধদেব বসুর লেখা সে-সময়ে আমার সত্যিই ভালো লাগত—বিশেষ ক'রে তাঁর "বন্দীর বন্দনা"-র নানা কবিতা—যেজন্যে মোহিতলাল আমাকে লেখেন রুক্ষ হ'য়ে যে বুদ্ধদেবের লেখা যার ভালো লাগে তার সঙ্গে পত্রব্যবহার তিনি পণ্ডশ্রম মনে করেন। আমি মোহিতলালের কবিত্ব ও চিন্তাশীলতার অনুরাগী হ'লেও তাঁর অসহিষ্ণুতায় বিস্মিত হ'য়ে কবিকে বুদ্ধদেবের "বন্দীর বন্দনা" পাঠাই কবির মত জানতে—মোহিতলালের অসহিষ্ণুতার জন্যে দুঃখ ক'রে। কবি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন ও বুদ্ধদেবের কবিতার প্রশংসা ক'রে আমাকে পুলকিত করেন। এইভাবে একবার আমি অতুলদার কয়েকটি গানও কবিকে পাঠাই ও সে-গানগুলি কবির ভালো লাগলে পর সানন্দে সে-কথা জানাই অতুলদাকে।

এ দৃষ্টান্তগুলি দিচ্ছি আত্মগুণগান করতে নয়—(তাছাড়া এ কী-ই বা এমন কীর্তি যাকে নিয়ে আত্মশ্লাঘা করা মানায়?)—বলছি একটি বিশেষ কারণে:

আমার এক বিশেষ ভক্তিভাজন শুভার্থী আমাকে বলেন: "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছ হে, ঘা খাবে। উনি প্রতিভাধর, কিন্তু স্নেহশীল নন। উনি স্নেহ করেন বুদ্ধি থেকে, হৃদয় থেকে নয়—এ-কথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে।" পরে আর এক নামকরা প্রবীণ কবিও আমাকে বলেন এই কথা।

তখনো কবির সঙ্গে আমার তেমন কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধন গ'ড়ে ওঠে নি, তবু

আমি তাঁদের সঙ্গে তর্ক করেছিলাম, মনে আছে। বলেছিলাম: কবির সবচেয়ে বড় সম্পদ হৃদয়বৃত্তি; স্নেহ প্রীতি হ'ল হৃদয়বৃত্তির পরম প্রকাশ, কাজেই যে-লোক স্নেহপ্রীতির সম্পদে দেউলে সে সরস কাব্য সৃষ্টি করবে কেমন ক'রে? এ-যুক্তির উত্তরে তাঁরা উভয়েই বলতেন একই কথা: যে, কল্পনার খানিকটা মায়াশক্তি আছে যার কুহকে সে নয়-কে হয় করতে পারে। তাছাড়া—বলেছিলেন তাঁরা—স্নেহ না ক'রেও স্নেহের সাধনীয় সেবা শুশ্রূষা কর্তব্য বোধে করা চলে—রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ছিল এই জাতীয় কর্তব্যবোধ-প্রসূত, কিনা ইনটেলেকচুয়াল।

আমার বয়স তখন অল্প হ'লেও আমি টের পেয়েছিলাম যে তাঁরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোথাও না কোথাও ঘা খেয়েছিলেন ব'লেই এমন অদ্ভুত যুক্তি খাড়া ক'রে কবিকে হৃদয়হীন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটুকু বুঝলেও দু-জন প্রবীণের মুখে একথা শুনে বেশ একটু চম্‌কে গিয়েছিলাম বৈকি। আশ্চর্য হ'য়ে ভাবতাম: রবীন্দ্রনাথ স্নেহশীল নন এ কেমন কথা?—যিনি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন অপূর্ব তর্পণ যা পড়লে আজও চোখে জল আসে:

সখা, আজ হ'তে হায়
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে'; অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

কিংবা অতুলপ্রসাদের তর্পণে:

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত হৃদয়ের সদাব্রত
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।...

আমারো যাবার কাল এলো শেষে আজি,
"হবে হবে দেখা হবে"—মনে ওঠে বাজি',

সেখানেও হাসিমুখে বাহু মেলি' লবে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে তিনি কী গভীরভাবেই না ভালোবেসেছিলেন—১৯৩৫-এ লিখেছিলেন :

তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য যে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

আর শুধু কবিতার অর্ঘ্যই তো নয়, বন্ধুর জন্যে তিনি কি ত্রিপুরার মহারাজের কাছে ভিক্ষা ক'রে পনের হাজার টাকার চেক পাঠান নি যাতে বন্ধু নিশ্চিন্ত মনে গবেষণা করতে পারেন?

কিন্তু তাঁর স্নেহশীলতার এর চেয়েও বড় প্রমাণ আমার কাছে পরে মূর্ত হয়েছিল আমার নিজেরি হৃদয়ের তথা দৃষ্টির সাক্ষ্যে। দিনের পর দিন দেখেছি কত লোককে তিনি সস্নেহে ডেকে শুনেছেন তাদের কত দুঃখের কথা, দিয়েছেন কত উপদেশ! শুধু বিশ্ববিশ্রুত মনীষীদের প্রশাস্তিই তো নয়—তাঁর নিজের ভাষায়, "আদর করিতে জানা অনাদৃত জনে"—যে-কথা শ্রীবুদ্ধদেব বসু কবির মহাপ্রয়াণের পরে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে বিশদ ক'রেই লিখেছিলেন। তাতে ছিল এই ধরনের একটি কথা যে বাংলা দেশে খ্যাত বা অখ্যাতনামা কোন্ লেখক বা শিল্পী আছে যে তাঁর উদার প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? কথাটি সত্য : বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিহারীলাল থেকে আরম্ভ ক'রে অত্যাধুনিক নগণ্যতম গুণী কর্মী ও কবিযশঃ-প্রার্থীকেও তিনি কদাচ পারৎপক্ষে ফিরিয়ে দেন নি খালি হাতে। বটে, কিন্তু স্নেহশীলতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ বোধহয় স্নেহভাজনের শত অপরাধ ক্ষমা করা স্নেহের সহজ টানে। এইখানেই আমার মতন সামান্যের এজাহারের মূল্য যে আমাকে তিনি গভীরভাবে স্নেহ করেছিলেন ব'লেই আমাকে বার বার ক্ষমা করেছিলেন—আমি ঝোঁকের মাথায় তাঁকে বার বার আঘাত করা সত্বেও। আজ

একথা ভাবতে আমার অনুশোচনার অবধি থাকে না যে তাঁর সঙ্গে (তথা আমার আরাধ্য গুরুদেবের সঙ্গেও) কতবারই না উদ্ধত হ'য়ে তর্ক করেছি, অণীয়ান্ হ'য়ে মহীয়ানের কাছে যুক্তি জাহির করতে গেছি। কিন্তু কবি বা গুরুদেব কোনোদিনই আমার ভ্রান্ত ঔদ্ধত্যকে বড় ক'রে দেখেন নি। তাঁরা যে ছিলেন জ্ঞানী তাই জানতেন যে শুধু যে আমাদের স্বভাব সহজে বদ্‌লায় না তাই নয়—যৌবন জন্মান্ধ, মদমত্ত। তাছাড়া তিনি শুধু তো কবিই ছিলেন না ছিলেন দরদী, তাই মনে মনে জানতেন—কেন আমি অন্তরে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করা সত্বেও বাইরে সব সময়ে তাঁর মর্যাদা রাখতে পারি নি। আমি বুঝি নি, কিন্তু তিনি বুঝতে বেগ পান নি কোনোদিনই যে মানুষের ঝোঁকালো স্বভাব ও নিহিত অহমিকা অনেক সময়েই তাকে দিয়ে এমন অনেক কথা বলিয়ে নেয় যাতে তার শ্রদ্ধালু অন্তর আদৌ সায় দেয় না। তিনি আমার এই শ্রদ্ধালু অন্তরের ভক্তি অর্ঘকেই স্বীকার করেছিলেন আমার বাইরের মূঢ় বাগ্মিতাকে নাকচ ক'রে। তাই আমাকে লিখেছিলেন সে কবে—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে —যখন আমি ছিলাম যৌবনমদান্ধ যুবক :

"সঙ্গীত সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতের যদি অনৈক্য থাকে তা নিয়ে সংকোচ বোধ কোরো না। পৃথিবীর ভূগোল-সংস্থানে পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্রের যদি অনৈক্য নিয়ে ঝগড়া হ'ত তাহ'লে জীবজন্তু টিঁকতে পারত না। আর যদি পাহাড়ে সমুদ্রে কোনো অনৈক্যই না থাকত তাহ'লে সেই মরুবসুন্ধরায় টেঁকা আরো দায় হ'ত। মানুষের মানস জগতে মতের অনৈক্য থাকবে অথচ সেই অনৈক্য নিয়ে বিরোধ হবে না, সংঘাত হবে কিন্তু অপঘাত হবে না—এইটেই হচ্ছে প্রার্থনীয়। তুমি সঙ্গীততত্ত্ব নিয়ে আমার প্রতিবাদ করলেও আমি বিবাদ করব না একথা নিশ্চয় জেনো। মতের সম্বন্ধ না থাকলেও প্রীতির সম্বন্ধ থাকতে পারে, এটার দ্বারাই প্রীতির গৌরব প্রকাশ পায়।" (তীর্থংকর)

এর পরেও আমি কতবারই তাঁর উদার প্রশ্রয়ের সুবিধা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করেছি—এবং দু'একটি ছাড়া প্রায় সবক্ষেত্রেই আমার ভ্রান্ত ধারণাকেই রোখ ক'রে সত্য ব'লে প্রমাণ করতে চেয়েছি। একটি ক্ষেত্রে কেবল আমার ধারণা ভুল ছিল না ব'লে আমি আজো বিশ্বাস করি : যে, বাংলা গানে সুরবিহার—অর্থাৎ তানবিস্তারের স্বাধীনতার পথ খোলা রাখা দরকার। কিন্তু এখানেও আমার কাঁচা বুদ্ধির পল্‌কা অভিজ্ঞতা ধোপে টিঁকবে

কি না এ-জিজ্ঞাসা আমার মনে ওঠা উচিত ছিল নিশ্চয়ই। মনে মনে আরো গভীরভাবে সচেতন হ'য়ে ওঠা উচিত ছিল বৈ কি যে তিনি তাঁর সঙ্গে সমানে তর্কাতর্কি করার অধিকার দিলেও আমার পক্ষে সে-অধিকারে উল্লসিত হ'য়ে ওঠা স্পর্ধারই সগোত্র।

"আরো গভীরভাবে সচেতন হ'য়ে ওঠা" বলছি এইজন্যে যে, সময়ে সময়ে যখন আমার দৃষ্টি খুলে যেত দেখতে পেতাম তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধি—কিন্তু আবার "দৈবী মায়া"-র মোহে প'ড়ে ঝাপ্‌সা দেখতাম—অম্‌নি তর্ক সুরু করতাম আমার বিজ্ঞতাকে জাহির করতে। এতে তিনি দোষ দেখতেন না এ তাঁর মহত্ত্ব—আমার নিজের আচরণকে তাঁর ক্ষমার সাফাইয়ে নির্দোষ বলা যায় না। তবে আমার একটা বাঁচোয়া ছিল এই যে, সত্যকে সত্য ব'লে চিনবামাত্র মেনে নিতে আমার বাধত না। তাই বারবারই তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে চম্‌কে উঠেছি শুধু তাঁর বুদ্ধির ঝকঝকে তীক্ষ্ণতা দেখে নয়—আরো বেশি তাঁর অনুভব শক্তির গভীরতায় অভিভূত হ'য়ে। তাই তো আমাকে ঘড়ি ঘড়ি এত বেশি আপশোষ করতে হ'ত তাঁর সঙ্গে কুতর্ক করার পাকামির পরেই। তখন লিখতাম তাঁকে ফের অনুতপ্ত হ'য়ে যে ঝোঁকই আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে যা আদৌ আমার মনের কথা নয়। কিন্তু ঝোঁকালো স্বভাবের বালাই তো কম নয়, তাই বার বার ভুল ক'রে অনুতপ্ত হ'য়েও ফের ঝোঁকের বশে সেই এক ভুলই করতাম ফিরে ফিরে।

একবারের কথা বেশ মনে পড়ে। সঙ্গীত নিয়ে কোনো তর্কে আমি একবার খুব জোর দিয়েই বলি আমার নানা ধারণা। কবি তখন শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের অতিথি হ'য়ে আলিপুরে আসীন। প্রশান্ত আমাকে খুব ধম্‌কে দেয়। আমি তাকে শুধু যে মনস্বী ব'লে সমীহ করতাম তাই নয়, শুভার্থী বন্ধু ব'লেও বরণীয় মনে করতাম। তাই প্রশান্তর তিরস্কারে আমার চৈতন্য হ'তেই কবিকে লিখি যে প্রশান্তর ভর্ৎসনা আমি মাথা পেতে নিয়েছি—এখন থেকে আমি আর কোন হঠকারিতা করব না—"চুপ্‌টি ক'রে থাকব ব'সে মুখটি ক'রে ভার"—প্রাণ গেলেও বলব না আর যা আমার প্রাণ চায়—কবির সঙ্গে সমীহ ক'রে ভেবেচিন্তে কথা কইব—তাঁর মর্যাদাহানি করব না আর কিছুতেই—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি :

কবি উত্তরে লেখেন : "তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। তোমার মধ্যে যে একটি বিশুদ্ধ সত্যপরতা ও সারল্য আছে তাতে আমার হৃদয়কে

আকর্ষণ করে। আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহারে যদি সেই সত্যের কোনো বিকার দেখতুম তাহ'লে সেই ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিত। কখনো তা দেখি নি। অতএব আমার সম্বন্ধীয় কোনো কথায় তুমি মনে সংকোচ বোধ কোরো না। আমার সম্বন্ধে তুমি যা কিছু আলোচনা করেছ তার কোথাও আমি দাম্ভিকতা দেখি নি। লোকের কথা শুনে যদি তুমি ব্যস্ত হ'য়ে ওঠো তাহ'লে তোমার স্বাভাবিকতা খর্ব হ'তে পারে। তুমি সহজ মনে যা বলবে যা করবে তাতে দোষ স্পর্শ করবে না।···ইতিমধ্যে যদি একবার দেখা দিয়ে যাও তাহলে খুসি হব।" (তীর্থংকর)

সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গী যদিও সব মহৎ মানুষই সহিষ্ণু নন। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই যখন হিমালয়ের তুঙ্গতার সঙ্গে ধরণীর সহিষ্ণুতার রাজযোটক হয় তখন মন মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। কিন্তু কবি সহিষ্ণু হ'লে হবে কি, তাঁর কাছে যাঁরা থাকতেন তাঁরা সইতে পারতেন না। এঁদের মধ্যে সবাই যে আমাকে ঈর্ষা করতেন তা নয়—কিন্তু ভুল বুঝতেন নিশ্চয়ই যখন ভাবতেন আমি কবিকে তেমন ভক্তি করি না। তাই আমি মাঝে মাঝেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে তাঁকে লিখতাম যে শুনেছি অমুক আপনাকে বলেছে আমার সম্বন্ধে এই কথা, অমুক এই কথা—এসব সত্য নয়···ইত্যাদি।

সম্ভবত এই নিয়ে একবার ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও তাঁকে কিছু লিখে থাকবেন, কেন না আমাকে তিনি স্নেহ করতেন আমার হঠকারিতা সত্ত্বেও। তার উত্তরে কবি তাঁকে লেখেন (শুক্লা একাদশী, ১৩৩৫): "মণ্টুকে আমি বেশ ঠাণ্ডা রকম চিঠিই লিখেচি। তার কারণ ওকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। সব সময়ে ওর বুদ্ধি স্থির থাকে না···কিন্তু ওর মনটি খুব সরল, এবং ওর মধ্যে যে-ভালোটুকু আছে সে খুব অকৃত্রিম। ওকে যারা কথায় কথায় গালমন্দ দিয়ে থাকে ও তাদের চেয়ে অনেক উপরের লোক।" (চিঠিপত্র—৫)

এ চিঠিটির ভূমিকা ঠিক কী আমি জানি না—তবে এই সূত্রে কবির মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলার সদুদ্দেশ্যে যদি কয়েকটি কথা লিখি তবে মনে হয় কবির অনুরাগীরা খুসি হবেন আরো এইটুকু জেনে যে আমি কবিকে সময়ে সময়ে আঘাত দিয়েছি না জেনেই, আমার মনে তাঁর প্রতি ভক্তি অগভীর ছিল ব'লে নয়। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা করতে হবে।

সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে মহৎ মানুষরা তাঁর পার্ষদদের দ্বারা

প্রভাবিত হন : সব মানুষই হয়—তবে মহাজনেরা অনেককে কাছে টানেন ব'লে তাঁদের চারপাশে সময়ে সময়ে একটা আবহ গ'ড়ে ওঠে যাকে ভেদ ক'রে তাঁর কাছে পৌঁছনো ভার হ'য়ে ওঠে।

আমাকে কবি স্নেহ করতেন তাঁর স্বভাবের সহজ ঔদার্যেই বটে : কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কবিকে আমি গভীরভাবে ভক্তি করতাম ব'লেই তাঁর কাছে আসতে চাইতাম—কোনো ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে নয় : কবি একথা জানতেন, কিন্তু তাঁর পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে নানা ইঙ্গিতে বলতেন যে আমি কবির বিরুদ্ধে তাঁর অসাক্ষাতে অনেক কিছু ব'লে থাকি। কবি জানতেন যে আমি ঋজু স্বভাবের মানুষ, যা ভাবি ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলি, কিন্তু কুচক্রী বা নিন্দুক নই। ভক্তি শ্রদ্ধা আমার সহজাত সম্পদ হ'য়ে এসেছে আশৈশব—আমার অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যও তাদেরকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর আশপাশের কয়েকজন এমন কয়েকটি অপবাদ তুললেন যার ফলে কবি যেন খানিকটা বাধ্য হ'য়েই বিশ্বাস ক'রে বসলেন যে আমি কোনো এক পত্রে তাঁর সম্বন্ধে অপমান-সূচক মন্তব্য করেছি। ব্যাপারটা হ'ল এই যে আমি তাঁকে সরল ঠাট্টার সুরে একটি চিঠি লিখেছিলাম—সেটি কবির হাতে পৌঁছয়ওনি—কেবল তাঁর একটি প্রিয়পাত্র তাঁর কাছে আমার সে-চিঠিটির খানিকটা মাত্র উদ্ধৃত ক'রে বলেন—এইই দিলীপের নিজমূর্তি। ফলে কবি আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করেন—আমি চিঠি লিখলে অপঠিত অবস্থায় ফিরে আসত।

এর পরে আমি কলকাতায় এসে কথায় কথায় প্রশান্ত ও রাণীমাসিকে বলি আমার দুঃখের কথা। প্রশান্ত ও রাণীমাসি আমার নানা দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে আমাকে মাঝে মাঝে সচেতন ক'রে দিলেও জানত যে কবিকে কোনো পত্রে অপমান করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ—অসম্ভব। রাণীমাসি কবিকে গিয়ে বলে যে আমার প্রতি তিনি অবিচার করেছেন এক নিন্দুকের কথায় কান দিয়ে। শুনবামাত্র স্বভাবমহৎ কবি আমাকে লেখেন বোলপুরে আসতে।

কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে কি না জানি না সে-চিঠি আমার কাছে পৌঁছয় নি। ফলে আমার বোলপুরে যাওয়া হয় নি। রাণীমাসি কেন গেলাম না জিজ্ঞাসা করায় বললাম কবি তো যেতে বলেন নি। রাণীমাসি বরাহনগর থেকে কবিকে লেখে তৎক্ষণাৎ। উত্তরে কবি লেখেন (তীর্থংকর ২০২ পৃঃ) :

"অকৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গেই তোমাকে আমন্ত্রণ করেছিলুম। রাণীর চিঠি থেকে জানতে পেরেছি সেটাতে লাগল অপঘাত। অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছি। পথের মধ্যে যদি কোনো অন্যায় হ'য়ে থাকে"—(সম্ভবতঃ এর অর্থ এই যে যাকে চিঠি ডাকে দিতে দিয়েছিলেন সে যদি ডাকে না দিয়ে থাকে)—"আমার তাতে হাত ছিল না একথা নিশ্চয় জেনো। যে-কারণেই হোক তোমার মনে যে-ধারণা জন্মেছে সেটা একবারেই অমূলক একথা জানিয়ে দিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে খুসি হতুম, এ নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আন্তরিক সত্যের বিরুদ্ধে বাহিরের যুক্তি প্রবল হ'লেও সকল সময়ে প্রামাণ্য হয় না একথা মনে রেখো। (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৪)" [তীর্থংকর]

কিন্তু এ-চিঠি আমি কলকাতায় পাই নি·কেন না আমি তখন কলকাতার বাইরে ছিলাম। পরে যখন পণ্ডিচেরিতে ফিরি তখন এ-চিঠিটি আমার হাতে পৌঁছয়। তখন ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তাঁকে আমি তার করি—জানিয়ে কেন তাঁর কাছে বোলপুরে যাওয়া হয় নি। উত্তরে কবি লেখেন (৩১ শ্রাবণ, ১৩৪৪—তীর্থংকর ২০২ পৃঃ)

"বহুকাল পরে তুমি এদিকে এসেছিলে আবার ফিরে গেছ পণ্ডিচেরীতে। কেবল দেখা হ'ল না ব'লেই যে আমার দুঃখ তা নয়, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যে স্নেহের সেটা প্রকাশ করার প্রত্যক্ষ সুযোগ ঘটল না এইটেতেই আমি ব্যথিত হয়েছি।

"হয়ত তোমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে আমার মতের বা রুচির মিল নেই এবং কখনো কখনো আমি তোমার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়ে থাকব, কিন্তু এ-সমস্তই বাহ্য। আমি নিজে খুসি হই যখন আবিষ্কার করি তোমার প্রতি আমার স্নেহের বিকার ঘটে নি। মাঝে মাঝে যখন কোনো কারণে রাগ করেছি তখন সেটা আমাকে ব্যথা এবং লজ্জা দিয়েছে। এবার অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্যে এবং অন্য বাধায় তোমাকে যে কাছে আনতে পারি নি তার বেদনা মনে রয়ে গেছে। আজকাল শরীর ক্লান্ত এবং মন কর্মবিমুখ থাকে, সেইজন্যে বাহিরের ব্যবহারে কৃপণতা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে তাই আমাকে ভুল বুঝো না।"

এরপরে কেমন ক'রে মেনে নেব কবির স্নেহ ছিল ইনটেলেকচুয়াল বর্গীয়—হৃদয়ের উৎস থেকে যার উদ্ভব নয়? তীর্থংকরে এরকম সাগ্রহ ও সানুরোধ পত্র আরো কয়েকটি ছাপিয়েছি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলতে। আমাকে স্নেহ করতেন ব'লেই যে তিনি আমার কাছে অকারণ

নিজেকে অত অপরাধী মনে করেছিলেন এ-কথা ব'লে বোঝাবারও প্রয়োজন দেখি না। শুধু একটি কথা বলি—কবির মতন বিশ্ববিশ্রুত মহাজনের কী আসত যেত যদি মাদৃশ অভাজন তাঁকে ভুল বুঝে দূষত? কিন্তু আমি তাঁর কোনো পার্ষদের চক্রান্তে মনে আঘাত পেয়েছি ব'লেই তিনিও অন্যের অপরাধের জন্যে নিজে নত হ'য়ে আমাকে এত ক'রে পাঠিয়েছিলেন তাঁর উদার হৃদয়ের সস্নেহ আমন্ত্রণ। এ-শ্রেণীর মহত্ত্ব এ-তেল-নুন-লকড়ির দিন দুনিয়ায় কি বেশি দেখা যায়?

এ-সূত্রে একটি সত্য আজ চোখে পড়ে যা সে-সময়ে চোখে পড়ে নি, পড়লে হয়ত কবিকে বার বার আমি এত ভুল বুঝতাম না তাঁর পার্ষদদের আচরণের জন্যে দায়ী ক'রে। সত্যটি এই যে, মহৎ মানুষের মাথা গড়পড়তাদের চেয়ে উঁচু ব'লেই তারা তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। চণ্ডীতে এই কথাই বলা হয়েছে একটু অন্যভাবে যে যারা জগন্মাতার আশ্রয় পায় শুধু তারাই আর পাঁচজনের আশ্রয় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে: "ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি।" একথা শুধু অধ্যাত্ম জগতের সম্বন্ধেই-নয়—বাস্তব জগতের সম্বন্ধেও সমান খাটে। যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা নানা লোককেই আশ্রয় দেন নানাভাবে: ধনী দেন ধনের আশ্রয়, পদস্থ রাজপুরুষ দেন চাকরির, জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক কনিষ্ঠদের আনুকূল্য করেন পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে, শ্রেষ্ঠী সামান্য বণিকদের ভরসা দেন পাশে দাঁড়িয়ে···ইত্যাদি। কবির প্রতিভা ছিল বহুমুখী, তাই রকমারি লোক তাঁকে খুঁটি ক'রে ধ'রে দাঁড়াত। এহেন মানুষ সচরাচর ঈর্ষান্বিত হয়ই হয় "অপরে কেন তাঁর দিকে ঘেঁষবে আমাকে ডিঙিয়ে? না না ও কাজের কথা নয়, অপরে বেশি ভিড় করলে যদি খুঁটিটি আমার আলগা হ'য়ে যায়—" এই জাতীয় ঈর্ষা। কিংবা এমনও হয় প্রায়ই: "আমিই হব প্রভুর প্রথম বাহন, আর সবাইকে আমার সুপারিশের কাছেই হাত পাততে হবে যদি কেউ তাঁর নাগাল পেতে চায়—আমি যাকে রেকমেণ্ড করব সেই কেবল পৌঁছবে তাঁর কাছে।" উত্তর জীবনে দেখেছিলাম গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দকেও অনেক সময় ভুগতে হ'ত এই শ্রেণীর পাণ্ডা ভক্তকে নিয়ে—একবার তিনি তাঁর এক পাণ্ডার এই ধরনের আবদারে উত্যক্ত হ'য়ে করুণ হেসে আমাকে লিখেছিলেন: "Surely I too have a right to a private groan!" তখন আমি কবির অবস্থা প্রথম দেখতে শিখি দরদের দৃষ্টিতে, বুঝি যে কবি মহাজন ছিলেন ব'লেই অভাজন সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করত ও যারা নিজেদেরকে মনে করত তাঁর

অন্তরঙ্গ তারা মাদৃশ বহিরঙ্গ উমেদারকে খেদিয়ে নিজেদেরকে অচলপ্রতিষ্ঠ করতে চাইত। আর যেহেতু এ শ্রেণীর অভাজনদের মতিগতি মহাজনদের উল্টো, সেহেতু তারা মহাজনদের খানিকটা টেনে নামাবেই তাদের নিজেদের স্তরে—নৈলে তারা মহাজনকে পুরোপুরি আপন মনে করতে পারবে কেন?

মহাজনরা এ-সত্যটি জানলেও স্বভাবে মহৎ হওয়ার দরুণই চট্ ক'রে অভাজনদের অবিশ্বাস করতে না পেরে বিপন্ন হন। পক্ষান্তরে অভাজনরা অভাজন ব'লেই বোঝে না যে মহাজনকে মহাজনের স্তর থেকে নামিয়ে আনলে সবচেয়ে বেশি লোকসান হয় অভাজনদেরই। কীভাবে—বোঝাতে কবি আমার কাছে একাধিকবার দুঃখ করেছেন এই বলে: "যারা মাথায় ছোট তারা একটা ভুল করে প্রায়ই—ভুলে যায় যে, যাকে ধ'রে উঠব তাকে খাটো করলে সে হবে যে-ডালে বসেছি তার গোড়ায় কোপ দেবারই সামিল।" কিন্তু হ'লে হবে কি, ছোট স্বার্থবুদ্ধি স্বভাবে আত্মঘাতী ব'লেই বোঝে না যে, স্বার্থবুদ্ধি আনে পরম অন্ধতা, আর এমন কোনো আলোই নেই যে পারে অন্ধকে দিশা দেখাতে।

কিন্তু অজ্ঞানী জ্ঞানীর ছন্দে চলে না একথা জ্ঞানীরা জানেন ব'লেই অজ্ঞানীদের 'পরে তাঁদের এত করুণা: "আহা, ওদের যে আজো চোখ ফোটে নি, পথের নির্দেশ পাব কোত্থেকে?"—এই অনুকম্পার বশবর্তী হ'য়েই কবি নিত্যনিয়ত অভাজনদের হাজারো আবদার শুনতেন—তারা তাদের ছোট ছোট দাবির হুলে তাঁর অমূল্য অবসর সময়কে শতচ্ছিদ্র করা সত্বেও তাদের খালি-হাতে ধুলো-পায়ে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না।

শুধু দাবি হ'লেও ব্যাপারটা হয়ত তত মারাত্মক হ'ত না, কিন্তু তারা চাইত আর কেউ যেন দাবি না করে—করলে তারা কবিকে সাধ্যমত আড়াল ক'রে রেখে নবাগতদের নিরুৎসাহ করত কবির মানরক্ষী দ্বারীর মতন হ'য়ে। ফলে জড়ো হ'য়ে উঠত হাজারো ভুল বোঝার হানাহানির জঞ্জাল যাদেরকে শেষটায় কবির নিজে হাতেই সাফ করতে হ'ত, লিখতে হ'ত চিঠির পরে চিঠি পার্ষদদের দোষের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে। মনে আছে তাঁকে আমি একবার এই নিয়ে সপরিহাসে বলেছিলাম: "আপনার দুরবস্থা দেখলে আমার সময়ে সময়ে ভাগবতের নারায়ণের কথা মনে পড়ে—সে গল্প নিশ্চয়ই জানেন: সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার এই চার মহামুনি বৈকুণ্ঠে এসেছিলেন নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর দুই দারোয়ান জয় ও বিজয় পথ আগলে মুনিদের বেত মারল। মুনিরা তাদের শাপ

দিলেন—'তোমরা পৃথিবীতে খ'সে পড়ো—জন্মাও দৈত্য হ'য়ে।' নারায়ণ গোলমাল শুনে ছুটে এসে হাত যোড় ক'রে মুনিদের কাছে বললেন: 'ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা, তাই আমার দ্বারী দুটির অপরাধের জন্য দায়িত্ব অঙ্গীকার ক'রে আমিই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।'* কবি হেসে বলেছিলেন: "জানি হে, কেবল কলিযুগের আর এক মুস্কিল এই যে দ্বারীদের ধরতে এলে তারা ফস্কে যায়।" সব খেদকেই কবি এইভাবে তরল করে নিতেন তাঁর স্নিগ্ধ পরিহাসের দ্রাবকে। কিন্তু কেন যে তিনি খেদ করতে বাধ্য হতেন—আমি সে সময়ে সত্যিই বুঝতে পারি নি—বুঝি অনেক পরে—শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে এসে। তখন দেখতে পাই যে বহু অভাজনের দায়িত্ব বহন করতে পারাটাও মহাজনের মহত্ত্বের একটি অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু বলি যা বলছিলাম।

নারায়ণের এ-হেন দ্বারীর মতনই তাঁর এক দ্বারী একবার আমাকে খেদিয়ে দেন। আঘাত পেয়ে কবিকে ভুল বুঝে আমি একটু উষ্ণ হ'য়েই কবিকে লিখি যে আমি জনতা ভেদ ক'রে কবির প্রিয়পাত্র হ'তে চাই নে—কবি যাদের কাছে টেনেছেন তাদের নিয়েই থাকুন—আমি বিদায় নিলাম—আরো এইজন্যে যে আমি চাই তাঁর প্রতি আমার ভক্তিকে অক্ষত রাখতে—তাঁকে পত্রে আঘাত দেওয়ার জন্যে যেন কবি ক্ষমা করেন···ইত্যাদি। কবি ব্যথা দিয়ে আমার ব্যথা বুঝে আমাকে তৎক্ষণাৎ লেখেন:

"একটি কথা বলতে চাই—আমি তোমাকে গভীরভাবেই স্নেহ ক'রে এসেছি। আজ কোনো কারণে তার অপঘাত ঘটবে এমন আশঙ্কামাত্র নেই। আমি কোনোদিন আঘাতের স্মৃতি স্নিগ্ধজনের বিরুদ্ধে মনে টাঙিয়ে রাখি নে।···তোমাকে যারা নানা প্রকারে নিন্দা করেছে তাদের সঙ্গে কোনোদিনই আমার মনের সায় নেই, তাতে আমি খুবই ব্যথা বোধ করছি।" (তীর্থংকর—১৯১ পৃঃ)

আজ যদি কবি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে তাঁকে বলতাম আমি এই কথা: "আমাকে যারা নিন্দা করেছে তারা সব সময়েই যে অকারণে আমাকে দোষ দিয়েছে

* ভগবানের মূল শ্লোকটি এই (৩, ১৬, ৪):

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্মং দৈবং পরং হি মে।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুংভিরসৎকৃতাঃ॥

কিন্তু নারায়ণ মুনিদের মান রাখতে তাঁদের অভিশাপ মঞ্জুর করেছিলেন—জয়বিজয় পরে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হ'য়ে জন্মেছিলেন।

এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কারণ সে-সময় আমার মন নিন্দাবাদীদের প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠলেও শ্রীঅরবিন্দের চরণে দৃষ্টিদীক্ষা নেওয়ার পর সত্যিই আমি দেখতে পেয়েছি সে-সময় আমার কত ঔদ্ধত্য ছিল যার জন্যে আমি আপনার মতন মহাজন বা গুরুদেবের মতন মহাঋষির সঙ্গেও বচসা করতে কুণ্ঠিত হই নি। কাজেই আমাকে স্নেহ করার দরুণ আমার নিন্দাবাদে ব্যথা বোধ করাটা আপনার স্নেহকেই প্রমাণ করে আমার নির্দোষিতাকে নয়।"

এ আমার কথার কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বহু পত্রে বহু গভীর বিচার বিশ্লেষণের জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় আমার অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত ক'রে দেখিয়ে দিতেন অহমিকা কতছলে আমাদের অন্ধ করে—যে-জন্যে জগতে এত মনকষাকষি ভুলবোঝাবুঝি বাণহানাহানি। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি কবির স্নেহশীলতার প্রসঙ্গটা শেষ করি।

মহৎ মানুষ নানারকম হয়। কেউ অমুক অমুক গুণে বড়—কেউ তমুক তমুক গুণে। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখেছিলাম একটি অত্যাশ্চর্য গুণ—অপার সহিষ্ণুতা—তিতিক্ষা। কিন্তু মানুষ তিতিক্ষাশীল হয় কখন?—না, যখন সে যথার্থ জ্ঞানী হয়। কারণ তখনই সে সত্যি বোঝে—আমরা নিত্যই কতশত মোহের ফেরে প'ড়ে ভুলচুক করি বারবার ঐ একই মোহের পুনরুত্থানে—ঠিক যেমন মাতাল বারবার মদে ম'জে ভুগে মদ ছাড়বার পণ নিয়েও ফের মদে ডুবে দুঃখ পায়। শ্রীঅরবিন্দই আমাকে দেখান—Tout comprendre c'est tout pardonner (যত বুঝি ততই ক্ষমা করি) এ-ফরাসি প্রবচনটি কেন সত্য ও কীভাবে সত্য। তিনি তাঁর অগাধ জ্ঞানের আলোকসম্পাতে আমাকে বুঝিয়ে দেন যে, সত্যদর্শী হ'তে চাইলে সবার আগে চাই দুটি জিনিস; পরের দোষকে কঠোর ভাবে বিচার না করা, আর নিজের দোষ প্রাণপণ চেষ্টায় খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করা আত্মশোধনের জন্যে। মানুষকে উঠতেই হবে তার মানবিকতার হাজারো দুর্বলতা ছেড়ে, নৈলে তার মুক্তি নেই। এ-দুর্বলতাদের মধ্যে একটি সেরা দুর্বলতা হ'ল নিজের আত্মাদরকে প্রশ্রয় দেওয়া—কারুর কাছে নত হ'তে না চাওয়া। কিন্তু আদবে নত হ'তেই যে শেখে নি উদ্ধত মাথা তার কেবলই ঠোকর খেতে খেতে শেষে ফাটাফুটি হ'য়ে দাঁড়ায়—কেননা সংসার আর যাকেই অব্যাহতি দিক না কেন—গর্বীকে রেয়াৎ করে না কোনোদিনও। রবীন্দ্রনাথ ঠিক পরম-ভাগবতের মতন দীনধর্মী ছিলেন এতটা বললে তাঁর কবিকর্মী রূপের অমর্যাদা

করা হবে, কিন্তু আবাল্য দিনের পর দিন আত্মশোধনের সাধনা ক'রে গভীরদর্শী হওয়ার ফলে তিনি মানুষের অংহকারকে কী চোখে দেখতে শিখেছিলেন তার বড় সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর একটি পত্রে। চিঠিটিতে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছিলেন: "রাগ ক'রে আছি মনে ক'রে বৃথা তুমি নিজেকে পীড়ন কোরো না। তোমাকে কঠিন আঘাত করেছি জেনে অবধি আমি অনুতপ্ত আছি। তোমার অহংকার নিয়ে তোমাকে দোষারোপ ক'রে কী হবে, নিন্দে যে করি সেও তো অহংকার থেকে। অহংকার উপড়িয়ে ফেলতে যে পারে সে ধন্য—পারিনে যখন তখন পরস্পরের অহংকার বাঁচিয়ে চলতে পারলে সেও কম কথা নয়। আঘাত পেয়েও মনকে শান্ত করতে পারলে তুমি গভীর আনন্দ পাবে।"
(তীর্থংকর—১৯৬ পৃঃ)

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমারি একটি ঝোঁকালো ছান্দসিক তর্কের ফলে। ব্যাপারটা ছন্দজ্ঞদের কাছে নীরস না হ'তে, পারে ভেবে সংক্ষেপে বলি আজ, কারণ এ নিয়ে কেউ কেউ আমাকে একটু ভুল বুঝেছিলেন সে সময়ে।

তখন আমি ছন্দ নিয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছি। সংস্কৃত ইংরাজি বাংলা হিন্দি এমন কি ফরাসি ছন্দেও পাঠ নিতাম। ছন্দে আমার কান সত্যিই অনুশীলিত হয়েছিল বহু সাধনায় যার ফলে আমি দেখতে পাই যে, ছন্দের মূলসূত্র সর্বত্রই এক —নিয়মের বাঁধন পরা আনন্দের উপলব্ধির জন্যে—অসীম সীমার মধ্যেই মুক্তি পান কী ভাবে তার খবর দিতে। এই নিয়মের নানান ধারা আছে বটে, কিন্তু কান অনুশীলিত হ'লে সে যে-ধারায় আনন্দ পায় তারই নাম বিকশিত ছন্দ।

এখানে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। সংস্কৃত ছন্দে আমার কান ছেলেবেলায়ই অনুশীলিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরাজি ছন্দে দীক্ষা নিতে হয় নতুন ক'রে শ্রীঅরবিন্দের কাছে, বাংলা ছন্দে প্রধানতঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের কাছে। আমার স্বভাব-উৎসাহী মনই আমাকে ফের বিপাকে ফেলল, আমি প্রবোধবাবুর আশ্চর্য বিশ্লেষণ শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে রায় দিয়ে বসলাম যে, স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে তিনি যা বলছেন সেই-ই হ'ল ঠিক বিশ্লেষণ (scansion); রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে স্বরবৃত্তের অনেক ভঙ্গিরই ব্যাখ্যা করা যায় না। "অনামীর" প্রথম সংস্করণে এই প্রতিপাদ্যটি আমি ফুটিয়ে তুলি একটি হাসির নক্সাতে না ভেবে যে কবি এতে আঘাত পেতে পারেন। (এ-নক্সাটির নাম ছিল 'ত্রৈরথ পর্ব'—তর্ক বেধেছে রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র ও দিলীপকুমারের। প্রবোধ ও দিলীপ একাত্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে

প্রলীপ যেমন lunch ও breakfast মিলে brunch ; অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণে *এ-নক্সাটি আমি বাদ দিয়েছি।)*

কবি খুব আহত হ'য়ে আমাকে লেখেন : "ছন্দের হিসাবও যেমন সূক্ষ্ম, ভাষারও তেমনি। এ নিয়ে কারো সঙ্গে মতের মিল করতে যাওয়া ভুল। লিখে যাও, তারপরে কালের দরবারে শিরোপা যখন পাবে তখন কারো কিছু বলবার থাকবে না। আপনার পথ আপনিই বের করো। কবি মাত্রেরই মতো তোমারও বলবার অধিকার আছে যে তোমার আদর্শই শ্রদ্ধেয়। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—কবিতা রচনাতেও খাটে। তোমাকে পূর্বেই বলেছি ছন্দ নিয়ে কোনো কথা বলব না। এ হোলো সূক্ষ্মবোধের কথা, ছান্দসিকের সাক্ষ্য সাবুদ নিয়ে রায় দেবার কাজ অন্তত আমার নয়। আজ প্রায় ষাট বছর ময়রার কাজ ক'রে এসেছি, শেষ বয়সে সন্দেশের তার যাচাই করবার জন্যে ল্যাবরেটরির দোহাই পাড়তে যাব না, যে-রসায়নে সন্দেশের বিচার হয় সে আমার মনের মধ্যেই থাক, কলেজের কাঠগড়ায় তার সন্ধানে যাব না। (জানুয়ারি ১৯৩২—তীর্থংকর, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

এই সময়ে আমি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্রালাপ করতাম। তাঁর সঙ্গেও যে আমার সর্বত্রই মতের মিল হ'ত তা নয়, কিন্তু এ-বিষয়ে সে-সময়ে আমার সন্দেহ ছিল না—আজো নেই—যে বাংলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছন্দোবিশ্লেষণ তাঁর মতন নিপুণ ভাবে আর কেউ করে নি। এই সময়ে ছন্দ নিয়ে একবার কবি মোহিতলালের সঙ্গে আমার তর্ক হয়। আমি তাঁর ছন্দ-বিশ্লেষণে সায় দিতে না পারায় তিনি আমাকে ছন্দে নাবালক ব'লে ব্যঙ্গ করেন। উত্তরে রুখে উঠে তাঁকে আমি পাঠাই শ্রীপ্রবোধ সেনের একটি চিঠি—এই ভরসায় যে প্রবোধবাবুকে অন্তত তিনি নাবালক ছান্দসিক বলতে পারবেন না। প্রবোধবাবুর চিঠিটি আমাকে এতই উল্লসিত করেছিল যে সেটি আমার এক ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলাম! চিঠিটির খানিকটা মাত্র উদ্ধৃত করি—প্রবোধবাবু লিখেছিলেন ২৮.১.৩৩ তারিখে :

"পরিশেষে আপনাকে আপনার ছন্দালোচনার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার ছন্দের প্রবন্ধগুলি এবং ছন্দ সম্পর্কে চিঠিপত্রগুলি প'ড়ে কত যে আনন্দ পাই তা ব'লে শেষ করা যায় না।" প্রবোধবাবুর চিঠির বাকী অংশটুকু উদ্ধৃত করলাম না তাতে আমার ছন্দ শ্রুতির আরো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে ব'লে। কিন্তু মোহিতলালের কাছে করেছিলাম! আর যাবে কোথায়?—মোহিতলাল

রেগে আগুন হ'য়ে উঠে আমাকে এক চিঠি লিখলেন—শুধু আমাকেই গালিগালাজ দিয়ে নয়, প্রবোধবাবুকেও উদ্দেশ্য ক'রে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাষায় কটুকাটব্য ক'রে। সবাই জানেন—মোহিতলাল সহৃদয় হ'লেও রগচটা মানুষ ছিলেন—তাই রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকত না। আমি তাঁকে কবি হিসেবে যতটা শ্রদ্ধা করতাম—সমালোচক বা ছান্দসিক হিসেবে ততটা শ্রদ্ধা বজায় রাখতে না পেরে বাধ্য হ'য়ে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখি সব কথা জানিয়ে। কিন্তু এখানেও মুস্কিল হ'ল এই যে, সে-সময়ে তিনিও আমার উপর একটু বিরূপ ছিলেন—এবং সে-বিরূপতার খানিকটা ঝাঁজ প্রবোধবাবুর উপরেও পড়েছিল আমি প্রবোধবাবুর ছন্দবিশ্লেষণের সুখ্যাতি করার দরুণ। অনেকে তাঁকে বোঝায় যে প্রবোধবাবুও নাকি দিলীপের মতনই তাঁর বিরুদ্ধে—যে জন্যে প্রবোধবাবু বোলপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে খোলাখুলি কথাবার্তা ক'য়ে তাঁকে প্রসন্ন করেন তাঁর ভুল বোঝার নিরসন ক'রে। (বস্তুতঃ প্রবোধবাবুর মতন প্রবুদ্ধ রবীন্দ্র-ছন্দভক্ত বাংলাদেশে আর কেউ আজো প্রকট হন নি।) কিন্তু আমি সে-সময়ে পণ্ডিচেরিতে আসীন, তাই কবিকে চিঠি লিখেই বোঝাতে চেষ্টা করি যে ছন্দে তাঁকে খাটো করতে যাবার মতন মূঢ় বাংলাদেশে থাকতেই পারে না। অভিমানী কবি উত্তরে লিখলেন যে ছন্দ নিয়ে আমার সঙ্গে আর কোনো আলোচনাই করবেন না। কিন্তু আমি মনে মনে জানতাম ক্ষমাশীল কবির রাগ দুদিনে প'ড়ে যাবেই যাবে আর তখন তিনি বুঝতে পারবেনই পারবেন যে প্রবোধ সেনকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছান্দসিক বলতে আমি ভুলেও এ ইঙ্গিত করতে চাই নি যে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর কান কবির চেয়ে বেশী অনুশীলিত। ছন্দের বোধ "সূক্ষ্ম"—বটেই তো। আর এ-সূক্ষ্ম বোধে কবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ কান বাংলাদেশে যে আজ পর্যন্ত জন্মায় নি এও কি বলতে হবে? এ যে স্বতঃসিদ্ধের মতনই প'ড়ে রয়েছে—যে না মানবে সেই তো লোক হাসাবে। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, যে-পদ্ধতিতে প্রবোধবাবু ছন্দ বিশ্লেষণ করেছেন সে-পদ্ধতি বেশি বৈজ্ঞানিক এবং যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনির অভিনব ব্যাখ্যার আলোয় তিনি ছন্দচারণের দুর্গম পথকে অনেকখানি সুগম করেছিলেন।

কিন্তু কবিকে তার একটি পার্ষদ নানা প্রমাণ জড়ো ক'রে বোঝালেন যে, আমি নাকি এই সূত্রে প্রবোধ সেনকে কবির চেয়ে বড় ছন্দজ্ঞ ব'লে প্রচার করতে উঠে প'ড়ে লেগেছি। আমার প্রবন্ধাদিতে আমার যুক্তিগুলি আমি হয়ত একটু বেশী তীক্ষ্ণভাবেই পেশ ক'রে থাকব—মনে পড়েছে না—তবে এটুকু

বলতে পারি হলপ ক'রেই যে কবির মতন অদ্বিতীয় ছন্দবিৎ তথা স্রষ্টাকে যদি আমি ছন্দে অবোধ ব'লে প্রচার করতে চাইতাম তবে সবাই আমাকে বাতুল ব'লেই ডিশমিশ ক'রে দিতেন —এবং তাতে আমার ঠিক নামকরণই হ'ত। কবিকে ঠাট্টা ক'রে লিখি "I am not quite such a fool as I look—যে আপনার ছন্দশ্রুতিকে নাকচ করতে সাহসী হব।" এর পরে তিনি ফের আমাকে ক্ষমা ক'রে ছন্দ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে শুধু যে পুনরালোচনায় রাজি হয়েছিলেন তাই নয়—তীর্থংকরের ১৯৮ পৃষ্ঠার পত্র দ্রষ্টব্য—আমায় তাঁর 'ছন্দ' বইটি উৎসর্গ ক'রে তাঁর ক্ষমাপত্রে শিলমোহর করেন।

এত কথাই যখন লিখলাম তখন সংক্ষেপে একটু বলি—কী ধরণের scansion নিয়ে আমার কবির সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রবোধবাবুর সঙ্গে মতৈক্যের সুরু হয়। শুধু একটি মূল দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব।

ব্যাপারটা হ'ল স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে, ধরা যাক্ :

সীমার মাঝে। অসীম তুমি। বাজাও আপন। সুর॥ এটি কী ছন্দ? প্রবোধবাবু, বা পিতৃদেব বলতেন চারের কদম—প্রতি পর্বে চারটি করে মাত্রা। আমার মন এই বিশ্লেষণেই সায় দেয়। কিন্তু কবি বললেন—না, এ হ'ল তিনের ছন্দ :

| | | | ‖ | | | | ‖

সী   মা   র   মা   ঝে।   অ   সী   ম   তু   মি।

আমার বক্তব্য ছিল যে স্বরবৃত্ত ছন্দকে যদি এভাবে ষাণ্মাত্রিক ব'লে ধরা হয় তবে এ-ছন্দের অনেক নির্দোষ পর্বেরও মাত্রাসাম্য করা যায় না। অর্থাৎ যদি এ-ছন্দের প্রতি পর্বে ছটি ক'রে মাত্রাই থাকে—যেটা কবির প্রতিপাদ্য—তাহ'লে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত

"কোন্ দেশের গৌ। রবের্ কথায়। ভ'রে ওঠে। মোদের্ বুক" চরণের প্রথম পর্বের সাতমাত্রাকে কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না। এরকম চরণ বহু অনবদ্য স্বরবৃত্ত ছন্দেই মিলবে, যেমন রবীন্দ্রনাথের নিজেরি লেখা :

"শেষ বসন্তের | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্যশূন্য | মাঠে" (পরামর্শ) এখানেও প্রথম পর্বে মাত্রা সংখ্যা সাত—ছয় নয়। কিম্বা কবির

"তাহা হ'লে | সেই বাণিজ্যের | করব মহাজনী" (ক্ষণিকা) এখানে দ্বিতীয় পর্বের সাত মাত্রার ওকালতি করব কীভাবে—যদি এ ছন্দকে বলি ষাণ্মাত্রিক বা

১০

তিনের কদম ? অথচ দ্রষ্টব্যকে যদি এ ছন্দকে চতুর্মাত্রিক ধরি তাহ'লে প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে মাত্রা পাই : "শেষ্-ব সন্-তের্" বা "সেই-বা-শি-জ্যের্"।

এতশত বৈয়াকরণিক কচকচির অবতারণা করতাম না যদি এক্ষেত্রে কবি পরের কথা শুনে আমকে ও প্রবোধবাবুকে ভুল বুঝে না বসতেন। আমার আজো মনে হয় যে স্বরবৃত্ত ছন্দকে চতুর্মাত্রিক ব'লে গণ্য করাই বিধেয়। কিন্তু তাহ'লেও আমার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছন্দ নিয়ে তর্ক করাকে সমর্থন করা যায় না। আমার উচিত ছিল হয় চুপ ক'রে থাকা, নয় শুধু বলা—"আমি স্বরবৃত্ত ছন্দকে এই ভাবেই গুনি"। কিন্তু যৌবন স্বভাব-উদ্ধত, তাই আমি ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দকে ষাণ্মাত্রিক নাম দিয়ে ভুল করেছেন। সে-সময়ে আমি এ-জাতীয় অবিনয়কে স্পষ্টভাষণ বা সত্যপরতা নাম দিতাম। কিন্তু পরে শ্রীঅরবিন্দের কাছে দীক্ষা পাই একটি মহাসত্যের যে "যুক্তি হ'ল মনের গোনাগুন্তি নৃত্যছন্দ"—* কাজেই যুক্তির ক্ষেত্রে চড়াও হ'য়ে বলতে যাওয়ার বিপদ আছে যে "আমার যুক্তিই ঠিক, তোমার যুক্তি ভুল।" শ্রীঅরবিন্দের গভীর জ্ঞানদৃষ্টির আলোয় পরে আমি প্রথম এই সাদা কথাটি বুঝবার কিনারায় আসি যে মনের তর্কবিচারের আখড়ায় কেউই তাল ঠুকে বলতে পারে না—"আমার বিচারই একমাত্র সত্য"—কেন-না মনের চিন্তার এম্‌নিই মায়া যে প্রত্যেকেই ভাবে যে তার দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র অভ্রান্ত দৃষ্টি। এক ইংরাজ কবি বলেছিলেন না যে প্রত্যেকের ঘড়িই আলাদা সময় দেয় অথচ প্রত্যেকেই ভাবে শুধু তার ঘড়িই ঠিক চলেছে ? তাই তো আসে তিতিক্ষার প্রশ্ন—যে-তিতিক্ষা শেখায় যে প্রত্যেকের চিন্তারই ছন্দ আলাদা, তাই কয়েকটি মূল সার্বকালিক তথা বিশ্বভৌম বিধান বাদ দিলে কোন কিছুর সম্বন্ধেই গাজোয়ারি ঢঙে বলা চলে না যে সে সার্বজনীন সার্বকালিক সত্য। রাসেল তাঁর Human Society in Ethics বইটিতে এমন কথাও বলেছেন যে সার্বকালিক ও বিশ্বভৌম সত্যকেও যুক্তিসিদ্ধ প্রতিপন্ন করা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। ছন্দ, সঙ্গীত, নীতি, শিল্প সবকিছুর চর্চায়ই মতভেদের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে মানবচেতনার প্রগতি হবে—এইই বিধাতার বিধান। গুরুদেবের দৃষ্টিদীক্ষায় এটুকু প্রথম বোঝবার পরেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশ করার অধিকার আমার থাকলেও তাঁর মত ভুল একথা

* শ্রীঅরবিন্দ আমাকে যুক্তির অনৈশ্চিত্য সম্বন্ধে যে-দীর্ঘ পত্রটি লিখেছিলেন সেটি অনামীতে দ্রষ্টব্য—৩৯৯ পৃষ্ঠায়। তবে সবশেষে লিখেছিলেন : "Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else."

বলবার অধিকার আমার ছিল না—বরং এইটুকুই আমার বিনীতভাবে মেনে নেওয়া উচিত ছিল যে ছন্দ-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভুল হওয়ার চেয়ে আমার ধারণা ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া যে-কোনো বিচারেই বেশি জোর ক'রে নিজের মত প্রতিপন্ন করতে যাওয়ার বিপদ এই যে দৃঢ়পুষ্ট অনেক মতই মানুষকে প্রায়ই বদলাতে হয়—যেই দেখতে পাওয়া যায় যে, কাল যা সত্য মনে হয়েছিল আজ তাকে অসত্য ব'লে বর্জন না করলে এক পাও এগুনো অসম্ভব। কবি একথা চমৎকার ক'রে লিখেছিলেন তাঁর একটি পত্রে (পুরো চিঠিটি তীর্থংকর তৃতীয় সংস্করণে ১৯৯ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে):

"একটা কথা মনে রেখো, যে নিজের বিচার বুদ্ধি আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস করি নে।...আমাদের ছুটির পরে যে আদালত বসবে তার উপরেই শেষ বিচারের ভার রইল।

"কিন্তু হায় রে, শেষ বিচারের দরবার শতাব্দীর কোন্ প্রান্তে বসবে তা কেউ বলতে পারে না। সে এতই দূরবর্তী, বর্তমানের সন্থ মত ও আশু সংস্কার থেকে এতই তফাতে যে তা নিয়ে মাথাভাঙাভাঙির মূঢ়তায় প্রবৃত্ত না হয়ে যে-কয়দিন এই সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের মেয়াদ আছে সহজ মনে হেসে খেলে পরস্পরকে ভালোবেসে কাটিয়ে যেতে পারলে জীবনের পালায় জিতলেম ব'লে জানব। জিৎ মতামতে নয়, খ্যাতি অখ্যাতিতে নয়, জিৎ ভালোবাসায়—শক্তির রাজ্যে নয়, আনন্দের রাজ্যে। এই কথা মনে ক'রেই আজকাল নিজের প্রশস্তিবাদে আমি এত কুণ্ঠিত হই—যে-মূল্য তার নয় সে মূল্য তাকে দেওয়ার মতো ঠকা আর কিছুই হ'তে পারে না।"

এ-হেন মহাজনের কাছে নত হ'য়েই তো আনন্দ, কথাকাটাকাটির বিড়ম্বনা কেন? কিন্তু দৃষ্টি যখন মুক্ত থাকত তখন একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝলেও আত্মাভিমানের মেঘ যখন তাকে আবিল করত তখন ফের ঠিকে-ভুল-হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ত আবার একই অন্ধতার পুনরাবৃত্তি: স্বাধীন-মত-প্রকাশের দোহাই দিয়ে আত্মাদরকে জাহির ক'রে শেষে অনুতপ্ত হ'য়ে কবির কাছে দরবার: "আমি গর্ববশে ফের ভুল করেছি, কবি, ফের নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করতে হবে।" অমনি কবি প্রসন্ন হেসে আমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রে তাঁর অজস্র স্নেহদানে ধন্য করতেন। কখনো বা পরিহাসের স্নিগ্ধ হাওয়ায় আমার মনের ভার লাঘব করতেন (তীর্থংকর—১৯০ পৃঃ):

বহুদিন কেন তব সহাস্য
দেখিনি অমল কমল আস্য ?
তব মুখ হ'তে স্বর-সুধা-স্রোতে
শুনিনি সরল ভাবের ভাষ্য ?
কেন যে তোমার এ-ঔদাস্য,
অবশ্য ক'রে লিখো লিখো মোরে
কারণটা যদি হয় প্রকাশ্য।
সুহৃদ্‌জনের বিস্মরণের
মন হ'তে তারে নিঃসারণের
চেষ্টায় আজি হ'লে তুমি রাজি
একথা নেহাৎ অবিশ্বাস্য।"

শুধু তাই নয়, কবি যাকে বলে meeting half-way পদ্ধতি অবলম্বন করতেন অনেক সময়েই। একটি উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়েছি—ছন্দ নিয়েই আমার সঙ্গে বচসায় আমি যা মনে এসেছে দুমদাম ক'রে ব'লে শেষে অনুতপ্ত হয়েছি দেখেই কবি খুশি হ'য়ে "ছন্দ" বইটি আমাকেই উৎসর্গ করেছিলেন পরম আশীর্বাদের সঙ্গতে। আর একটি উদাহরণ দিই।

বহুদিন ধ'রে সঙ্গীত নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতে মেলে নি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সে-সব মতানৈক্য আজ আমার কাছে অর্থহীন হ'য়ে গেছে দেখতে পেয়ে যে সঙ্গীতের বিচারে এসবই বাহ্য, পরম বরণীয় হ'ল শুধু নির্মল আনন্দ—যে-গানে যে সাড়া দেয় তার সেই পথে চলাই কর্তব্য। তার পরে শেষ বিচারের ভার মহাকালের—ভারতীর—পরম কর্মফলদাতার।

কিন্তু সে-সময়ে যৌবনের আত্মাভিমান আত্মপ্রত্যয়ের শিরায় শিরায় প্রবহমান, রোখ অজ্ঞানের প্রশ্রয় পেয়ে উদ্দাম, কাজেই কবির সঙ্গে হঠকারী হ'য়ে কুতর্ক করেছি, নিজের সামান্য জ্ঞানকে তাঁর গভীর বোধের সামনে খাড়া ক'রে স্পর্ধা প্রকাশ করেছি —অথচ তিনি সময়ে সময়ে আঘাত পেয়েও ভুলেও বলেন নি যে যেহেতু তিনি বেশি বিচক্ষণ সে হেতু তাঁর মত বেশি প্রামাণ্য।

কিন্তু ক্রমাগত এই ধরণের তর্কাতর্কির ফলে আমার একটি মস্ত ক্ষতি হয়েছিল : কবি আমার গান সম্বন্ধে মনখুলে কখনো কিছু বলেন নি। আমার গান যে তিনি ভালবাসতেন সেকথা শুধু অতুলদার মুখেই শুনতাম। এজন্যে আমার মনে ব্যথা ছিল,

তবে ভাবতাম: "কবি কেনই বা মনখুলে আমার গানের সুখ্যাতি করবেন—যখন আমি তাঁর গানের 'পরে পুরোপুরি প্রসন্ন নই?"

কবি দরদী—বুঝতেন আমার অনুক্ত ব্যথা। কিন্তু হয়ত ক্ষেত্র পান নি আমাকে যথোচিত উৎসাহ দেবার। কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে মনে ব্যথা নিয়ে চলে এসেছি কবি জানতেন। তাই একদা হঠাৎ যেন আরো সহজ স্নেহে অভিনন্দন জানালেন আমার গানের—বিশেষ ক'রে সুরকার-প্রতিভার উল্লেখ ক'রে আমার অনুপমা গীতিশিষ্যা ৺উমা বসুর মুখে আমার রচিত একটি সুর শুনে লিখলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে (আগষ্ট ১৯৩৭):

"আজ এখানকার কোনো মেয়ের কাছ থেকে তোমার একটি গান শুনলুম, খুব ভালো লাগল। তোমার শক্তি এবং শিক্ষা নিয়ে তুমি যে বাংলা সঙ্গীতসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছ এ একটি বড়ো কথা। অনেকদিন বাংলা গীতভারতী যথোচিত পূজা পান নি—তুমি তাঁর আনন্দলোকে স্বদেশের অধিকার বিস্তার করবার সুযোগ্য অধিনেতা। তোমার সুকণ্ঠে হিন্দী গৌড়ীয় এবং কীর্তন-বাউলধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে—এর প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রে মন আনন্দিত।" (তীর্থংকর—২০২ পৃঃ)

এখানে আমাকে অনেকেই ভুল বুঝতে পারেন—আমি কবির মহত্ত্ব বর্ণনার প্রসঙ্গে নিজেকে ক্রমাগত জাহির করেছি ব'লে। কিন্তু স্মৃতিচারণ যে স্বভাবে আত্মকেন্দ্র এ তো মানতেই হবে। কে কবে আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে বৈষ্ণব বিনয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে "আমি অধমাধম" হাঁক দিয়ে সার্থক আত্মজীবনী লিখেছেন? এক ইংরাজের আত্মজীবনীতে পড়েছিলাম এই ধরণের একটি কথা যে, প্রতি আত্মজীবনীই একটি অহং-এর আত্মবিকাশের ছবি, তাই যিনি অবিমিশ্র বিনয়পন্থী, বিনয়ভূষণ, পরার্থে আত্মবিস্মৃত তাঁর পক্ষে কারুর কোনো আত্মজীবনী খুলতে না যাওয়াই ভালো।

কথাটা সত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা সুভাষকে আমি স্মৃতিচারণে আঁকবার সময়ে যদি নিজেকে অবান্তর ব'লে মিথ্যা বিনয়ঢাক বাজাই তাহ'লে সে ছবি জীবন্ত হবে কী ক'রে? স্মৃতিচারণ মানেই কি স্মৃতের সঙ্গে স্মরয়িতার লেনদেনের ছবি নয়? প্রবন্ধ-রচনা ও স্মৃতিকথা তো সমগোত্রীয় সাহিত্য নয়। কিছুদিন আগে চার্চিল সাহেবের My Early life পড়ে মুগ্ধ হবার সময়ে কেবলই মনে হচ্ছিল এই কথা যে তিনি যদি প্রতি পদে নিজেকে লুকিয়ে চলতেন বিনয় রাজ্যে তাহলে তিনি আর যাই পারুন না কেন, স্মৃতিচারণের রস কিছুতেই পরিবেশন করতে পারতেন না।

যার ফলে এ-বইটি ইংরাজি আত্মজীবনীলোকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ব'লে আজ সর্বজনস্বীকৃত। তবে এটুকু মানি যে, নিজের মহিমা-প্রচারকে স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য ক'রে দাঁড় করালে সে-স্মৃতিচারণ পথভ্রষ্ট হয়—যার শাস্তিও লেখক পায় হাতে হাতে —নিরুৎসুকের অনাদর, কেন-না আত্মপ্রচার কখনই সরস কি চিত্তাকর্ষক হয় না। তাই কারুর স্মৃতিচারণ যদি নীরস হ'য়ে থাকে তবে কোনো ওকালতি বা সুপারিশই তাকে জীইয়ে রাখতে পারবে না—বিনয়ের অজস্র মৃতসঞ্জীবনী প্রলেপও আসবে না কোনো কাজে! পক্ষান্তরে যদি লেখক তাঁর স্মৃতিচারণে সত্যভাষী হয়ে থাকেন, মহৎকে দেখে যা লাভ করেছেন তার সরস ছবি আঁকতে যদি জীবনের সত্য সন্ধানে নিজের নানা ভ্রমপ্রমাদ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে গভীর সত্যসন্ধানের দিশা দিতে পেরে থাকেন তবে হাজার "অবিনয়"-এর অভিযোগেও সে-আসামীর ফাঁসি হবে না—তিনি নিষ্কৃতি পাবেনই পাবেন। এ-বিশ্বাস যদি আমার না থাকত তবে আমি স্মৃতিচারণ প্রণয়নের মিথ্যা পণ্ডশ্রম করতাম না। আমার অন্য কাজের অভাব নেই।

না। আমি এত খুঁটিনাটির অবতারণা করেছি সত্যিই কবির কাছে কত কী পেয়েছি তার খবর দিতে, নিজের যোগ্যতার ফিরিস্তি দিতেও নয়, অযোগ্যতার জন্যে কাঁদুনি গাইতেও নয়। তাই একশত প্রমাণ জড়ো করেছি শুধু তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্রবল অভিযোগকে অপদস্থ করতে—যে, তাঁর স্নেহ হার্দিক ছিল না, ছিল মানসিক : অর্থাৎ, তিনি হৃদয় থেকে ভালোবাসতেন না, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি "ভালোবাসা কর্তব্য," বলত ব'লেই ভালোবাসলে মানুষ যেমন ব্যবহার করে তেমনি ব্যবহার করতেন। একথা যে কত অসত্য তার আর একটি উজ্জ্বল প্রমাণ পেলাম মৈত্রেয়ী দেবীর অপরূপ স্মৃতিচারণ "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" বইটিতে। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বত্তার সম্বন্ধে এ-অপূর্ব বইটি বাংলাভাষার একটি শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকথা হয়ে বিরাজ করবে। কিন্তু এ-বইটিতে তিনি যেভাবে কবির স্নেহশীলতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন সে-রীতি আমাকে সাজত না। কারণ আমি ওঁর স্নেহকে উপলব্ধি করেছিলাম উত্তরোত্তর সংঘাত তর্ক ও ভুলবোঝার মধ্যে দিয়েই, এবং ঠিক এইজন্যেই আমার স্মৃতিচারণে কবির হৃদয়বত্তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য কম জোরালো ব'লে আমি মনে করি না।

এ ছাড়া আর একটি কথাও আমার বলবার আছে এ-সম্পর্কে।

কথাটি খুলে বলি।

যিনি আমাকে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ স্নেহশীল নন তিনিও ছিলেন বাংলা দেশের একজন বরেণ্য মনীষী। তাই তাঁর অভিযোগে আমি প্রথমদিকে বিচলিত হয়েছিলাম বৈ কি—আরো এই জন্যে যে, তিনি নিজে ছিলেন স্বভাবে পরম স্নেহশীল। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আমার এজাহারের দাম বেড়ে গেছে ব'লে আমি মনে করি—কেন-না আমি পক্ষপাত নিয়ে কবির সঙ্গে আলাপ সুরু করি নি—খানিকটা সাবধান হ'য়েই চলেছিলাম প্রথমদিকে—যাকে ইংরাজিতে বলে to be on one's guard ; কিন্তু পরে তাঁর অসামান্য ক্ষমালু স্নেহশীলতার অজস্র পরিচয় পেয়ে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কবির ক্রিটিক কবিকে ভুল বুঝেছিলেন —খুব সম্ভব কোনো ব্যক্তিগত কারণে। জীবনে বহু পোড় খেয়ে শিখেছি যে, সংসারে একজন যখনই আর একজনকে বেশি কঠোর ভাবে বিচার করে তখনই যথার্থ সত্যসন্ধানীর কর্তব্য খোঁজ করা—অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারকের কোনো গুপ্ত ক্ষোভ আছে কি না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্রুত মহাজন—কত প্রার্থী তাঁর কাছে আসত কত কী চেয়ে, তিনি সাধ্যমত যাচককে ফেরাতেন না বটে, কিন্তু তাই ব'লে সব প্রত্যাশার মর্যাদা রাখতে পারে কে এক বাঞ্ছাকল্পতরু ছাড়া? (এবং স্বয়ং ভক্তবৎসলও যে ভক্তের সব প্রার্থনাই পূরণ করেন না একথা কোন্ ভুক্তভোগীর কাছে অজানা ?) রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে স্নেহশীলতার অপবাদের একটি নিদান এইখানেই খুঁজতে হবে—মনে হ'ত আমার।

কিন্তু এছাড়াও কারণ ছিল। এ-কারণটির কথা কবি আমাকে একাধিকবার নিজমুখে বলেছেন তাঁর অনুপম করুণ-রসিক ঢঙে। সে-ঢং আমি আমার ভাষায় পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারব কেমন ক'রে? তবু কিছুটা ফুটবে এ-ভরসা হয় এইজন্যে যে কবির ভাষাভঙ্গির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই বলি যতটা পারি কবির ভাষাশৈলীর অনুকরণ ক'রে।

বলেছি অতুলদাকে কবি আন্তরিক স্নেহ করতেন। অতুলদাও তাঁকে ভক্তি করতেন মনেপ্রাণে। তাই বোলপুরে যখন একবার আমি অতুলদাকে নিয়ে হাজির হই ১৯২৬-এর ডিসেম্বর মাসে তখন তাঁকে পেয়ে কবির মুখ খুলে গিয়েছিল, দিন তিনেক আমাদের কেটেছিল পরমানন্দে।' রোজই কবির সঙ্গে আমরা একসঙ্গে আহার করতাম ও কবি অনর্গল বলতেন সে কত কথাই যে! কী অপরূপই যে ছিল তাঁর বাক-নৈপুণ্য—শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে দুজনেই অভিভূত হ'য়ে পড়তাম। অতুলদা একদিন বলেছিলেন মনে আছে: "কবি কেমন অনায়াসে

আমাদের মনের তারকে উঁচুনিচু সুরে বাঁধতে পারেন দেখেছ, দিলীপ? তরল থেকে গম্ভীর, গম্ভীর থেকে করুণ, করুণ থেকে উদাস—কবিত্ব থেকে গবেষণা, গবেষণা থেকে সমালোচনা—কোন্ রসটি না ফোটাতে পারেন তিনি? কেবল দুঃখ এই যে আমাদের মনের তার যে-উঁচু পর্দায় তিনি এত সহজে বাঁধেন তাঁর কথার মোচড়ে, সে-উঁচু আলোর পর্দা ঢিলে হ'য়ে আসে তাঁর কাছ থেকে আসতে না আসতে। তখন আমরা পড়ি আবার যে-তিমিরে সেই তিমিরে।"

অতুলদাও ছিলেন কবিই তো! বলে না: জহুরিই জহর চেনে!

কবির নানা কথার মধ্যেই ফুটে উঠত তাঁর আত্মকথা ঝিকৃমিক্ ঝিকৃমিক ক'রে। কবিশিল্পীরা প্রায়ই নিজের সম্বন্ধে নানা ব্যক্তিগত কথা বলতে ভালোবাসেন কে না জানে? কেবল আত্মকথা সরস ক'রে বলতে পারা অত্যন্ত কঠিন। ও-দুরূহ বিদ্যায় কবি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন কীভাবে—কিছু ফলিয়ে তুলেছি আমার তীর্থংকরে, কিন্তু তারপরে বারবারই মনে হয়েছে যে, কবির আত্মকথা আমার আরো বিশদ করে ফোটাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল, তাঁর আরো নানা দিনের নানা আত্মকথাকে রঙিয়ে তুলে। আজ মনে হল এই না-করা কাজটিই ক'রে ফেলি না কেন—যথালগ্নে?

কবি প্রায়ই বলতেন তাঁর বাল্যকালের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা—যখন কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। তাঁর "পরিশেষ"-এ "সাথি" কবিতাটিতে নিটোল হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁর এই নিঃসঙ্গতার ছবিখানি। তাতে দেখতে পাই—কীভাবে নির্জনতার আলোছায়া তাঁর নিরালা চিত্তপটে চিত্রায়িত হ'য়ে উঠত নানা বয়সে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর ভাবে রসে ছন্দে—শৈশবে ও বার্ধক্যে সেই একই শিশু কেমন ক'রে নিজের মনের প্রাণের খোরাক জুগিয়ে চলেছিল নিজের অন্তরের অন্দরমহল-থেকে-পাওয়া ভাবসম্পদের জোরে। কবি লিখেছেন সবশেষে:

সে দিনের সঙ্গী যারা
কখন্ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে স'রে।
আবার আরেকবার জানলাতে
ব'সে আছি আকাশে তাকিয়ে।......

সকল পথের আরম্ভেতে
সকল পথের শেষে
পুরাতন যে-নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হ'য়ে আছে,
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে কানে।"

কবি নানা সময়ে তাঁর এই নিঃসঙ্গতার যে-বিবরণ দিয়েছিলেন তার চুম্বক দিচ্ছি যতটা পারি তাঁর ভাষাশৈলী অনুকরণ ক'রে—যদিও, বলাই বেশি, এ-চেষ্টা পুরোপুরি সফল হতে পারে না কোনো অনুলিপিকারের মাধ্যমেই—কারণ তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল একান্ত তাঁরই—একমেবাদ্বিতীয়ম্। কবি উবাচ:

"আমার ছেলেবেলা কেটেছিল নিঃসঙ্গেই বলব। কেউ আমাকে গণ্যই করত না। মুখচোরা অতিলাজুক কার নজরে পড়ে বলো? এতে যে আমি সব সময়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম এমন কথা বললে সেটা হবে অত্যুক্তি, কিন্তু এটুকু বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে এই নিঃসঙ্গতা আমার কাছে খতিয়ে শাপে-বর হয়েই এসেছিল—আমাকে নিজের অন্তরের কাছে হাত পাততে শিখিয়েছিল যার একটি মস্ত সুফল ফলেছিল এই যে আমি প্রকৃতিতে নানাভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে দেখতে হয়ে উঠেছিলাম তার অন্তরঙ্গ সহচর—শিখেছিলাম তাকে ভালোবাসতে। জানলা থেকে অতৃপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতাম আকাশ তারা মেঘ গাছপালা—আর মন আমার ভ'রে উঠত তাদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ পেয়ে। তারা আমার সঙ্গে সত্যি কথা কইত। আমার জীবন-স্মৃতিতে দেখতে পাবে আমি আমার এই পাওয়ার কথা লিখেছি কিছু কিছু। কিন্তু যা লিখেছি তার অনেক বেশি আমি পেয়েছি কিন্তু খবর দেওয়া হয় নি—ব'লে মৃদু হেসে—"একদিন কাকে যেন বলেছিলাম: "আমি কত বই লিখেছি? কিন্তু জানো কিগো,—" বলে ফিসফিস ক'রে— "তার চেয়ে ঢের বেশি বই লিখি নি।"

আমরা হেসে উঠলাম। হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে কবি ফের সুরু করলেন: "আমার 'ছিন্নপত্রে' কিছু ফুটেছে আমি প্রকৃতিকে কী গভীর ভাবে ভালবাসতে শিখেছিলাম অল্প বয়সেই। বেশ মনে আছে দিনের পর দিন নিরাভরণাকে কাছে পেতাম খোলা আকাশের নিচে উদার মাঠে বা বালুচরে, আর মনের কানায় কানায় ভ'রে উঠত নিটোল তৃপ্তি।

"কিন্তু প্রতি লাভের উল্টোপিঠে কিছু-না-কিছু হারাতেই হয়, তাই একলা

একলা প্রকৃতির সঙ্গে দহরম মহরম করতে করতে মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি গলাগলি মাখামাখি করার শক্তির আমার বিকাশ হয় নি তেমন। সবকিছুর মতো মেলামেশার কৌশলটিও বহু চর্চার ফলেই আয়ত্ত হয়। আমার হয়নি চর্চার অভাবে। তাই লোকে অনেক সময়েই ভাবে আমি মানুষকে সত্যি স্নেহ করতে পারিনে। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি অতুল, যারা আমার এ বদনাম রটায় তারাই আবার শুধু যে পদে পদেই আমার উপর চড়াও হয় তাই নয়—আমার অবসরকে শতচ্ছিদ্র ক'রে দিতে একটুও সংকুচিত হয় না। আমি চেষ্টা করি তাদের নানা দাবি মেটাতে। কিন্তু ঐ যে বললাম—চটু ক'রে এর-ওর-তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার একান্ত অক্ষমতার দরুণ পারিনে। অমনি তারা মুখভার ক'রে বলে—আমি মিশতে পারিনে—স্নেহ করতে পারিনে। কিন্তু একথা সত্য নয়॥ আমি শুধু প্রকৃতিকেই নয়—মানুষকেও সত্যিই ভালবেসেছি। কিন্তু হ'লে হবে কি, ঠিক পদ্ধতিটি শিখিনি তাদের মন পাওয়ার। তবু বলব—আমি সত্যিই প্রাণপণ চেষ্টা করি কাউকেই খালি হাতে ফিরিয়ে না দিতে। কিন্তু দেখি—যতই দেই ততই তারা চায়, আর যা পেল তার হিসেব ভুলে ঠিক জোড়ে তত কী পেল না। অথচ মজা এই যে যারা ভারিক্কি চালে চলে তারা পায় অজস্র সাধুবাদ! একটা দৃষ্টান্ত দেই।

"বঙ্কিমচন্দ্রকে আমার একটু কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাশভারি লোক। এখানকার মতো তাঁর দ্বার অবারিত ছিল না সর্বসাধারণের জন্যে। আর আমি যা পারি বহু কষ্টে—তিনি পারতেন সহজেই—অর্থাৎ লোককে 'না' বলতে। ফলে হ'ল এক আশ্চর্য ব্যাপার: লোকে একবাক্যে বলা সুরু করল: 'আহা বঙ্কিমবাবু কী অমায়িক মানুষ!' তাঁর কাছে ঘেঁষবার শক্তি ছিল খুব কম লোকেরই, আর যাঁরা ঘেঁষত একটু কাছে তারাও বেশি এগুতে ভয় পেত। তাই তাঁর কাছ থেকে হৃদ্যতার ছিটেফোঁটা পেলেও লোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। কিন্তু আমার ঘরে যে কেউ যখন তখন কাদা পায়ে এসে জাজিমের উপর জেঁকে বসে আমাকে আপ্যায়িত করার পরে ফিরে গিয়ে অম্লানবদনে বলে আমি মিশতে জানি না। * আমি তাই একটি ছড়ায় একবার লিখেছিলাম (এ-ছড়াটি কবি পরে নিজে হাতে লিখে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন):

* তীর্থংকরে এক ভদ্রলোকের কথা লিখেছি যিনি কবির ঘরে এসে চড়াও হয়েছিলেন-(১৬১—৬২ পৃ:)—পড়লে কবির একথার স্বপক্ষে একটি চমৎকার এজাহার মিলবে।

'নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার পরে ভারি রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি'।
বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বেড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে নয়নের জলে
দাতা বটে ষোলো আনা।'

কিন্তু কবির করুণ-রসাল ব্যাখ্যা শুনেও আমার মন তাকে গ্রহণ করতে পারত না। কবি মিশুক ছিলেন না একথা দু'একজন বললেও পাঁচজনে বিশ্বাস করতে পারল কেমন করে? অতুলদাও খুব আশ্চর্য হতেন যখন কবি বলতেন লোকে তাঁকে স্নেহহীন মানুষ মনে করে। এ নিয়ে অনেক আলোচনার পরে একদিন তিনি কারণ আবিষ্কার করেন, বলেন: "কি জানো দিলীপ, কবি অত্যন্ত স্পর্শকাতর তো, তাই কে কবে কী বলেছে মনে রেখে ভেবে বসে আছেন যে সবাই তাঁকে ভাবে বেদরদী, স্নেহহীন। কিন্তু তুমি আমি অকুতোভয়ে এজাহার দেবই দেব আমরা যা দেখেছি। যে এমন স্নেহশীল দরদী মানুষ খুব কমই দেখা যায়।" ব'লেই ধরলেন তাঁর স্বরচিত রবি-স্তব: "জয়তু জয়তু জয়তু কবি! জয়তু পূরব উজল রবি।" এ-গানটি বড় সুন্দর গাইতেন অতুলদা।

ভেবেচিন্তে আমারও মনে হয়েছে যে অতুলদার নিদানই সত্যি—কবিকে নিঃস্নেহ বা অমিশুক বলে তারাই যারা তাঁর কাছে কিছু-না-কিছু চেয়ে পায় নি। কে না জানে—প্রত্যাশাই আনে সংঘর্ষ, ক্ষোভ, বিমুখতা? কিন্তু কবি যে প্রায়ই খেদ ক'রে বলতেন তিনি মানুষের সঙ্গে দহরম মহরম করতে পারেন না—আমাদের এ-এজাহারের স্বপক্ষে আর একটি প্রমাণ পেশ করি। ১৩৪০এ কবি দার্জিলিং যাবার কথা আমাকে লেখেন। উত্তরে আমি লিখি দার্জিলিংয়ে একটি মহিলার কথা যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান। তাতে কবি লেখেন (বৈশাখ ১৩৪০, তীর্থংকর):

'দার্জিলিং যাব কি না তার স্থিরতা নেই। সেখানে যে-মহিলার কথা লিখেছ আমার সঙ্গে আত্মীয়তা জমানো তাঁর নিজের ইচ্ছা ও নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করবে। লোকের সঙ্গে অজস্র মেলামেশা করার টেকনিক জানি নে, ছেলেবেলা

থেকেই তার অভ্যাস থেকে বঞ্চিত। লোকে তাই নিন্দে ক'রে আমাকে হিমশীতল অহৃদয় বলে। মেনে নিই, ফলভোগ করি। মনে ভাবি হয়ত কোন তাপহীন গ্রহই আমার জন্মগ্রহ। বস্তুতই তাই, চন্দ্র আমার লগ্নে। অতএব কলঙ্ক আমার নয়, সে গ্রহের। নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো।"

কবি প্রায়ই বলতেন এ-গ্রহবৈগুণ্যের কথা—বিশেষ করে তাঁর "মেলামেশা করার টেকনিক না জানার দরুণ।" কিন্তু কবির এ-কথাকে গ্রহণ করি কেমন ক'রে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনে। কজন মহাজন বলতে পারেন বড় গলা ক'রে (শেষ সপ্তক ৪১):

আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্যসখা
তিনি অর্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।...
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্যাদা পাবার,
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝর্ণার মুখে!"

রহস্যপ্রিয়তার কী সুন্দর উপমা! যাঁরা অতিগম্ভীর তাঁরা হাল্কামি করতে ভয় পান পাছে মানহানি হয়। কবির এ-ভয় ছিল না—কেন-না তিনি জানতেন যে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত ললাটে "সৃষ্টিকর্তা পিতামহ" তাঁর স্নেহতিলক পরিয়েছেন সে সবার মাঝে এসে পাত পাতলেও ঐ তিলকের প্রসাদেই নিজের অনন্য-তন্ত্রতার গৌরবকে বাঁচিয়ে চলবে। আর এক উপমা-সম্রাট্, পরমহংসদেব, বলতেন প্রায়ই "সত্যিকার মানীর অপমান করেন না ভগবান্—যে রাজার ছেলে সে মাসোহারা পায়।"

মনে পড়ে কবির কত রহস্য, কৌতুক, হাসি, ছড়া-কাটা আমাদের নিয়ে। তীর্থংকরে কবির কৌতুকপ্রিয়তার অনেক দৃষ্টান্তই দিয়েছি কিন্তু একটি দেওয়া হয় নি। আজ পেশ করি এই সুযোগে।

একবার আমি লক্ষ্ণৌয়ে আমার এক প্রিয়বন্ধুর কাছে কবির "সাজাহান" কবিতাটি প্রায় আদ্যন্ত মুখস্থ আবৃত্তি করি তাঁর মনে উচ্ছ্বাসের রঙ জাগাতে। বন্ধু সহৃদয় হ'লেও রসিক ছিলেন না। তাই তিনি সাজাহানের সুখ্যাতি ক'রেই পিঠ পিঠ তাঁর এক প্রিয় কবি দুর্ধর্ষ বাবুর কবিতা আবৃত্তি করেন। অতুলদাকে একথা

বলতে তিনি আমার সামনে কবিকে বলেন: "জানেন, দিলীপ খুব ঘা খেয়েছে।" কবি মিটমিট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "বাংলা গান গেয়ে একদিন ওস্তাদদের হাতে মার খাবে তুমি—আমি কিন্তু জানতাম। কিন্তু বেশি লাগে নি তো? আহা দেখি, কোথায় মেরেছে গা?"

হেসে বললাম: "না কবি। এ-যাত্রা ওস্তাদে মারে নি—মেরেছেন আমার এক অরসিক বন্ধু।" ব'লে পেশ করলাম যা যা ঘটেছিল।

কবি শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: "কিন্তু ঘা দিলীপ খায়নি অতুল! ঘা খেয়েছি আমিই। এ হ'ল ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো।" ব'লেই আমার দিকে তাকিয়ে: "কেবল একটু অনুরোধ আছে দিলীপ! তোমার বন্ধুকে বোলো তিনি যেন আমার কবিতার আর সুখ্যাতি না করেন। নৈলে হয়ত আমার মনে একটা খটকা থেকে যাবে—আমি বুঝি দুর্ধর্ষ বাবুর মতনই কবিতা লিখি!"

অতুলদা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমি বললাম: 'দুর্ধর্ষ বাবুর কবিতা আমারও ভালো লাগে না, তাই আপনার কথা শুনে আশ্বস্ত হ'লাম। কারণ আমার বন্ধু বলেন তাঁর লেখা অতি সারবান্।"

কবি বললেন: "তা ঠিক। তাঁর ভাবও আছে সারও আছে কথাও আছে—তোড়জোড় সবই আছে, নেই কেবল সুর। অনেক দিন আগে ছিন্নপত্রে আমি একটি উপমা দিয়েছিলাম: কণ্ঠও আছে, ফুঁ-ও আছে, নেই কেবল আগুন।

আমরা ফের হেসে উঠলাম।

কবির রসিকতা সম্বন্ধে দু'একটি কথা মনে হয় আজ—যা বলবার মত। আমি আবাল্য হাসির আবহে মানুষ—জীবনে মিশেছি বহু রসিকদের সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে। হাস্য পরিহাসের রসে আমার বালকচিত্ত যে আশৈশব উর্বর ক'রে রেখে গিয়েছিলেন স্বয়ং পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল—রসিকতায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার ও যিনি যে-কোনো দেশের রসিক-চূড়ামণির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার শক্তি ধরতেন। এহেন রসরাজও রবীন্দ্রনাথের রসিকতায় চিরদিন উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হ'য়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে আসতেন তখন বঙ্গবাণীর এ-দুই বরপুত্রের সম্মিলিত হাস্য-পরিহাসে আমাদের গৃহ কী ভাবে মুখর হ'য়ে উঠত স্বচক্ষে দেখেছি একাধিকবার।

কিন্তু তার পরে কবির সঙ্গে পিতৃদেবের বিচ্ছেদ ঘটার ফলে কবির বিরুদ্ধে একটি বিমুখ ভাব ধীরে ধীরে আমার বাল্যচিত্ত অধিকার ক'রে ব'সেছিল। এ-গুমট

প্রথমে কাটে তাঁর রমণীয় হাসি দেখে। তার পর কত বারই যে তিনি আমাদের মনোলোকে অজস্রধারে তাঁর কথায় কথায় রসিকতার ফুল ছড়িয়ে গেছেন তার কিছু আভাষ দিতে চেষ্টা করেছি আমার নানা লেখায়। কিন্তু একটা কথা বলা হয় নি। বলি আজ।

শ্রীঅরবিন্দ বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে এহেন অনন্যতন্ত্র সমৃদ্ধ মন জগতে খুব কমই জন্মেছে। আমার মনে হয় তাঁর রসিকতার অনন্যতন্ত্রতা সম্বন্ধেও একথা বলা যেতে পারত যে, "তোমারি তুলনা তুমি।" কিন্তু তাঁর রসিকতা ছিল অতি সুকুমার, চিকন, ঝিলিক দিয়ে উঠত থেকে থেকে গম্ভীর কথার মাঝেও একেবারে নিজস্ব ঢঙে। কখনো কেটে চলতেন ছড়া, কখনো দিতেন উপমা, কখনো বা একটি ছোট্ট মন্তব্য। একটি মনে পড়ছে। কলকাতায় অতুলদার এক বোন শ্রীমতী কিরণ বসুর সুরম্য বাড়িতে একবার অতুলদা কবিকে নিমন্ত্রণ করেন। আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাঁকে গান শোনাবার। আমি কবিকে অতুলদার কয়েকটি গান শোনাতে তিনি প্রীত হ'য়ে হেসে বলেন: "কিন্তু দিলীপ, ওস্তাদিপন্থী হ'য়েও তুমি আমাদের ম'ত বাংলা গানের গোয়ালে বাতুলের মতো মাথা মুড়োলে যে-অতুলের প্রভাবে তাকে অতুলনীয় না বলবে কে?"

ব'লেই মৃদু হেসে: "কিন্তু আমি একবার এক মহা ওস্তাদের গান শুনতে শুনতে বুঝেছিলাম অতুল, হিন্দুস্থানি ওস্তাদেরা যা পারে বাঙালি তা পারে না—ও যে পারে সে আপনি পারে।"

অতুলদা (কৌতুকস্মিত চোখে আমার দিকে কটাক্ষ ক'রে পুলকিত হ'য়ে): কি রকম কবি!

কবি: আর কি রকম! ঐ তো দিলীপ ঠায় ব'সে এতক্ষণ গাইল—তানও কিছু কম দিল না! কিন্তু পারল সেই ওস্তাদের মতন কুরুক্ষেত্র ক'রে শতরঞ্চিটাকে কোলে তুলে নিতে?

কিন্তু যে-ভাবে চোখ মিটমিট ক'রে ওস্তাদপ্রবরের এ-অবিশ্বাস্য লুণ্ঠন-কৃতিত্বের কথা কবি বর্ণনা করেছিলেন তার আভাষ দেব কী ক'রে? সে-চাহনির পরিবেশে তাঁর হাসি যে কী অপরূপ হ'য়ে উঠত জানেন তাঁরাই যাঁরা মেতে উঠতেন সে সহজ হাসির শিহরণে।

তারপর কথা ছিল কবি তাঁর একটি সদ্যোজাত নাটক পড়বেন। গান ও হাসির অধ্যায় সাঙ্গ হ'লে আমি কবিকে বিনীত ভাবে বললাম: "এবার পড়লে কী হয়?"

কবি হঠাৎ কী যে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন—মুখ দেখে মনে হল এ-মানুষ হাসির ছায়াও মাড়ায় নি কোনো দিন, বললেন দাড়িতে হাত বুলিয়ে : "পড়া হয়।"

একবার আমার সামনে এমনি ঘনঘোর মুখে দাড়িতে হাত বুলিয়ে রাণু দেবীকে বলেছিলেন : "গোঁপেশ্বরের কাছে কীই বা গান শিখছ? যদি দাড়ীশ্বরের কাছে শিখতে, তো দেখতে রাণু!"

সত্যিই রসিকতার ফুলঝুরি কাটত তাঁর রসনা যখন তখন—আর একেবারে আচম্‌কা। আমার মনে আছে এ-সম্পর্কে তাঁকে একদিন আমি বলেছিলাম : "আপনার নানা মন্তব্যের মধ্যে এমন একটা চম্‌কে দেবার ভাব ফুটে ওঠে সময়ে সময়ে যে—কী বলব? চম্‌কে উঠি আর কি—যেমন উঠেছিলাম সেদিন প্লটার্কের জীবনীতে পড়তে পড়তে কেটোর মন্তব্য : 'আমার মর্মর প্রতিমূর্তি না গড়লে লোকে যদি প্রশ্ন করে কেন গড়া হ'ল না—সেই ভালো। গ'ড়ে কাজ নেই, কে জানে—লোকে যদি শুধায় কেন গড়া হ'ল?' *

কবি এ-রসিকতাটি শুনে খুব হেসেছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর নানা রসিকতার মধ্যেই এই ধরণের চমক থাকত ব'লেই তাঁর হাসি হ'য়ে উঠত চিত্ত-চমৎকার। একথার কয়েকটি অপরূপ দৃষ্টান্ত পেলাম "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"-এ মৌখিক রসিকতায় কীভাবে কবি প্রায়ই ঠিক এই ধরণের হাসির ঝর্ণা বইয়ে দিতেন মনে চমক জাগিয়ে। এর মধ্যে থেকে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ ক'রতে পারলাম না আরো এই জন্যে যে এই শ্রেণীর অনবদ্য সুকুমার রসিকতাকে বলা যেতে পারে কবির রসিকতার একটি স্বরূপজ্ঞাপক (characteristic) বৈশিষ্ট্য—একবারে "টিপিকাল"।

কবি বলছেন মৈত্রেয়ী দেবীকে : "জানো, একবার আমার একটি-বিদেশী অর্থাৎ অন্য প্রভিন্স-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। ···সাতলক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে। দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মতো এককোণে ব'সে রইল। আর একটি যেমন সুন্দরী তেমনি চটপটে।···একটুও জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালে ভালো—তারপর 'মিউজিক' সম্বন্ধে আলোচনা সুরু

* "I had rather men should ask why my statue is not set up, than why it is".
(Plutarch's Lives)

হ'ল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়! এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়স হয়েছে, কিন্তু শৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন,—'Here is my wife', এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে—'Here is my daughter!'···আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি ক'রে চুপ ক'রেই রইলুম, আরে তাই যদি হবে তবে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন! যাক্, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়।···যাহোক হ'লে এমনই কি মন্দ হ'ত? মেয়ে যেমনই হোক না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে তো এ হাঙ্গামা করতে হ'ত না। তবে শুনেছি সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি ভালোই হয়েছে, কারণ স্ত্রীর বিধবা হ'লে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।" (২১ পৃঃ)

"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"-এ কবির এই ধরণের আরো কত উপভোগ্য রসিকতার উদ্ধৃতি আছে!

গল্প বলতে বলতে হাসি, হাসতে হাসতে উপমা যোগে দেখানো যে সামান্য সামান্য ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বড় বড় চিন্তা ও ভাবকে ফুটিয়ে তোলা যায়, উপমার করুণরসের মধ্যে দিয়ে আবার সহজ রসে ফিরে এসে প্রকৃতিস্থ হওয়া······তাঁর আলাপে এই রকম কত কী আনন্দের ও সন্ধানের পাথেয় পেতাম যা দুহাতে খরচ ক'রে ভুলে গিয়েও আবার অনেক দিন বাদে ফের আবিষ্কার করতাম—কই পাথেয় নিঃশেষ হয় নি তো! সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত প্রতিবারই, যেন নতুন ক'রে: "ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা—বিস্মৃতির মর্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা!" কয়েকটা উদাহরণ দিলামই বা।

আমাদের খুবই পরিচিত একটি অভিজ্ঞতা—প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব এ-হৃদয়লোকে আনন্দ না পেয়েছে কে? কিন্তু আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কজন ভাবুক কবির মতন আমাদের চিন্তাকে চমকে তোলেন দেখিয়ে যে, (শান্তিনিকেতন ১, ৯০ পৃঃ)

"যার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পাশে ব'সে থাকলেও তার আর আমার মাঝখানে একটি সমুদ্র প'ড়ে থাকে—সেটি হচ্ছে অচৈতন্যের সমুদ্র। যদি কোনো দিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হ'য়ে উঠে তখনই সমুদ্র পার হয়ে যাই। তখন আকাশের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন কি মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল রচনা করে না। যে-অহংকার আমাদের পরস্পরের

চারিদিকে পাঁচিল তুলে পরস্পরকে অতি নিকটেও দূর ক'রে রাখে, সে যার জন্মে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপন হ'য়ে ওঠে।" (এ-পার ও-পার)

স্নেহের টানে বিশ্বভুবনের রংবদল হয় কেন ও কী ভাবে—এমন নিপুণ ব্যাখ্যায় কে আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারে?—না, যে স্বভাবে কবি, কেন না কবিই সব আগে দৃশ্যতঃ ভেদের মধ্যে ঐক্যের সুরটি শুনতে পান যেমন পর্বতের তুঙ্গতম চূড়াই প্রথম ধরতে পারে নবারুণের রক্তরাগ।

কিম্বা ধরা যাক্, অনাসক্তি। কোন্ ভাবুক বা সাধক না মাথা বকিয়েছেন প্রশ্নটি নিয়ে—অথচ কেউই যেন ভেবে পার পায় নি। কারণ আসক্তি যতক্ষণ আমাদের ছেয়ে থাকে ততক্ষণ তাকে ছাড়তে হবে ভাবতেও নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সমান সত্য যে, জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর আনন্দের স্বাদ পেতে না পেতে নিম্নতর আনন্দকে বিস্বাদ না লেগেই পারে না। কবি তাঁর "কণিকা"য় এই বিকাশের নাম দিলেন "বড়ো হওয়া":

ভাবে শিশু, বড়ো হ'লে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি' সমস্ত খেলেনা।
বড়ো হ'লে খেলা যত ঢেলা বলি' মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন পানে।
আরো বড় হবে না কি—যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে?

উদাহরণ আরো কতই দিতে পারি—কবি হেসে খেলে কী ভাবে ভাবের মণি জ্ঞানের মাণিক ছড়িয়ে গেছেন। আমি এখানে শুধু তাঁর আর একটি উপমার কথা বলব যার সরলতা আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে গভীরতাও তেম্নি অভিভূত করেছে।

ব্যাপারটা সৌন্দর্য নিয়ে। কত ভাবুক কত দার্শনিক কত শৌখীনের ব্যাখ্যাই তো পড়েছি, কিন্তু কবির পঞ্চভূতে প্রথম পেলাম সৌন্দর্যের মর্মবাণীটি।

"ব্যোম কহিল, 'ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি, সে তাহার (কেন্দ্রবাসী আত্মার) নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল চিন্তামাত্র। আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম

তবে বস্তুসমষ্টির মতো এমন পর আর কী আছে? কিন্তু আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা, সে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর, তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল—সেদিন বড়োই পুলকের সঞ্চার হইল।"

বলতে বলতে কবির চোখ পড়ল নিজের 'পরে: এইই তো আমার কাজ—কবির কাজ—সুন্দরের সঙ্গে ঘটকালিই যে আমার পেশা তথা নেশা। তাই ব'লে চললেন পরমানন্দে:

"এই সেতু নির্মাণ কার্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারিদিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর পৃথিবীকে আপনার এবং জড় পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে।"

কবির উপমার কথা বলেছি: যারা দেখতে অনাত্মীয়, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, যোগসূত্রহীন তাদের মধ্যে ঐক্যের সুর শোনা—যেমন সুন্দর তেমনি আশ্চর্য নয় কি? সন্ধ্যার আলো নিভে আসে, অন্ধকার আসে ছেয়ে, পরদিন জাগে। কবি দেখলেন আলো নেভে নি, একটু ঢাকা ছিল মাত্র—কোথায়? না, সন্ধ্যার পাপড়িতে:

মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে,
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তারে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

আলো আঁধারের দৃশ্যত দ্বৈতের মাঝে অদ্বৈত মিলনের এম্‌নি একটি উপমা পড়েছিলাম আর এক অপরূপ মিস্‌টিক কবির একটি ছোট্ট কবিতায়—Refuge: রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, তাই এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না (A. E ওরফে জর্জ রাসেলের কবিতা এটি):

Twilight, a timid fawn, went glimmering by,
And Night, the dark-blue hunter, followed past.
Ceaseless pursuit and flight were in the sky
But the long chase had ceased for us at last.

We watched together while the driven fawn
 Hid in the golden thicket of the day:
We, from whose heart pursuit and flight were gone,
 Knew on the hunter's breast her refuge lay.

সন্ধ্যা, ভীরু হরিণী সে, ঝিকিমিকি ঝলকে পলায়,
 নিশীথ, সুকৃষ্ণনীল নিষাদ তাহারে অনুসরে:
এ ছুটেছে শ্রান্তিহীন, ও তাহার পিছে পিছে ধায়
 সুদীর্ঘ মৃগয়া হ'ল সাঙ্গ অবশেষে দিগন্তরে।
দেখিনু সেক্ষণে চাহি' শঙ্কিত উধাও হরিণীরে
 লুকাতে দিনের স্বর্ণারণ্য-চক্রবালে—পেয়ে ভয়।
আমরা বিরাজি এই লুকোচুরি খেলার বাহিরে:
 জানি—নিষাদেরি বুকে শিকারের অন্তিম আশ্রয়।

বারো

সংসারে সইতে হয় সবাইকেই। পরমহংসদেব বলতেন: "যে সয় সেই রয়।" ভাগবতে অবধূত বলেছেন যে, পৃথিবীর কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন সইতে ও ক্ষমা করতে। তার বুক আমরা ক্ষতবিক্ষত করি চ'ষে, তার বুকের উপরে ভার চাপাই, রথ চালাই, আগুন জ্বালাই—না করি কী? তবু সে শুধু যে সয় তাই নয়, পদে পদে ক্ষমা ক'রে আমাদের দেয় তার প্রেমের দান—শস্য, ফুল, ফল। এ-সংসারে দুটি মানুষের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলাম যাঁদেরকে পৃথিবীর সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে: রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। এঁদের দুজনকে আমার দেয় ছিল শুধু বিনম্র ভক্তি অর্ঘ। কিন্তু উভয়কেই আমি আমার অসম্পূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে দিয়েছি আঘাত আমার অবিনয়ে ও স্পর্ধায়। আমার একটিমাত্র সাফাই আছে: এঁদের দুজনকেই আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই বার বার আঘাত করেছি ভালোবাসার ঔদ্ধত্যে। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছিলাম যে, শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা আঘাত দেয়-না—সয়, বিচার করে না—বোঝে, শাস্তি দেয় না—ক্ষমা করে। কিন্তু শুনলেই উপলব্ধি করা যায় না—ধারণা তথা জ্ঞানও চাই সেই সঙ্গে। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে, সিদ্ধি আসে পরপর তিনটি সাধনায়: শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। শ্রীঅরবিন্দের কথা পরে হবে। এখন বলি কবির কথা।

তাঁর কাছে শুনবার আগ্রহ ছিল আমার অফুরন্ত। না, নিজের পরে অবিচার করাও কিছু নয়—শুধু শোনাই নয়, কবি যা বলতেন তাকে পরিপাক করবার চেষ্টা করতাম সত্যই—মননশক্তির জারকে। কিন্তু যথাযথ ধ্যান করি নি যেমন করেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের বাণীকে নিয়ে।

গুরুবাদীরা বলতে পারেন হয়ত যে, এতে অন্যায় কিছু হয় নি কেননা কবি-বাক্যের মর্যাদা গুরুবাক্যের সমকক্ষ নয়। একথাটা খানিকটা অবধি আমি মানি। কিন্তু মামুলি গুরুবাদী আমি হতে পারি নি যখন, তখন আমার মুখে সাজে না একথা বলা যে, কবিবাক্যকে আমি সে-মর্যাদা দিলে অন্যায় করতাম, যে-মর্যাদা গুরুবাক্যকে দিয়েছিলাম। আর একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি ঠিক কী বলতে চাইছি।

কবির সঙ্গে অনেক সময়ে অশোভন তর্ক বাধালেও সেই সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আমার মনে তাপের সঙ্গে আলোও উঠত জলে। সম্ভবতঃ এটা তিনি জানতেন তাই আমাকে লিখেছিলেন যে তিনি আমাদের "সমবয়সী"। কিন্তু তাঁকে "বেদীতে চড়িয়ে" রাখব এ তিনি চান না—এ হ'ল তাঁর দিকের কথা—অর্থাৎ তাঁর মুখেই শোভন, আমাদের মুখে নয়। আমাদের কর্তব্য তাঁর মান রাখা এইটি মনে রেখে যে তিনি নিজগুণে আমাদের সঙ্গে এসে আসর জমালেও আমাদের পক্ষে এ-ভুল করা মারাত্মক যে তিনি আমাদের সঙ্গে মাথায় সমান। অথচ তর্কের ঝোঁকে এই ভুলটিই আমি করতাম—যৌবনের রোখে, অহমিকার মোহে। তাই আমি দেখেও দেখতে পাই নি যে, গুরুবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামতের অনেকখানিই আমাকে প্রভাবিত করেছিল অজান্তে। সে-কথাটি তিনি আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন একটি ভাবগভীর পত্রে। পত্রটির গোড়াকার কথা ছিল : "আদিকাল থেকে কত বাণী বহন ক'রে কত মানুষই আসছেন, আমার কান পাতা আছে।...মানুষের বিশ্বসমাজে কত জ্ঞানের গুরু, বিজ্ঞানের গুরু, কর্মের গুরু, রসের গুরু কেবলি আসা-যাওয়া করেন, তাঁরা দিব্য মানবের কোনো না কোনো পরিচয় বহন ক'রে আনেন, যথোচিত ভাবে তাঁদের সবাইকেই জানতে হবে।...গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যযুগের সাধকদের কথাই সবচেয়ে মনে লাগে। অর্থাৎ শেষকালে এই অহংকারে এসেই ঠেকে যে, তাঁদের মনের যন্ত্রের ধ্বনি আমার মনের তারে ঠিক সুরে প্রতিধ্বনিত হয়। সেদিনকার সাধকেরা বাঁধা মত ও শাস্ত্রের বেড়ার বাইরে এসে পড়েছিলেন। যে-প্রেরণায় তাঁরা উদ্বোধিত সেটা যেন বিশ্বপ্রাণ থেকে এসেছিলো তাঁদের মধ্যে।" (তীর্থংকর—১ম সংস্করণ ২৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নটি জটিল। কারণ ভারতীয় সাধকেরা গুরুবাক্যকে ইষ্টবাক্য ব'লে মনে করার দীক্ষাই দিয়ে এসেছেন ও ব'লে এসেছেন—গুরুর কথা নির্বিচারে মেনে নিতে না পারলে মুক্তি নৈব নৈব চ। এ প্রাচীন নজিরে কি আমাদের আধুনিক মন পুরোপুরি সায় দিতে পারে? বলতে পারে কি বুকে হাত দিয়ে যে গুরু আর ইষ্ট যে এক এ আমি উপলব্ধি করেছি ব'লেই জেনেছি যে, গুরুবাক্যকে ইষ্টবাক্যেরই পদবী দিতে আমার মন প্রস্তুত? কবীর বলেছিলেন:

গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে কাকো লাগূঁ প্যায়?
বলিহারি গুরু অপনে—জিন গোবিন্দ দীনো বতায়

অর্থাৎ গুরুর পায়েই আগে প্রণাম করা চাই যেহেতু তিনিই আমাকে গোবিন্দের কাছে এনে দিলেন।

কিন্তু আমরা কি এ-শ্রেণীর বাণীতে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিতে পারি? আপ্ত-বাক্যে তো এও আছে যে ইষ্ট মারলে গুরু রাখতে পারেন, কিন্তু গুরু মারলে ইষ্ট বাঁচাতে পারেন না। আমি অনেক তুতিয়ে পাতিয়েও আমার মনকে এ-ধরণের গুরুস্তবে সায় দেওয়াতে পারি নি। যাঁরা পেরেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ঈর্ষা করি না। কারণ, আমার মন বলে: গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্—এ-সত্য যতক্ষণ না চাক্ষুষ করছি ততক্ষণ গুরুকে ভক্তি শ্রদ্ধা পূজা করতে পারি সর্বান্তঃকরণে, কিন্তু ভগবানের পদবী দিতে পারি না। এ পারে কেবল সেই ভাগ্যবান্ যে গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন এ-সত্য উপলব্ধি করেছে। কিন্তু যে করেনি ও যতক্ষণ করেনি ততক্ষণ "গুরু ভগবান্ কাজেই আমার কাছে অভ্রান্ত"—এ-অঙ্গীকার তার মুখের কথাই থেকে যাবে, প্রাণের কথা হবে না তো।

প্রশ্নটি আমার কাছে আরো জটিল মনে হয় এই জন্যে যে, এক্ষেত্রে আমার মন খানিকটা সেকেলে খানিকটা একেলে, খানিকটা কবীরপন্থী খানিকটা রবীন্দ্রপন্থী, খানিকটা বরণ-তান্ত্রিক খানিকটা বর্জনতান্ত্রিক। তাই আমি শ্রীঅরবিন্দকে খোলা-খুলি জানিয়েছিলাম: আপনাকে জ্ঞানিরাজ ও যোগিরাজ ব'লে বরণ করেছি অকুণ্ঠেই, কিন্তু আপনি ভগবান্ একথা মানব কেবল সেদিন যেদিন আপনার মধ্যে ভগবান্‌কে দেখব। যতদিন এ-সত্য প্রত্যক্ষ না করব ততদিন আমার মন কিছুতেই একথা মেনে নেবে না যে গুরু ভগবান্।" শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে মহা ঋষিকে আমি অনুভব করেছিলাম—তাঁর "সাবিত্রীর" মধ্যে শুনতে পেয়েছিলাম ঋঙ্মন্ত্রের অপৌরুষেয়

স্পন্দন, তাই সেখানে কোনো গোল হয় নি, কিন্তু গুরুবাদ সম্বন্ধে ঝোঁকের মাথায় কবিতা লিখে যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে তিরস্কৃত হই তখন প্রথমটায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলেও শেষে বুঝেছিলাম যে তাঁর শেষ কথাটি আমারও মনের কথা : যে আপ্তবাক্য বা গুরুবাক্যের আমি ততটুকুই মনেপ্রাণে বরণ করতে পারি যতটুকু—কবির ভাষায় —"আমার মনের তারে ঠিক সুরে প্রতিধ্বনিত হয়।" "এর বেশি পারি" যদি বলি তবে সেটা হবে গাজোয়ারি কথা—সত্যের অপলাপ।

কিন্তু মুস্কিল এই যে এমন কয়েকটি সাধক-সাধিকার খবর পেয়েছি যাঁদের মনে এখানে দ্বন্দ্ব নেই—অর্থাৎ যাঁরা গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন একথা ষোলো আনা বিশ্বাস করেছেন। তাঁদের এ-বিশ্বাস প্রত্যক্ষ সত্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা আমি জানিনা—হয়ত আমার মন যে-ভাবে গ'ড়ে উঠেছে তাতে ক'রে আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। কাজেই শেষ পর্যন্ত সশ্রদ্ধে আমি তাঁদের নমস্কার ক'রে বলেছি : "আচ্ছা, ফের দেখা হবে পথের শেষে—তখন মিলিয়ে দেখব কোন্ পাথেয় কাকে কতখানি এগিয়ে দিয়েছে।"

কথাটা এত বিশদ ক'রে বললাম এই জন্যে যে, এই নিয়ে কবির সঙ্গে আমার মাঝে মাঝেই তর্ক বাধত এবং তর্কে আমি হেরে যেতাম নিজের মধ্যেই অনুভূতির কোনো জোরালো এজাহার খুঁজে পেতাম না ব'লে। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর তিরস্কারকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম যে "গুরুকে যে মানতে না পেরেছে" তাকে ভর্ৎসনা করার অধিকার আর যারই থাকুক না কেন আমার নেই—যেহেতু আমি বহু চেষ্টা ক'রেও পুরোপুরি শাস্ত্রবাদী বা গুরুবাদী হ'তে পারি নি। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের কথায়ই আমার মন পুরোপুরি সাড়া দিয়েছে যে : "Worship your Guru as God but do not obey him blindly ; love him heart and soul, but think for yourself. No blind belief can save you ; work out your own salvation."* তথা : "আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না। যথার্থ সাধুতা, উদারতা ও মহত্ত্ব যেখানে সেইখানেই আমার মস্তক অবনত হোক।" †

মামুলি গুরুবাদীরা যুক্তি দিতে পারেন যে গুরুকে একবার ভগবানের মতন পূজা করার পরে অন্ধভাবে তাঁর অনুগামী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ-যুক্তি আমার কাছে গ্রহণীয় মনে হয় না—শ্রীঅরবিন্দের একটি গভীর কথা আমার মন অকুণ্ঠেই

* Inspired Talks - p. 164

† পত্রাবলীর—১ম খণ্ড

মেনে নিয়েছে যে, ভগবান্ সাধকের ব্যক্তিত্বকে মাড়িয়ে যান না, তার মান রাখেন—"God respects your individuality"—এবং এ-কথায় আমার মন সায় দিয়েছে যে, কারণ প্রেমের খেলা নির্ভর করে স্বাধীন ইচ্ছার 'পরে। কথায় বলে না "ঘ'ষে মেজে রূপ আর ধ'রে বেঁধে প্রেম" হয় না?

এ নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছে কম নয়। এক সময়ে প্রাণপণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করতাম:

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

—এই নির্বিচার একনিষ্ঠতাই শ্রেষ্ঠ গুরুবাদের ভিৎ। কিন্তু তার পরে বদ্-গুরুর আশ্রয়ে নানা দুর্ভাগা বন্ধুর দুর্দশা দেখে মত বদলাতে বাধ্য হয়েছি। শেষে বহু ওঠা-পড়ার পর অবশেষে আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন প্রত্যেকেরই আবিষ্কার করতে হবে কোন্ যোগ তার পক্ষে স্বাভাবিক, ঠিক তেমনি আমাদের প্রতি আধুনিক মনের রায়ই হয়ত এই যে, গুরুবাদও ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন, তাই প্রত্যেকেরই আবিষ্কার করতে হবে—কী ধরণের গুরুবাদ তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর বেশি এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি—এবং যেটুকু দেখছি তাও খানিকটা ঝাপসাই বলব।

কিন্তু এর তো চারা নেই: যখন ঠিক চশমাটি না নিয়ে স্পষ্ট দেখতে পারছি না তখন ঠিক চশমাটি পাবার আগে যদি বলি বড় গলা করে যে "স্পষ্টই দেখতে পারছি" বা "যেটুকু দেখছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট"—তা'হলে বলিষ্ঠতার আত্মপ্রসাদ মিলতে পারে বটে, কিন্তু পথ চলতে খানায় পড়ার ভয় কাটে না। তাই বলতেই হবে যে আমার মতে—ভালো দেখতে না পাওয়ার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে ভালো চশমার খোঁজ করা এবং এমন চশমাওয়ালার কাছে যাওয়া যে ভুল চশমা দিয়ে আরো বিপদে ফেলবে না।

কিন্তু মরুকগে, এ-ব্যাসকুটের গ্রন্থিমোচনের ব্যর্থ প্রয়াস। শেষ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো যে, এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত আমি নির্দ্বন্দ্ব হ'তে পারিনি, তবে বিশ্বাস করি যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে সব সংশয়ের ছায়া মিলিয়ে যাবে—দেখতে পাব কী আমার পথ, কোথায় আমার মুক্তি। অবশ্য পরম লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে গুরুবাদ সম্বন্ধে পরে আমার মতের রূপান্তর ঘটবে কি না এখন কী

ক'রে বলব? শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, যদি ঘটে তবে স্বীকার করব অকুণ্ঠে। আন্তরিকতার একটি মাত্র নিকষ আমি জানি :

সত্য যাহাকে আজ মনে হয়—কাল যদি হয় মিথ্যা মনে,
মানিব আমার হয়েছিল ভুল নব সত্যের উদ্বোধনে !

একথা বলার দরকার বোধ করছি এই জন্যে যে অনেক বন্ধুর মুখে এই অভিযোগ শুনি : "কিছুদিন আগে তুমি যা বলতে এখন বলছ তার উল্‌টো।" অভিযোগ তাঁদের সত্য, কিন্তু রায় তাঁদের নামঞ্জুর যে এর জন্যে ফাঁসি হওয়াই আমার যোগ্য শাস্তি। আর নামঞ্জুর শুধু এই জন্যেই নয় যে, দৃষ্টির পরিধি বাড়লে সত্যের চেহারাও কিছু না কিছু বদ্‌লে যায়ই, এজন্যেও বটে যে প্রতি ভুলের মধ্যে দিয়েই আমরা পৌঁছই সত্যের কাছে, তাই ভুল স্বীকার করতে যে পথিক ভয় পায় সে লক্ষ্য জানলেও লক্ষ্যে পৌঁছবার দিশা পায় না। কবির কণিকায় একটি উক্তি আছে :

দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে : 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আমাকে লেখা একটি পত্রে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রে এর আরো একটু ভাষ্য করেছিলেন এই ব'লে যে, পাছে মিথ্যা বিশ্বাস ক'রে মজি এই ভয়ে যারা বিশ্বাসকে বরখাস্ত করে সত্য বিশ্বাসও তাদের কাছে আসবার পথ খুঁজে পায় না।

কবির—তথা শ্রীরমণ মহর্ষির—কথাবার্তায় নিত্যই এই মহাসত্যের দীক্ষা পেতাম যে, ভয়ের মতন ভয়াবহ সত্যপরিপন্থী খুব কমই আছে। কিন্তু ভয়কে পুরোপুরি জয় করতে পারে কে? মহর্ষি বলতেন : "যার আত্মবোধ হয়েছে, যে অনাসক্ত।" রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনে অনাসক্তির জয়গান ক'রে এসেছেন আবহমান কাল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যখন এত কথাই বললাম তখন আর একটা কথাও বলি যা শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে আমার কাছে যেন আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। কথাটা এই যে বুদ্ধির দীপ্তিতে ও চিন্তাশীলতায় য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ভারতের ভাবুকদের সমকক্ষ হ'তেও পারেন, না হ'তেও পারেন—নানা বিচারকের নানা রায় হ'তেও পারে—কিন্তু বুদ্ধি যখন অধ্যাত্ম আলোয় শুদ্ধতর হয় তখন সে কী নিষ্কল রূপ ধরে সে-খবর অন্তত এ-যুগের য়ুরোপের মনীষীদের বুদ্ধির কাছে পাওয়া

যায় না। কারণ য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বুদ্ধির মধ্যে ইহলৌকিকতার নানারঙা রশ্মিরাগ আমাদের চিত্তহরণ করলেও তার মধ্যে মেলে না সে আত্মসমাহিতি, নির্বেদ, উর্ধ্বদৃষ্টি যা মেলে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে। দুএকটি উদাহরণ দিলে হয়ত আমার বক্তব্যটি ফোটানো সহজ হবে।

য়ুরোপের মনীষীরা আদর্শের জন্যে ছাড়তে পারেন অনেক কিছু, কিন্তু তাঁদের অন্তিম লক্ষ্য, পাওয়া—লাভ—এককথায় প্রবৃত্তি। ভারতের আত্মা একথায় সায় দিয়েও দেয় না। তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবুকেরা চিরদিনই ব'লে এসেছেন যে ভোগ করতে হবে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে—শুধু পাওয়া শুধু ভোগ শেষ পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ায় দুর্ভোগ—যার অন্তিম পরিণতি—অতিতৃপ্তির অগ্নিমান্দ্য boredom or ennui. (বিজ্ঞানের আণবিক বোমা বরদানের পূর্বে অলডাসের একটি লেখায় পড়েছিলাম যে য়ুরোপের কাছে সবচেয়ে কৃষ্ণকায় রাক্ষস যুদ্ধ নয়—boredom)

রবীন্দ্রনাথ এই দুর্ভোগের আঁচ পেয়েছিলেন—তাঁর ভারতীয় চিত্তে আলোক-লোকের আলো পড়েছিল ব'লেই। তাই বলেছিলেন তাঁর অনন্যতন্ত্র মনের আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গিতে [শান্তিনিকেতন—পাওয়া ও না-পাওয়া] :

"আমরা জগতে পাওয়ার ম'ত পাওয়া তাকেই বলি যার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে।...আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয়, সে না-পেতেও চায়। এই জন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্য স্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে: কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হ'য়ে গেলুম—(ফের সেই অতিতৃপ্তির boredom লক্ষ্যণীয় !) —আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।..."

এই জন্যেই উপনিষৎ বলছেন: অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্—যিনি বলেন: 'আমি তাঁকে জানি নি' তিনিই জানেন, যিনি বলেন: 'আমি জেনেছি' তিনি জানেন না।"

বলতে না বলতে কবির আশ্চর্য মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল আশ্চর্য উপমা—যার দীপ্তি বহির্মুখী য়ুরোপের মনে আর ফুল ফোটাতে পারে না—কবি বললেন :

"আমি তাঁকে জানতে পারলুম না, একথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন ক'রে জানে 'আমি আকাশ পার হ'তে পারলুম না,' তেমনি ক'রে জানা চাই। পাখি আকাশকে জানে ব'লেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না...আমি

আকাশকে শেষ ক'রে জানলুম না, এই জেনে না জানাতেই তার আনন্দ—ব্রহ্মকে জানার ক্ষেত্রেও এই কথাটাই খাটে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেন: নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ—আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এ-ও নয়, আবার আমি যে একেবারে জানি নে এ-ও নয়।"

তাঁর একটি গানে এই হারানোর মধ্যে দিয়ে পাওয়ার বাণী আরো মধুর হ'য়ে ফুটেছে—"তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ, ও মোর ভালোবাসার ধন—দেখা দেবে ব'লেই তুমি হও যে অদর্শন, ও মোর ভালোবাসার ধন!"

এই মিস্টিক সুর য়ুরোপে অতীতকালে খানিকটা ফুটেছিল, কিন্তু হাল আমলে বলিষ্ঠ য়ুরোপ মিস্টিককে পরম অবজ্ঞাভরে ধোঁয়াটে ব'লে বর্জন করেছে। তাই না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে পাওয়া, যিনি বলেন জানি না তিনিই জানেন—এ শ্রেণীর ভাবগভীর অনুভূতিকে এ-যুগের পাশ্চাত্য ভাবুকেরা তথা বৈজ্ঞানিকেরা সরাসর "ননসেন্স" ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়ে পরম গৌরব অনুভব করেন!

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ য়ুরোপের বড় দিকটার গভীর অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু ভারত যে কোন্‌খানে বড় সে-সত্যটি কোনোদিনই তাঁদের চোখের আড়াল হয় নি। ভারতের এই অধ্যাত্মদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের লেখার ছত্রে ছত্রে পাই—যে দৃষ্টিকে হারিয়ে য়ুরোপ আজ চলেছে অতীন্দ্রিয় সব অনুভূতি উপলব্ধিকেই অবিশ্বাস ক'রে। কী ধরণের অনুভূতি তাঁদের কাব্যে মেলে তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সহজেই, কিন্তু স্থানাভাব, তাই দুটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেই। "স্ফুলিঙ্গ"-তে কবি লিখেছেন:

> "ফুরাইলে দিবসের পালা
> আকাশ সূর্যেরে জপে ল'য়ে তারকার জপমালা।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপরূপ "সাবিত্রী" মহাকাব্যে লিখেছেন:

> "Night shall awake to the anthem of the stars
> The days become a happy pilgrim march."

অর্থাৎ

> জাগিবে জাগিবে রাত্রি শুনি' নীহারিকার কীর্তন,
> হবে হবে দিনযাত্রা ধ্রুবতীর্থ সুখ-অভিযান।

কিংবা শ্রীঅরবিন্দের অনিন্দনীয় Who কবিতায় (আমার অনামী-তে পুরো কবিতাটি আছে);

In the sweep of the world, in the surge of the ages,
Ineffable, mighty, majestic, pure,
Beyond the last pinnacle seized by the thinker,
He is throned in His seats that for ever endure.

অর্থাৎ

নিখিল ব্যাপ্তি ছেয়ে যুগযুগের কল্লোল মাঝার
চির-অনির্বচনীয়, বিরাট্, শুভ্র, বলীয়ান্,
জ্ঞানী ভাবুক মনীষীর ভাবনার শেষ শিখরের পার
অপার আলোক-সিংহাসনে যে তার নিত্য অধিষ্ঠান।

এর পাশে ধরা যাক্ রবীন্দ্রনাথের বলাকায়—

"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে যে শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া সুরে
চ'লে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি—
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।

মনে করিয়ে দেয় না কি উপনিষদের

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

—যেখানে মন ও বাক্য পৌঁছতে চেয়ে হার মেনে বারবার ফিরে ফিরে আসে!

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ব্যঞ্জনা অন্তহীন কিন্তু তাঁর প্রতি গভীর ভাবেই ফুটে উঠেছে একটি অচিন অধরাকে সম্ভাষণ—চিরপলাতককে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। তাই তাঁর জীবনের একটি মূল অনুভূতি তিনি বাদী পর্দার ম'ত হাজার সুরে ছন্দে দুলিয়ে হাজার ভাবে গেয়ে এসেছেন আগুনের পরশমণির আবাহনে, সীমার মধ্যে অসীমের সুরে, রূপসাগরে অরূপের প্রকাশে। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে এই অপ্রতিবাদ্য সত্য যে তিনি একদিকে যেমন বস্তুবাদীদের ম'ত অপারকে বাদ দিয়ে পারকে আঁকড়ে ধরেন নি, অপরদিকে তেম্‌নি মায়াবাদীদের ম'ত সীমাকে বাদ দিয়ে অসীমার উলুধ্বনি করেন নি। য়ুরোপ (বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে) দৃশ্যের ওপারে অদৃশ্যকে অবাস্তব ব'লে হাসিঠাট্টা করতে চেয়েছে; রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে তাদের এই বিজ্ঞমন্যতাকে আরো একহাত নিয়েছেন নিজের

কবিমনের নৈশ্চিত্যের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। তাই তো তাঁর কাছে অদেখা-ও নিজের অমৃতলোকের বারতা বহন ক'রে এনেছে পদে পদে—তিনি দেখতে পেয়েছেন মরণের নেত্রে অমরণীর অঞ্জন প'রে (শেষ সপ্তক ২১):

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকতার ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার মধ্যে দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

আমি বলতে চাইছি যে, যেহেতু মানবমন অতীন্দ্রিয়ের দূরবীনেই শিখর-অনুভূতির দেখা পায় সেহেতু এ-দূরবীন যার অনায়ত্ত তার কাছে অধরার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। কবি এ-আশ্চর্য দূরবীন নিয়ে জন্মেছিলেন জানতেন ব'লেই নিজের নামকরণ করেছেন দূরের পথিক, অরূপ-রতনের ডুবারি—গেয়েছিলেন:

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি'
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

তরী জীর্ণ, ঘাটে ঘাটে মেলে না অরূপ-রতন, তাই তাঁর বাসনা:

সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হ'য়ে রবো মরি'।

জীবনের প্রতি পাওয়াকেই তিনি ক'ষে এসেছেন এই না-পাওয়ার নিকষে—না-পাওয়ার মধ্যে দিয়েই যে পরিপূর্ণ পাওয়ার উঁকি-ঝুঁকি।

তাঁর কত কথায় আলোচনায়ই তিনি ইঙ্গিত করেছেন—সুপ্রকাশের ছায়ার মধ্যে দিয়েই চির-প্রচ্ছন্নের আলো ফুটে ওঠে ব'লে কোনো কিছুরই পরমতম এজাহার কেবলমাত্র অতিপ্রত্যক্ষের মধ্যে মিলতে পারে না—অগোচরকে না ছুঁলে গোচরকে নিয়ে দিনের পর দিন হাজার ঘর করলেও তার পরমস্বরূপকে জানা যায় না।

সংসারে সব রূপের সব প্রকাশের মধ্যেই তাই তিনি চিরদিন সন্ধান ক'রে ফিরেছেন সেই অরূপের, যার রঙেই রূপ হ'য়ে ওঠে অপরূপ, প্রকাশ চরিতার্থ হয় অপ্রকাশের কাছে হার মেনে।

একথা আমি প্রথম বুঝবার কিনারায় আসি এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায়—যেদিন তিনি নারী সম্বন্ধে তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিটিরই আভাষ দিয়েছিলেন। আমার Among the Great-এর সব শেষে আমি প্রকাশ করেছি তাঁর এই অপূর্ব ভাষণটি—আমার স্বকৃত ইংরাজি তর্জমায়। কবি এ-তর্জমাটি পরে প'ড়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মূল বাংলা অনুলিপিটি প্রকাশ করি নি সে সময়ে—কারণ ইচ্ছা ছিল এ-বিষয়ে কবির সঙ্গে আর একবার নিরালায় ব'সে আলোচনা ক'রে পরে প্রকাশ করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় Among the Great প্রকাশিত হবার পরে কবির সঙ্গে আমার মূল বাংলা কথালাপটির রিপোর্ট হারিয়ে যায় কবির অনেকগুলি মূল্যবান্ চিঠির সঙ্গে। এ-দুঃখ আমার যাবে না কোনোদিন। কিন্তু সে অন্য কথা। এ-ভাষণটির ভূমিকা শেষ করি।

১৯২৭ সালে যখন আমি দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন এ-কথালাপের রিপোর্টটি টাইপ ক'রে পাঠাই হাভেলক এলিস সাহেবকে। তিনি আমাকে এ-সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসে লেখেন:

"It gives me joy to find that Tagore says clearly, at almost every point, what I have said, or tried to say clearly, in my book **Man and Woman**. On the whole I could hardly desire to see a more beautiful presentation in a short space, of a conception which corresponds to my own, than what Tagore has put into this conversation, with a skill in speech beyond me."

কিন্তু এলিস সাহেবের Man and Woman বইটি প'ড়ে আমি একটু নিরাশই হয়েছিলাম। কেন না তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কবির বক্তব্যের কিছু মিল থাকলেও কবি তাঁর কথালাপের মধ্যে দিয়ে নারীর স্বরূপের যে নিটোল মাধুর্য ও অপরূপ মহিমাটি ফুটিয়ে তুলেছেন এলিস সাহেবের বহির্মুখী দৃষ্টিতে সে-মহিমাটি আদৌ মূর্ত হ'য়ে ওঠেনি। এ শুধু আমার নিজের কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে। তাঁর মন্তব্যটি গভীর ব'লে এখানে উদ্ধৃত করছি আরো এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় আত্মার একটি পরম প্রকাশ আমার এ-ধারণা কৃষ্ণপ্রেমের

পত্রে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন তাঁর আলমোড়ার তপোবন থেকে (১৪. ৯. ৪৫):

"I have just finished reading your conversation with Rabindranath in **Among the Great.** In particular I liked the discussion on the separate **dharma** of Man and Woman. Nothing I have ever read of his writings struck me as so deeply and sensitively true. I dare say Havelock Ellis did say something of the sort in his own way, but I am quite sure it didn't have the sensitiveness of Rabindranath's treatment nor will it have been delineated against a spiritual background...... After all, India is India···"

ভারতের এই আত্মিক আবহের মূল্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তথা শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁদের নানান্ সুচিন্তিত মতামত। সেসবের সার মর্ম এই যে এই অধ্যাত্মসংস্কার ভারতীয় ভাবুকের সহজাত। রবীন্দ্রনাথ নারী সম্বন্ধে তাঁর যে আধ্যাত্মিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ফুটিয়ে তুলেছেন তার গোড়াকার কথাটি এই যে নারী পুরুষের আত্মার আত্মীয়া—শক্তিস্বরূপিণী। এ-দৃষ্টিভঙ্গি য়ুরোপের চিন্তার আবহে আজ পর্যন্ত ফুটে ওঠে নি ব'লেই আরো বহু য়ুরোপীয় ভাবুক এ-যুগে তাঁর নারীর মূল্যায়ন সম্বন্ধে সচকিত হ'য়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রশস্তিটি উদ্ধৃত করলাম শুধু এই কথাটির 'পরে জোর দিতেই।

আমার অনেকদিন থেকেই এ-আলাপটির অনুবাদ করার ইচ্ছা ছিল, তবে নানা কারণে হ'য়ে ওঠে নি। আজ যথাসাধ্য কবির শৈলী ও ভঙ্গি বজায় রেখে স্মৃতিচারণে এটি প্রকাশ ক'রে তৃপ্তি বোধ করছি। স্থলে স্থলে কবির শৈলীকে আদর্শ ক'রে অনুবাদ ঠিক মূলানুগ না ক'রে ভাবানুগ করেছি।

আর এ-সূত্রে একটি অঙ্গীকার করতে পারি অকুতোভয়েই: যে, কবির মূল বক্তব্যটির পরে আমি কোথাওই রং চং লাগাই নি বাহাদুরি দেখাতে চেয়ে।

তেরো

শান্তিনিকেতনে অতুলপ্রসাদ ও আমার সঙ্গে ১লা জানুয়ারি ১৯২৭ সালে সকালে কবি বলেন লণ্ডনে তাঁর প্রথম রোমান্সের কথা। কবি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে ভোগের চাবিটি আছে সংযমের হাতে—অর্থাৎ অসংযমে ভোগ হ'য়ে ওঠে দুর্ভোগ। নরনারীর সম্বন্ধে একথা খাটে সবচেয়ে বেশি—বলতেন তিনি—কেন না এ-আদান প্রদানে দম্পতি পরস্পরের টানে সবচেয়ে লাভবান হয় পবিত্রতার আবহে। সেদিন তিনি তাই শেষে বলেছিলেন আমাদের (তীর্থংকর ১৪৬ পৃঃ) :

"আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রেই : যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি···প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো—আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—'ফেভর'। কারণ আমি এটা বরাবরই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালোবাসা···আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে-ফুল হয়ত পরে ঝ'রে যায়—কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"

যেদিন সকালে কবি অতুলদা ও আমার সামনে এই সব কথা বলেন সেদিন সন্ধ্যায় আমি ওঁকে একলা পেতে চেয়েছিলাম কোনো বিশেষ কারণে। সৌভাগ্য-বশতঃ সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে কেউ ছিল না। তিনি একদৃষ্টে নানারঙা মেঘের দিকে চেয়ে দেখছিলেন তারা ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে বহুরূপীর ম'ত। একটি মৌমাছি তাঁর শুভ্র কেশের চারপাশে পরিক্রমা করছিল। কী সুন্দর যে তাঁকে দেখাচ্ছিল অস্তাকাশের রাঙা আলোয়!···

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কবি হাসলেন তাঁর চিরস্নিগ্ধ হাসি। বহুরূপীর মতনই তাঁর মুখের ও মনের ভাব বদলাত ক্ষণে ক্ষণে। বললেন : "কী? চুপ ক'রে কেন?"

আমি হেসে বললাম : "আপনাকে এমন ছবির মতন দেখাচ্ছে যে যুদ্ধং দেহি মূর্তি আমার উবে গেছে।"

কবি পরিহাসের সুরে বললেন : "রাখো হে রাখো। তোমাকে কি আমি চিনি নি হাড়ে হাড়ে? ভালোমানুষি তোমাকে মানায় না—কিন্তু রোসো, আলো নিভে আসছে। চলো যাই আমার বসবার ঘরে।"

কবির সামনে চৌকি টেনে নিয়ে বললাম: "মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি আজ সকালে যা যা বললেন আমি লিখে রেখেছি। আপনাকে দেখিয়ে নেব কালপরশু। কিন্তু আজ এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে—যদি আপনার সময় থাকে—"

কবি (হেসে): অত বিনয়ও তোমাকে মানায় না হে। ধরো নিজমূর্তি। বলো কী প্রশ্ন? মেয়েরা ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'ল কেন?

আমি (হেসে): আপনি অন্তর্যামী। সত্যিই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—মেয়েরা যে আজকের দিনে ষোলো আনা পুরুষালি ঢঙে দীক্ষা নেবার বায়না ধরেছে—বলা সুরু করেছে যে নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব একই—এ-সম্বন্ধে আপনার কী মত?

কবি: উত্তরে বলতে হয় আমাকে একটা অতি পুরোনো কথা—যাকে ইংরাজিতে বলে প্ল্যাটিচিউড। কারণ আমি বরাবরই ব'লে এসেছি নারী পুরুষকে পূর্ণ করতেই এসেছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে নয়। কথাটা শুনতে খানিকটা সেকেলে শোনাতে পারে—কিন্তু কোনো উপলব্ধি যদি সত্য হয় তবে সময়ের শিলমোহরে তার খতিয়ে শ্রীবৃদ্ধিই হয়। তাই মামুলি শোনালেও আমি নিরুপায়—আমাকে বলতেই হবে সেই একই কথা: যে, পুরুষের কীর্তির প্রতিযোগী হ'তে চেয়ে যদি নারী কোমর বেঁধে পুরুষের আখড়ায় নামে তবে তাতে ক'রে শেষ পর্যন্ত তার লাভ হবে না—হবে ক্ষতি। কারণ জীবনকে যা সুষমিত করে না তাকে হাতিয়ে নিতে ছুটলে মেয়েদের অন্তর কোনো গভীর তৃপ্তি পেতেই পারে না। শ্রীমন্তিনী রাজত্ব করুক তার নিজের জগতে—যার নাম শ্রী, সুষমা, মাধুরী। তাকে জেগে থাকতেই হবে তার স্বভাবে—আরো এই জন্যে যে তার সহধর্মী সহজেই ভুলে যায় যে তার পৌরুষ ও শক্তি পুরুষের পরুষ সভ্যতায় অজস্র ফাটল ধরাবার গুপ্তচরদেরই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে—জান্তে বা অজান্তে। মেয়েরা এই অস্থিরতার রসদ যোগালে চলবে কেন? তার লক্ষ্মী-সত্তার মঙ্গল স্পর্শে হারিয়ে-যাওয়া ভারসাম্যকে তাকেই যে হবে ফিরিয়ে আনতে, সারিয়ে তুলতে; পুরুষের সভ্যতা দিশা হারায় সহজেই: নৌকা তার ঝড়তুফানে সহজেই ওঠে দুলে—তাই মেয়েদেরই 'পরে ভার তাকে ঠিক পথে চালানো। নৈলে ভরাডুবি হবেই হবে।

আমি (একটু ভেবে): কিন্তু তা'হলে কি আপনি বলতে চান—পুরুষের যেসব অধিকার আছে মেয়েরা সেসবের অনধিকারী?"

কবি: ঠিক তা নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে মেয়েদের স্বধর্ম পুরুষের স্বধর্মের

প্রতিরূপ নয়। আমি বলছি না যে সে পুরুষের সহযোগিতা করবে না—তাকে হ'তে হবে বৈ কি পুরুষের সহচারী—অনেক সময়ে তার দিশারিও সে হ'তে পারে —কিন্তু তাকে মনে রাখতেই হবে যে সহযোগিতা মানে অনুকরণ নয়। সে যখন পুরুষের সেই ভাবে সহায় হবে যেভাবে সহায় আর কেউ হ'তে পারে না—তখনই সে হবে তার পূর্ণ সহযোগিনী—সংহত, নিটোল। তাই আমি বলি যে, সমাজে নারীকে সব আগে চাইতে হবে তার নিজের স্থানটি খুঁজে নিয়ে সেখানে আসীন হ'তে—পুরুষের কর্মক্ষেত্রে উড়ে এসে জুড়ে বসতে নয়। আর এ পারে সে তখনই যখন সে স্বধর্মে সুখাসীন হয়।

আমি: এ কথা সত্যি। কিন্তু তা ব'লে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসেও সে তার কাজের খানিকটা ভার নিতে চাইবে না কেন?

কবি: সে-কাজে তার স্বভাব সাড়া দেয় না ব'লে। পুরুষের নানা কাজে রাজ্যের ধুলোবালি, বিক্ষিপ্ততা, মুখরতা, হানাহানি—সেখানে মেয়েরা এলে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়বে যে! কি জানো? (একটু থেমে) আসলে মেয়েদের শক্তি সক্রিয় হয় নীরবে গোপনে গহনে—খানিকটা গাছের শিকড়ের মতো, পুরুষ কৃতকৃত্য হয় নিজেকে প্রসারিত ক'রে—শাখাদের মতো চায় আন্দোলন, দুঃসাহস, কর্মিষ্ঠতা। কিন্তু এই বাহ্য কর্মিষ্ঠতায় স্থায়ী ফল ফলে তখনই যখন গহন ভূগর্ভে তার শিকড় অচল অটল থাকে। নৈলে সে উপর দিকে বাড়তে না বাড়তে নিজের ভারেই ভেঙে পড়বে। মেয়েরা হ'ল এই সহিষ্ণু মাটি—যে ধারণ করে—শিকড়কে জোগায় রস যাতে ক'রে বীজ বিকশিত হ'য়ে বনস্পতি হ'তে পারে।

আমি: কিন্তু, মাপ করবেন, একথার সদর্থ এইই নয় কি যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে?

কবি (মৃদু হেসে): যদি না থাকত তাহ'লে কি এই বিশ্বলীলা চলতে পারত যুগ যুগ ধরে? এই বিপুল বিশ্বলীলায় যদি স্ত্রীলোক ঠিক পুরুষের মতন একই দায় নিয়ে জন্মাত, একই খেলা খেলতে—তাহ'লে জীবনের যে-গতির সঙ্গে আমরা পরিচিত তার ছন্দপতন হ'ত কবে। (আরো হেসে) কিন্তু ভাগ্যবশে জীবনযাত্রায় মেয়েরা ছেলেদের প্রতিচ্ছবি নয়—সহযাত্রিণী, তাই লীলার গতি আজো থেমে যায় নি। আর সেই জন্যেই প্রকৃতি মেয়েদেরকে দিয়েছেন ঠিক সেই সব গুণ যা পুরুষের মধ্যে তেমন বিকাশ পায় নি—লজ্জা, বিনম্রতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। নৈলে পুরুষের অশান্ত কর্মজগৎ হ'য়ে দাঁড়াত অপলকা। আসলে

মেয়েরাই যে প্রাণস্পন্দনের ধারয়িত্রী, শক্তির খেলার ধাত্রী, ক্লান্তিতে তারাই তাপ হরণ করে পদে পদে। তারা না থাকলে জীবন হ'য়ে দাঁড়াত অর্থহীন উচ্ছলতা, অস্থায়ী উত্তেজনা, লক্ষ্যহারা চঞ্চলতার সমষ্টি আর তার পরেই আসত অন্তহীন অবসাদ—কতকটা—কী বলব—যেমন নেশার পরে আসে শ্রান্তির প্রতিক্রিয়া।

আমি: অনেকে বলেন: মেয়েরা সৃষ্টি করতে পারে শুধু জীবনের নিচের তলায়, কাজেই উচ্চতর সৃষ্টিলোকে সে থাকবেই থাকবে পুরুষের হুকুমবরদার।

কবি: ছি ছি! মেয়েদের এমন ছোটো করে দেখার কথা আমি ভাবতেই পারি না। জীবনে তাদের দানকে আমি খুবই বড় মনে করি। কেন—বলি শোনো।

জৈবলোকে পুরুষের শক্তিবীজ যেমন আড়ালে থেকে ভ্রূণ থেকে জীবসৃষ্টির সূচনা করে—স্ত্রী তাকে ধারণ ও লালন করে ধীরে ধীরে রূপায়িত করে, ঠিক তেম্‌নি মনের রাজ্যে নারীর অদৃশ্য প্রেরণাই বীজের মতন পুরুষের অবচেতনায় সক্রিয় হ'য়ে তার সৃষ্টিকে সফল করে। তাই মেয়েদের সৃষ্টি শুধু জৈবলোকেই আবদ্ধ নয়—পুরুষ তার মনোলোকে স্ত্রী-শক্তিকে ঠিক তেমনি কামনা করে তার মানস সৃষ্টির জন্যে যেমন স্ত্রী তার গর্ভে পুরুষের বীজকে কামনা করে নব জীবন সৃষ্টির জন্যে। কেবল হয়েছে কি, পুরুষের মনকে সে উদ্বোধিত করে খানিকটা তার প্রেরণাদাত্রী শক্তিকে আড়ালে রেখে; তাই পুরুষের সৃষ্টির কাছে আমরা মেয়েদের দানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না সচরাচর।

আমার মনে পড়ে গেল—কবির একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি চরণ:

"বলেছিনু 'ভুলিব না'—যবে তব ছল ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।...
তবু জানি একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ-জীবনে উঠেছিল ফ'লে
আজো নাই শেষ; রবির আলোক হ'তে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীণ
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ-আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।" (পূরবী—কৃতজ্ঞ)

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : "আপনি যা বলেছেন তাতে তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে মেয়েদের আত্মসিদ্ধির পথ পুরুষের থেকে আলাদা ?"

কবি : খতিয়ে তাই বটে। প্রধান কথা হ'ল মনে রাখা যে, প্রকৃতি মেয়েদের গড়েন নি ঠিক পুরুষের পুরুষালি ঢঙে চলতে, তারই চলা-পথে তারই বুলি রপ্ত ক'রে। নদীর ধারা যা চায় তার দুই তীর ঠিক তা চায় না। একটা চলে, অন্যটা বাঁধে। অথচ ওদের গড়ন আলাদা ব'লেই ওরা পরস্পরকে সার্থক করে। দুই তীর খাড়া হ'য়ে নদীকে ধারণ করে ব'লেই তার স্রোত চলে সমুখ বাগে—নৈলে নদী নদী থাকত না, হত জলা।

আমি : তাহ'লে পুরুষ ও নারীর গোড়াকার চাহিদা আলাদা—এই না ?

কবি (হেসে) : ধরেছ এইবার।

আমি : কিন্তু আলাদা ঠিক কী ভাবে একটু খুলে বলবেন ? *

কবি : ধরো, পুরুষ বেশি সহজে অমানবিক অনেক কিছুর সঙ্গে ঘর করতে পারে, নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে, এমন কি অসামাজিকও হতে তার তেমন বাধে না। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবতই আমাদের প্রকৃতির ব্যক্তিগত, মানবিক, সামাজিক রূপকে ভালোবেসে ফেলে। এককথায় পুরুষেরা মানুষকে বরণ করে যখন সে কাজে আসে, মেয়েরা মানুষকে বরণ করে সে মানুষ ব'লে। তাই দেখতে পাবে যে মেয়েদের কাছে মানুষ মানুষ বলেই যতটা বাস্তব, স্পষ্ট, পুরুষের কাছে ততটা নয়। আর ঠিক সেই জন্যেই পুরুষেরা মেয়েদের কাছে শুধু যে বেশি প্রেরণা পায় তাই নয়—তার স্নিগ্ধতায় ও বরণে প্রাণের খোরাক পায়। তার এই শক্তিকেই নাম দেওয়া হয়েছে হ্লাদিনী শক্তি—যে শক্তি নিরন্তরই আমাদের মনে আনন্দের রস চারিয়ে দিচ্ছে। এ-শক্তি তাদের খানিকটা সহজাতই বলব—স্বধর্ম—যেমন দোয়েলের স্বধর্ম চঞ্চলতা, তুষারের শুভ্রতা। তাই তো আমরা আমাদের একঘেয়ে কর্মচক্রের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সান্নিধ্যে এত আরাম পাই—তারা আমাদের টানে যেমন চুম্বক টানে লোহাকে। তাদের হ্লাদিনী শক্তিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে এ-উক্তিকে কবিত্বের অত্যুক্তি বলা চলে না, কেন না আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার এইই এজাহার—চিরন্তন, অপ্রতিবাদ্য, স্বতঃসিদ্ধ।

---

*১৯২৫ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে মেয়েদের সম্বন্ধে কবির সঙ্গে আমার যে-দীর্ঘ আলোচনা হয়—বিবাহ প্রসঙ্গে—তার অনুলিপি তীর্থংকর দ্বিতীয়-সংস্করণে ছাপা হয়েছে। এই সঙ্গে সেটুকু পড়লে কবির বক্তব্য আরো বিশদ হবে।

কবি আত্মমনস্ক ভাবে ব'লে চললেন—মনে হল আমার যেন কবিতার ঝংকার শুনছি: "তাই জন্যে পুরুষ মুক্তি চায় যেখানে মেয়েরা চায় নীড় বাঁধতে একথা মেনে নিলেও দেখা যায় যে পুরুষ পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ করতে পারে না শূন্য ব্যাপ্তির মধ্যে। আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম বুদ্ধদেবকে সুজাতার স্নিগ্ধ সেবার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, খৃষ্টদেবকে মার্থা ও মেরির কাছে। মানুষের আত্ম-বিকাশের ইতিহাসে এই সত্যটিরই পরিচয় পাই বারবার। তাই এমন কি শিব যে শিব—তাঁর তপস্যাও ভিতরে ভিতরে চেয়েছিল পার্বতীর কোমল হাতের কমনীয় সেবা, পরিচর্যা।

আমি: এটুকু বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। কেবল আপনার একটি কথা আমার কাছে এখনো প্রাঞ্জল হয় নি: আপনি কি বলতে চাইছেন যে মুক্তি চায় শুধু পুরুষ—মেয়েদের মুক্তির দরকার নেই?

কবি: না তা নয়। আমার বলবার উদ্দেশ্য—উচ্ছ্বাস আবেগ ইহলৌকিকতা মেয়েদের কাছে যত দরকার পুরুষদের কাছে তত নয়। অন্য ভাষায়, মেয়েরা পূর্ণ আত্মসিদ্ধিতে পৌঁছয় প্রেম ও নীড়ের মাঝে—যেখানে পুরুষের চাই মুক্তির অবকাশ—অনাসক্তির আবহ। পুরুষ আত্মবোধের চূড়ায় পৌঁছয় যখন সে বরণ করে অসীমের অভিসার—সে ঘরে চুপ· ক'রে বসে থাকতে পারে না—সার্থক হবার জন্যে তার চাই নিত্য নব আবিষ্কার।

আমি: মেয়েরাও কি চায় না অসীমের অভিসার?

কবি: চায় বৈ কি। প্রতি সার্থকতায়ই অসীমের ছায়া কিছু না কিছু পড়বেই—তা সে সার্থকতা যত সামান্যই হোক না, কেন—ঠিক যেমন যে-কোনো হর্ষ কি পুলক চিরন্তন আনন্দের কিছু না কিছু আভাষ দেবেই দেবে। (হেসে): দেখো যেন আমার বদ্‌নাম রটিয়ো না এই ব'লে যে আমি ব'লে বেড়াচ্ছি—মেয়েরা চিরদিনই নাবালিকা কাজেই অসীমের স্বপ্ন আশার বেসাতি করতে অক্ষম। মেয়েরাও যখন মানুষ তখন অসীমের অভিসারে তাকেও চলতে হবে মুক্তি পেতে—বটেই তো। আমি কেবল জোর দিতে চাই এই কথাটির 'পরে যে তার মুক্তির পথ ও পদ্ধতি আলাদা। কারণ অসীমকে, চিরন্তনকে তারও না পেলেই নয়—কেবল পুরুষের মতন সে তাকে চাইবে না ব্যাপ্তি ও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে: চাইবে বন্ধন ও সংহতির মাধ্যমে।

আমি: আরো একটু খুলে বলবেন?

কবি : একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—প্রকৃতি পুরুষকে খানিকটা ছাড়া দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়েদেরকে। ফলে পুরুষও শোধ তুলেছে ব'লে—বেশ, আমিও তেমোকে ছাড়ব—থাকব না তোমার অনুগত। মেয়েরা ঠিক এভাবে প্রকৃতির অবাধ্য হ'তে পারে না। বুঝলে!

আমি : এখনো একটু ঝাপসা লাগছে।

কবি : একটা দৃষ্টান্ত নাও : গোপাকে ছাড়তে, চাওয়ার তাগিদ যেভাবে বুদ্ধের কাছে ছিল্ তাঁর পৌরুষের স্বধর্ম, গোপার কাছে বুদ্ধকে ছাড়তে চাওয়া ঠিক সেভাবে সম্ভব ছিল না তার মেয়েলি স্বধর্ম মেনে।

আমি : আপনি কি বলতে চাইছেন যে গোপার পক্ষে বুদ্ধকে ত্যাগ ক'রে মুক্তি খোঁজা হ'ত অস্বাভাবিক?

কবি : এইবার ধরেছ।

আমি : কিন্তু কেন অস্বাভাবিক—বলবেন?

কবি : কারণ গোপা ছিল নারী। তাই তার স্বভাব ত্যাগের ফাঁকার মধ্যে টিকতে পারত না যে ভাবে পেরেছিলেন বুদ্ধ—সহজেই।

আমি : কিন্তু এমন নারী কি দেখা যায় না—যারা খানিকটা পুরুষালি ধাঁচেই গড়া?

কবি : কে অস্বীকার করছে? পুরুষালি মেয়ে বা মেয়েলি পুরুষ জগতে থেকে থেকে এখানে ওখানে দেখা যায় তো বটেই। কিন্তু তা ব'লে কি বলবে যে মেয়েলি পুরুষ পুরুষের প্রতিনিধি, বা পুরুষালি মেয়ে মেয়েদের? এদের বলতেই হবে ব্যতিক্রম।

আমি : কিন্তু আপনি যে বলছেন বুদ্ধ গোপাকে সহজেই ছাড়তে পেরেছিলেন তিনি স্বভাবে পুরুষ ছিলেন ব'লে তার নিহিতার্থটি ঠিক কী আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলবেন? আমার জিজ্ঞাস্য—ডাক শুনলে মেয়েরাও কি এইভাবে ছাড়তে পারে না সব কিছু? পুরুষের পক্ষে অসীমের ডাকে সাড়া দেওয়া বেশি সহজ হবে কেন? তাছাড়া নারীর কাছে পুরুষ যেমন অপরিহার্য, পুরুষের কাছেও কি নারী ঠিক তেম্নি অপরিহার্য নয়? না, আপনি বলতে চাইছেন যে প্রেম পুরুষের বিকাশের পক্ষে খানিকটা বাহ্য—না হ'লেও চলে?

কবি (আত্মমনস্ক) : না—ঠিক তা আমি বলতে চাই নি। কারণ এভাবে বললে আমার বক্তব্যটিকে খানিকটা বিকৃত করাই হবে—মনে হবে যেন

আমি এ যুগের কর্ম ও নৈপুণ্যের বাণীতেই সায় দিই—যার সঙ্গে সৌন্দর্য ও সুষমার কোনো লেনদেনই নেই। সৌন্দর্য ও সুষমাকে বর্জন ক'রে কর্মে আনন্দ কোথায়? তুমি জানো—আমি বরাবরই দুঃখ পেয়েছি যে আমাদের আধুনিক সভ্যতা সৌন্দর্যকে পাশ কাটিয়ে উত্তরোত্তর শুষ্কতার দিকেই ঝুঁকছে ব'লে। বারবারই আমি বলেছি যে এতে জগতের মঙ্গল নেই। সঙ্গে সঙ্গে বলেছি যে, এই হারিয়ে-যাওয়া সুষমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে কেবল মেয়েরা। পুরুষের সৃষ্ট সভ্যতায় তারা যদি এসে বেশি ক'রে যোগ দেয় তবেই রক্ষে। কাজেই আমি একথা বলতেই পারি না যে, মেয়েদের না হ'লে পুরুষের খাসা চলে। গোপা বুদ্ধকে প্রথম থেকেই একটুও ভালো না বাসলেও বুদ্ধের ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত না এমন কথা বলাটা হবে মূঢ়তা। গোপার প্রেম বুদ্ধের কাছেই ঠিক তেম্‌নি প্রয়োজনীয় ছিল যেমন ছিল গোপার কাছে বুদ্ধের প্রেম। তফাৎ এই যে দাম্পত্য প্রেম গোপার কাছে ছিল সর্বস্ব, বুদ্ধের কাছে—আত্মবিকাশের সহায়, শক্তি। অন্যভাষায়, প্রেমের আবেগ নারীকে ধারণ করে মেরুদণ্ডের ম'ত—যেখানে পুরুষকে সে তার পথচলায় আলো ধরে, দিশা দেখায়—অপরূপ সে আলো, দিশা—কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে না তার জীবনের চরম পরম লক্ষ্য।

আমি (একটু চুপ করে থেকে): বুঝেছি—কিন্তু…মাফ করবেন…তাহ'লে কি বলতে হবে যে মেয়েরা মহত্ত্বে পুরুষের সমান নয়?

কবি: তা কেন? শুধু বলা—যে দুজনের স্বভাব ও ছন্দ আলাদা, আর আলাদা ব'লেই সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য আজো ফুরোলো না। যদি মেয়েরা স্বভাবে স্বতন্ত্র না হ'ত তাহ'লে বিশ্বলীলার প্রকাশের ও লাবণ্যের প্রাণস্পন্দন থেমে যেত কবে! বস্তুতঃ, সৃষ্টির প্রেরণা নিজেকে নিত্যনতুন ক'রে রচনা করতে চায় ব'লেই প্রকৃতি একজনকে অপরের প্রতিরূপ ক'রে গড়তে চান নি। এককথায়, নারী ও পুরুষকে স্বভাবে ভিন্নধর্মী ক'রে তৈরি করা হয়েছে ব'লেই উভয়কে একলক্ষ্য হ'য়ে আলাদা ছন্দে চলতে হয়—যদি তারা কৃতকৃত্য হ'তে চায়।

কবি প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন: "আমি আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য ঠিক কোনখানে বোঝাতে।"

"পুরুষকে আমি নাম দিই জন্মজিজ্ঞাসু—অসীমের অধরার অভিসারী—এ অসীম অধরাকে মুক্তি নির্বাণ ভগবান যে-নামই দাও না কেন। তাই কোনো উপলব্ধি

যতই বড় হোক না কেন তাকে পরম সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারে না যদি সে তাকে বাঁধে—তাকে নোঙর ছাড়া করতে বাধা দেয়। প্রেম তার কাছে খুব বড় উপলব্ধি হ'তে পারে, তার জীবনকে আলো করতে পারে—কিন্তু কেবল এই সর্তে যে সে বন্ধন হ'য়ে দাঁড়াবে না।

নারীর মুক্তি বা সার্থকতা অন্য পথের পথিক। তাই প্রেম তাকে শুধু আলো দেখায় না—ধারণ করে তার সত্তার কেন্দ্র—উপজীব্য হ'য়ে। এই জন্যে পুরুষ না পারলেও নারী পারে শুধু প্রেমের কাছে হাত পেতে জন্ম সার্থক করতে।"

কবি একটু থেমে বলে চললেন তাঁর গাঢ় মধুর কণ্ঠে: "সব গভীর প্রেমেই পাওয়া আর না-পাওয়া চলে হাত ধরাধরি ক'রে। তাই বিদ্যাপতি গেয়েছিলেন

জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ, নয়ন ন তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন ন গেল!

"আমরা জীবনে কোনো কিছুই পাওয়ার মতন পেতে পারি না যতদিন না সে আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে ম'জে লীন হ'য়ে না যায়—আর এ-পরম প্রাপ্তি হাতে আসে না যদি আমরা তাকে দাম না দিয়েই পেতে চাই। প্রেমের উপলব্ধিকে পেতে হ'লে দিতে হয় গভীর অনপনেয় বেদনার মূল্য। এ-দাম দিতে না চাইলে প্রেমকে উপলব্ধি করা যায় না—সে হ'য়ে ওঠে না আমাদের বিকাশের পরম সম্পদ। কেউ বাইরে থেকে কিছু দিলেই তাকে পাওয়া যায় না—কোনো মহৎ সম্পদকেই চাইতে না চাইতে মেলে না। আমাদেরকে হ'তে হবে তার যোগ্য, নৈলে প্রেম কোনদিনই আমাদের বরণমালা পরিয়ে উজাড় ক'রে দেবে না তার যা কিছু আছে।"

নারী ও পুরুষ কী ভাবে পরস্পরের কাছে প্রার্থী—কী ভাবে এর রিক্ততা ওর সম্পদের কাছে হাত পেতে সার্থক হ'য়ে ওঠে তার একটি বড় সুন্দর নিটোল ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন নারীর ডাককে তারার সুরে আরোপ ক'রে যার মর্ম আমি পরে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বিদেশে। কবিতাটির নাম কবি দিয়েছেন "অতিথি"।

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি' দিলে নারী,
মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হ'তে স্থির স্নিগ্ধ হাসে

আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ-বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ গগনে
উর্ধ্ব হ'তে একতানে এল প্রাণে আলোকের বাণী—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হ'তে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।
তেমনি তারার সুরে মুখে মোর চাহিলে কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে যে জানি আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি—
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।'

চৌদ্দ

কোন্ সালে ঠিক মনে নেই, তবে মনে আছে, আমি বোলপুরে যাচ্ছিলাম কবির সঙ্গেই এক ট্রেনে। মন ভ'রে উঠেছিল বৈকি। নানা পরিবেশে কবিকে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল দেশে-বিদেশে। কিন্তু ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পাই নি কখনো। আমি সে-সময়ে গ্যেটের লেখা নিয়ে খুব মেতে উঠেছি—কেবলই পড়ি তাঁর নানা দ্যুতিময় চিন্তা ও অপরূপ প্রেমের কবিতা—মূল জর্মন ভাষায়। কবিকে সেদিন একটি কবিতা শুনিয়েছিলাম যেটি অনামীতে ছেপেছি ২৮ পৃষ্ঠায় : প্রেম।

Woher sind wir goboren
Aus Lieb.........ইত্যাদি।

আমি এর অনুবাদ করি—

কার বরে জনমি সদাই ?—প্রেমের মিলনে।
কারে বিনা আপনা হারাই ?—প্রেমের বিহনে।
কার মন্ত্রে বাধা হয় দূর ?—প্রেমের সাধনে।
কোন্ সুরে সাধি প্রীতিসুর ?—প্রেমের বন্দনে।
বেদনাশ্রু কে তূর্ণ মুছায় ?—প্রেমের অভয়।
বুকে বুকে বাসর জাগায় ?—প্রেম-পরিচয়।

সেদিন কবি গেটের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে একটি কথা ভুলবার নয়: "গ্যেটে বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধে প'ড়ে দৃষ্টি হারান নি, কোথায় ধর্মের পদস্খলন হয়েছে—কোথায় বিজ্ঞানের তিনি মুক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। এইখানে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে।"

কথাটি আমার মনে আছে, কেন না এই সময়ে এবং এর পরে গ্যেটে পড়তে পড়তে যখন আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম তখন প্রায়ই আমার মনে হ'ত যে, গ্যেটের সঙ্গে কবির মিল আছে নানা ভাবের রসের ক্ষেত্রেই। দু'জনেই বিরাট মনীষা নিয়ে জন্মেছিলেন; দু'জনেই প্রকৃতিতে শ্রদ্ধালু ও ধর্মপ্রাণ; দু'জনেই অত্যাধুনিকতার নানা জয়ধ্বনি সম্বন্ধে সন্দিহান; দু'জনেই নারীকে শুধু জীবনের নয় আত্মার সহযাত্রিণী বলে বরণ ক'রে এসেছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত; সর্বোপরি দু'জনেই মহাকবি।

কবির কাছে পড়ে শুনিয়েছিলাম গ্যেটের একটি ব্যঙ্গ কবিতা এই কথা ব'লে যে, তাঁকেও কবির মতনই সইতে হয়েছিল হীন নিন্দুকদের বিদ্রূপ ও কুৎসার পঙ্কক্ষেপ:

Wir reiten in die Kreuz and Quer
Nach Freuden und Geschaeften,
Doch immer klaefft es hinterher
Und bellt aus allen Kraeften.
So will der Spitz aus unserem Stall
Uns immerfort begleiten,
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur dasz wir reiten.

অর্থাৎ

আমরা অশ্বারোহী লক্ষ দিকে যতই
ছুটি লক্ষ পুলক-কর্ম-সাধনায়,
ওই কুকুরগুলোও ধায় পিছনে ততই
করে ঘেউ ঘেউ ঘেউ হিংসারি জ্বালায়।
তাদের বিবর ছেড়ে বাইরে এসে তারা
পিছু নেয় আমাদের মহিমা না সহি':
হয় তারস্বরে গর্জি' নিতুই সারা
শুধু করতে প্রমাণ—আমরা অশ্বারোহী!

কবি হেসে বলেছিলেন : "গ্যেটের মধ্যে ছিল একটি সহজ আভিজাত্য। কিন্তু এ থেকে দেখতে পাবে কুকুরদের ঘেউ ঘেউ করায় তিনি বিচলিত না হ'লেও বেশ একটু আনন্দ পেতেন দেখে যে, যথার্থ মহিমা নিন্দা-কুৎসার নাগালের বাইরে। কিন্তু আমি নিজে আরো গভীর সান্ত্বনা পাই ভেবে যে, যেমন জ্ঞানীও চলেন তাঁর স্বভাবের নির্দেশে তেমনি অজ্ঞানীও। এইটুকু যেই বুঝতে পারি অমনি আমার সব ক্ষোভ গ'লে গিয়ে হয় অনুকম্পা যে, মানুষ কী অজ্ঞান, কী আত্মঘাতী!"

উত্তর জীবনে—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে আমি দেখতে পাই একটি জিনিস—যে-কথা গীতায় পরিষ্কার ক'রেই ঠাকুর বলেছেন অর্জুনকে :

"দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।"

চিরমুক্তিদাতা দৈবী সম্পদ ঐশ্বর্য এ-জীবনে,
আসুরী সম্পদই জীবে বাঁধে বিশ্বময়।
জন্ম-অধিকার যার অভিজাত-সম্পদে ভুবনে
সে-তোমার হে মহৎ, কোথা দুঃখ ভয়?

পণ্ডিচেরি গিয়ে প্রায়ই আমি তুলনা করতাম ভারতের এই দুই অভিজাত প্রতিভাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত গ্যেটের কথা—শেক্ষপীয়রের কথা নয় কিন্তু। কারণ শেক্ষপীয়র ছিলেন না গ্যেটে শ্রীঅরবিন্দ কি রবীন্দ্রনাথের মতন জন্ম-অভিজাত, জন্ম-দার্শনিক, জন্ম-ধ্যানী। আমি জানি অনেকেই আমাকে ভুল বুঝবেন, ভাববেন, আমি বলতে চাইছি গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ জন্মযোগী। না। যোগ মানুষকে যে-চেতনার উত্তরাধিকারী করে সে-চেতনায় কবি বা গ্যেটে পৌঁছতে পেরেছিলেন ব'লে আমি মনে করি না। একথায় রবীন্দ্র-পূজারীদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নেই (বলতে কি, আমি নিজেকেও তাঁদের ম'তই কবির পূজারী বলেই মনে করি) কারণ কবি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে :

"কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না আমার বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি,

শোষণ করি, তা মানব-চিত্তকে কখনো ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানব-বুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত ক'রে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন?" (মানুষের ধর্ম)।

এখানে গোল বাধছে মানুষ বলতে কী বোঝায় সেই নিয়ে। কবির কথা মিথ্যা নয় যে, আজ পর্যন্ত মানুষ তার মানবিক চেতনাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে এক অতি-মানবিক চেতনার স্পর্শমণিতে মানবিক চেতনাকে দৈবী চেতনায় রূপান্তরিত করতে পারে নি। কিন্তু ভারতের ঋষিদের নানা সাধনায় তাঁরা পেয়েছিলেন এমন এক মানবোত্তর চেতনার আলোকদিশা যার স্পর্শে আজকের মানুষ এমনরূপে রূপায়িত হবে যার কোনো মানবিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এই রূপান্তরসাধনী দিব্যশক্তির শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন Supramental Light। এ আলো জগতে নামবেই নামবে—বলেছেন তিনি বার বারই তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে, যথা অশ্বপতি বলছেন (৩।৪):

"জানি আমি এ-দেহের নিঃসম্বিৎ অণুপরমাণু
হয়ে স্বর্গসম তুঙ্গ, প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত
উঠিবে ভরিয়া এক অধ্যাত্ম চেতনে—বিশ্বন্তর
অম্বরের সম যে বিশাল—অলক্ষিত গঙ্গোত্রীর
আনন্দের তরঙ্গে বিপ্লুত—যেথা দেবতা স্বয়ং
অবতীর্ণ হয়ে হবে দেবতার চেয়েও মহান্।"

কিন্তু এই রূপান্তরিত মানবকে যদি মানুষ বলা হয় এই যুক্তিতে যে, মানবিক আধারেই তার প্রকাশ হয়েছে, তাহ'লে মানুষের পূর্বপুরুষ শাখামৃগকেও মানব পদবী দেওয়া চলে ঐ একই যুক্তিতে—যেহেতু গরিলা থেকেই মানুষ জন্মেছে।

কিন্তু খতিয়ে এ দাঁড়ায় নাম নিয়ে তর্ক। যে-অবতরণের অঙ্গীকার শ্রীঅরবিন্দ পেয়েছিলেন তাঁর জীবন-দেবতার কাছ থেকে সে-অঙ্গীকার আজ পর্যন্ত সফল হয় নি ব'লেই আমরা বলতে পারি না গায়ের জোরে যে, সে-অঙ্গীকার কবি-কল্পনা। তা যদি বলি তবে মানুষের সব স্বপ্নকেই হেসে উড়িয়ে দিতে হয় যতদিন না তারা

জাগরণে মূর্ত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের যে অতি-মানবিক অভিজ্ঞানের আভাস পেয়েছিলেন, তার যে-ভবিষ্যদ্বাণী তিনি তাঁর দেবাত্মার রক্তশলাকায় তাঁর ঝংকৃত সাবিত্রী-কাব্যে উৎকীর্ণ ক'রে গেছেন সে-বাণী মোহ-মুগ্ধের প্রলাপ নয়, মহাঋষির প্রাতিভ-দৃষ্টিলব্ধ প্রত্যাসন্ন মহাযুগের চিত্র। তাই তিনি ঘোষণা ক'রে গেছেন তাঁর সাবিত্রীর ধ্যানশ্রুত মন্ত্রসামের ঝংকারে :

(The Book of Everlasting Day...Savitri) *

মহতী চেতনা এক আছে—মন যার দিশা কভু
পায় না—যাহার ভাষা পারে না সে উচ্চারিতে, কিবা
প্রকাশিতে চিন্তায় : ধরায় নাই এই চেতনার
আপন আবাস, নাই কেন্দ্র তার মানবতা মাঝে।
তবু সে-ই উৎস—প্রতি চিন্তার, কর্মের, সাধনার।...
নিখিল মর্ত্যের সেই জনয়িত্রী, করিছে লালন
সে-ই বিপুলেরে—ডাকে সে-ই জীবে দিতে বরদান—
আত্মার উদার মুক্তি মহামহীয়ান্ লক্ষ্যে—যার
দুরাশায় কৃতার্থতা লভে তার সংকীর্ণ সাধনা।

এই মহাচেতনার অবতরণে জাগতিক চেতনার কি রূপান্তর হবে শ্রীঅরবিন্দ তার এক অপরূপ ছবি এঁকেছেন—যে-ছবি তিনি দেখেছেন তাঁর তুরীয় চেতনায়—মানবিক মানসে নয়। দেখেছেন (সাবিত্রী ১১.১) :

"মৃন্ময়ের দৃষ্টিপথে চাহিবে চিন্ময় সেই দিনে,
চিন্ময়ের দিব্যানন প্রমূর্তিবে মৃন্ময় আধারে,
মানব অতিমানব লভিবে সারূপ্য—চলাচল
অনুস্যূত হবে এক অখণ্ড জীবনে...এ দেহের
প্রতি কোষে, ধমনীতে এক দিব্য শক্তি সঞ্চারিয়া
করিবে ধারণ তার প্রতি বাণী নিশ্বাস-সাধনা,
প্রতি চিন্তা হবে সূর্যপ্রভ, হবে প্রতি হৃদিরাগ
স্বর্গীয় শিহরোচ্ছল...অঙ্গে অঙ্গে হবে সমুদ্বেল

---

* There is a consciousness
mind cannot touch...

এক আকস্মিক মহানন্দ···প্রকৃতির লক্ষ্য হবে
শুধু সুপ্রচ্ছন্ন দেবে প্রতি ছন্দে করিতে প্রকাশ,
মানবলীলার হবে অন্তরাত্মা নিয়ন্তা—পার্থিব
জীবনের যুগান্তর হবে দিব্যজীবনে সেদিনে।"

আমি জানি এ-হ্রস্বদৃষ্টি ক্ষীণপ্রাণ রিক্তধ্যান যুগে এ-শ্রেণীর মহাবাণীকে উপহাস করা খুবই সহজ। কিন্তু বলে না সবার সেরা হাসি হাসে সেই যে-সবশেষে হাসে—he laughs best who laughs last ? যা আজ পর্যন্ত হয় নি তা যে হতে চলেছে একথা প্রথম ঘোষিত হয় যুগে যুগে মহাতাপসদেরই মুখে। তাঁদের সমসাময়িক সংশয়াত্মারা যে তাঁদের বিশ্বাস করতে নারাজ হবেন এ তো জানা কথা। বস্তুত মানুষের স্বভাবের একটি পরম শোচনীয় প্রবণতা—এই স্বপ্নে অবিশ্বাস, ধ্যানে অবিশ্বাস, দেবত্বে অবিশ্বাস। যা হয় নি তা হ'তে পারে একথা যখন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বলেছিলেন প্রাক্-বিমান যুগে— যখন ভবিষ্য বিমানের ছবি এঁকে বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ আকাশে উড়বে পাখীর মতন যন্ত্রের ডানা মেলে, তখন তাঁর সমসাময়িক অবিশ্বাসীরা তাঁকে পাগল বলেছিলেন। এ রকম আরো অনেক ঐতিহাসিক উদাহরণ দেওয়া যায়। তাই শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণীকে বস্তুতান্ত্রিক বিচারকেরা যে এ-যুগে পাগলের প্রলাপ বলবেন এ তো জানাই। কিন্তু আমরা যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য প্রভাময় আনন দেখেছি, হৃদয়ের স্পন্দনে পেয়েছি তাঁর ধ্যানকাব্যের ঋঙ্মন্ত্র ঝংকার, যারা দেখেছি মানুষ লক্ষ আধিব্যাধির কেন্দ্রে থেকেও অকুতোভয়ে হতে পারে পরাৎপরের পূজারী, অনাগতের অগ্রদূত, তাই কেমন ক'রে মানবো যে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" ?

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ব্যক্তিরূপের দীপ্ত মহিমার কথা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। আমি এইমাত্র তাঁর যে-তর্পণটুকু করেছি সে কর্তব্যবশে—নৈলে পাছে অনেকে মনে করেন আমি তাঁকে এ-যুগের অন্য অনেক মনীষীদেরই মধ্যে আর একজন মনীষী মনে করি। আমি প্রমাণ করতে পারি না একথা, কিন্তু বিশ্বাস করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের পরে এতবড় মহাসাধক, মহাঋষি জগতে অবতীর্ণ হন নি। এর বেশি আজ বলব না, যদি ঠাকুর দিন দেন তবে পরে কোনোদিন বলব কেন শ্রীঅরবিন্দকে এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানী ও দ্রষ্টা কবির পদবী দেওয়া চলে, যদিও জানি যে এ-সংশয়ী নাস্তিক যুগে খুব কম পূজারীই তাঁর লোকোত্তর আবির্ভাবকে সে-অর্ঘের প্রণামী দিতে সাহসী যে-প্রণামী তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

এবার ফিরে হারানো খেই ধরি।

আমি বলছিলাম যে, বুদ্ধি ও প্রতিভার আভিজাত্যে এ-যুগে গ্যেটে, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা সহধর্মী মনে করলে ভুল হবে না। এই আভিজাত্য আজ বিলুপ্তপ্রায়—যেকথা গ্যেটে ধরেছিলেন প্রায় দু'শতাব্দী আগে, লিখেছিলেন :

"Wealth and speed are what the world admires and what everybody strives for. Railways, express mails, steamships and every possible kind of facility for communication are what the civilized world is out for, to become over-civilized and so to persist in mediocrity."

এই সামান্যতার ফল কী হবে তাও তিনি লিখে গেছেন সে কবে :

"Another result of the aspiration of the masses is that an average culture becomes general."

এই দুঃখই তো জন্ম-অভিজাতের পরম দুঃখ যে, ছোটকে যখন মাথায় বড় করা যাচ্ছে না তখন বড়কে নির্মুণ্ড ক'রে ছোট করো। এই খেদে শেষে তিনি বলছেন যে, যা পেয়েছি যদি হারাইও তবু যেন ছোট না হই এ-যুগের অসার হাঁকডাকে সাড়া দিয়ে :

"It is, in fact, the century for the capable, for quick-thinking, practical people who, being equipped with a certain adroitness, feel their superiority over the many although they themselves are not gifted for what is highest. Let us keep, as much as possible, to the mode of thought in which we grew up. With, perhaps, a few others, we shall be the last of an epoch that will not soon come again."

যে-হুজুগে যুগের হাল্কা মানুষ গৌরীশৃঙ্গে পৌঁছিয়ে কি ব্যোমপথে গোলক ঘুরিয়ে মনে করে মনুষ্যত্বের শিখরসিদ্ধি আয়ত্ত করা গেল, সে-যুগের গণমন গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দের মতন জন্ম-অভিজাতের কুল নির্মূল হ'লে যে দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হবে না এ জানা কথা। কিন্তু আমরা—যারা বহুভাগ্যবশে ক্ষণজন্মা শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথকে জেনেছি আধ্যাত্মিক ভারতের বহুবাঞ্ছিত দুর্লভ বরপুত্র ব'লে—সে আমরা যেন অঙ্গীকার করতে পারি যে, আমরা যদি মরিও তো মর্যাদা ছাড়ব না, ভারতের অধ্যাত্ম দৈবী-সম্পদ ছেড়ে পাশ্চাত্ত্য গতিদৃপ্ত বিচক্ষণতা (adroitness) ও

ত্বরিৎচিন্তক কেজো লোকের (quick-thinking practical people) দ্বারস্থ হব না সস্তা একেলিয়ানার সর্বনেশে মোহে ম'জে। আমরা যেন গ্যেটের সুরেই সুর মিলিয়ে বলতে পারি অকুতোভয়ে :

"Ich habe geglaubt, nun glaub' ich erst recht,
Und geht es auch wunderlich, geht es auch schlecht,
Ich bleibe beim glaubigen Orden."

বাল্যের প্রত্যয় আজ হয়েছে অটল আরো প্রাণের বিকাশে :
যদি ছায় অন্ধকার কিবা আসে আলোধার
শ্রদ্ধাবান্ যারা—আমি তাদেরি সতীর্থ রবো বরিয়া বিশ্বাসে।

কবিকে আমি এই কবিতাটির কথাও উল্লেখ ক'রে বলেছিলাম : "এহেন মহামতি দার্শনিক তথা ধর্মার্থীর জীবনে নারীর প্রভাব কোনোদিনই ম্লান হয় নি ব'লে কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন মেয়েদের সম্বন্ধে অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু আমার মনে হয় বাইরে থেকে দেখলে যাই কেন না মনে হোক আসলে তিনি ইন্দ্রিয়বিলাসী ছিলেন না, নারীর কাছে চেয়েছিলেন সেই বস্তুই যাকে কবি 'সৃষ্টির প্রেরণা' নাম দিয়েছেন।"

এ সম্পর্কে কবি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। সব কথা আমার মনে নেই, কেবল একটি কথা ভুলবার নয়—যে, সাধারণের পক্ষে যা বিষ তা যে মহতের পক্ষে অমৃত হতে পারে—এ কথার কথা নয়। তা ছাড়া বাইরের দৃষ্টি মহৎ বরেণ্য মানুষের আন্তর সত্তার কতটুকু খবর পায়? মহাপ্রতিভা কোন্ আকর্ষণ থেকে কী গভীর বিকাশের রস আহরণ করে গড়পড়তা মানুষ জানবে কেমন করে? শেষে কবি বলেছিলেন : "আমি গ্যেটের মতন মহাপ্রাণ কবি ও দার্শনিককে বাইরের নিদর্শন এজাহারে বিচার করার পক্ষপাতী নই। আমার নিজের জীবনেই কি জানি না আমাকে লোকে কতভাবে কতক্ষেত্রেই ভুল বুঝেছে?"

উত্তর-জীবনে কবির সঙ্গে নানা মতান্তর হওয়ার পরে যেন কবির এ-মন্তব্যটি আরো বেশি ক'রে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম—আর কেবলই মনে হ'ত যে' কবির কথাই সত্য, গড়পড়তাকে আমরা যে-মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে থাকি লোকোত্তর মহাজনদের সে-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া ভুল।

কিন্তু গ্যেটে প্রমুখ মহাজনদের সম্বন্ধে কবি একথা বললেও নিজেকে তিনি

কোনোদিনই ব্যতিক্রম ব'লে প্রচার ক'রে আলাদা বিচারবিধির কাছে হাত পাতেন নি। এ তাঁরই স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব—যার পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁর একটি অপূর্ব মধুর ও গভীর পত্রে। উত্তরকালে এ-চিঠিটি বহু লেখক উদ্ধৃত করেছেন কবির জীবনবাণী ব'লে। তিনি লিখেছিলেন (১৯৩০ সালে—অনামী, ৩৩৯ পৃঃ) :

"তুমি আমাকে উপরের বেদীতে বসিয়ে রাখবে কেমন ক'রে? আমি যে তোমাদের সমবয়সী। আমার এত বড় পাকাদাড়ি নিয়েও আমি তোমাদের সঙ্গে বকাবকি করেছি, ঝগড়া করেছি, আসর জমিয়েছি, এক ইঞ্চি তফাতে স'রে বসি নি। আমার প্রবীণতায় অভিভূত হয়ে তোমরাও যে বিশেষ মুখ সামলিয়ে কথা কয়েছ আমার ইতিহাসে এমন লেখে না। এতে অনেক অসুবিধে হয়েছে, সময় নষ্ট হয়েছে বিস্তর, কিন্তু মনে একটা গর্ব অনুভব না ক'রে থাকতে পারি নে যে, তোমাদের সঙ্গে আমি অতি সহজেই একাসনে বসতে পারি। এর থেকে বুঝেছি যে, বুড়ো হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যারা ধর্মে-কর্মে, বিষয় সম্পত্তিতে স্বকীয় বা স্বাজাতিক ভাগ-বখ্‌রার মামলা নিয়ে পেকে উঠল কোনোদিনই তাদের ছোঁয়াচ আমাকে লাগবে না। যে-মানব একই কালে 'সনাতন' এবং 'পুনর্ণব' আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েছি—অতএব মানুষের মধ্যে আমি বাঁচব, তোমাদের সকলের মাঝখানে, কখনো বা তোমরা আমার গায়ে দেবে ধুলো, কখনো বা মালাচন্দন। আমি মানুষের অমৃতকে পেয়েছি, তাকে সুখে-দুঃখে ভোগ করেছি —আমার রঙিন মাটির ভাঁড়ে তাকে রেখে গেলুম, অনেক চুঁইয়ে গিয়েও কিছু তার বাকি থাকবে—অল্প হলেও ক্ষতি নেই, কেন না ওজনদরে তার দাম নয়।"

এ-চিঠিটির বাণী যে তাঁর জীবন-দর্শনের একটি মর্মবাণী এ-বিষয়ে সন্দেহ করার পথ নেই—বলা যায় : it rings true, every word ; না বেজে পারে ?—এর মধ্যে দিয়ে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে যে কবির একান্ত স্বকীয় কবিধর্মের আত্মপরিচয় যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে মানুষের কাছে। তিনি মানুষকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই যে তাঁর জীবনদেবতা তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন :

"একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোলো বৎসর বয়েসের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সামনে অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্ততঃ একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ

দিলীপকুমার রায়

৬০ বৎসর বয়সে

থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সেও আমি জানি। আমার মত অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছে মানুষ—রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।" (অনামী, ২য় সংস্করণ)।

উপলব্ধিটি গভীর সন্দেহ নাই। শুধু তার সঙ্গে এইটুকু জুড়ে দিতে হবে—যা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার পরম বাণী—যে মানুষ বলতে এখানে বুঝতে হবে নারায়ণকে যাঁর প্রসাদে নর নারায়ণ হ'তে চায় ও হয়ে উঠতে পারে। একথা রবীন্দ্রনাথও চিরদিনই স্বীকার করতেন—তাঁর আর একটি গভীর ভাষণে বলেছেন এ-সম্বন্ধে শেষ কথা :

"উপনিষৎ বলেছেন 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে'—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়···নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি ক'রে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।" (শান্তিনিকেতন—১৮ই চৈত্র, ১৩১৫)।

কবি একথা বুঝতেন যে, ব্রহ্মকে না জানলে—কি তাঁর সঙ্গে মানুষের পরম ঐক্য উপলব্ধি না করলে মুক্তি নেই। কিন্তু তিনি এ মুক্তির উপলব্ধি চেয়েছিলেন মানুষের অমর আত্মাকেই শরবৎ (target) ক'রে—কেন না তাহলেই পৌঁছনো যাবে সেই পরম পুরুষের কাছে যিনি "দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। উপনিষদের এই বাণীটি তিনি তাঁর নানা ভাষণেই সানন্দে উদ্ধৃত করেছেন—তাঁর নানা কবিতায়ও, যথা—(গীতাঞ্জলি) :

> "মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
> মুক্তি কোথায় আছে?
> আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন প'রে
> বাঁধা সবার কাছে।"

তাই মুক্তি পেতে হবে বন্ধনকে স্বীকার ক'রে। তবে—তাকে মিথ্যা মায়া ব'লে প্রত্যাখ্যান ক'রে নয়—কেন না প্রকাশ বন্ধনের অপেক্ষা না রেখে পারে না :

> "প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
> ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা—
> বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
> মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

বিশ্বমানবের মধ্যে দিয়ে চিরবিচিত্রের জয়যাত্রার স্তবগান করতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেন নি কোনো দিনই। তাই তাঁর "জন্মদিনে" কবিতায় সত্তর বৎসরে পদার্পণ করবামাত্র তাঁর কবিপ্রাণ গান গেয়ে উঠেছে :

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার উঠে যত ধ্বনি,
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি..."

তাই তিনি ডাক দিলেন ঐ সঙ্গে নিজের অন্তর্লীন সর্বাত্মীয়কে :

"এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের...
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে...
তুমি থেকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি।
এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি'—
কত ভালোবেসেছিনু আমি!"

শেষে আর একটি কথা শুধু আমার বলবার আছে—যদিও জানি এবার যা বলব তাতে রবীন্দ্রপন্থী অনেকেই সায় দেবেন না। কিন্তু স্মৃতিচারণের মধ্যে আত্মকথার স্থান আছে ব'লে একটা মস্ত সুবিধে এই যে, কবিগুরুর সম্বন্ধে আমার যা যা মনে হয়েছে অকপটে লেখার পথ আমার খোলা। শুধু ব'লে রাখি যে, আমার এ ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করছি আরো এইজন্যে যে. আমি যা বলতে যাচ্ছি তাতে কবির গৌরব বাড়বে ব'লেই আমি বিশ্বাস করি। এইটুকু ভূমিকা ক'রে এবার বলতে চেষ্টা করি যা বহুদিন থেকেই মনে হয়েছে লিখবার কথা।

"জন্মদিনে" কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতায় কবি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের তর্পণে প্রণাম জানিয়েছেন সেই মহাপ্রাণ মানুষদের—

"যাঁরা যাত্রা করেছেন মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,"

কারণ যদিও তাঁদের নাম মুছে দিয়েছেন মহাকাল তবু—

"অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি যোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে।"

মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন ব'লেই গেয়েছিলেন (পরিশেষ) :

"লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।

অনেকে মনে করেন এইই হ'ল ইউরোপের হিউম্যানিটির বাণী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অস্থিমজ্জায় ভারতীয়, তাই যখনই যা কিছু পেয়েছেন শোধন ক'রে নিয়েছেন ভারতীয় আত্মার অমিতাভ শিখায়। এইজন্যেই মানুষ বলতে তিনি শুধু ভীরু অসহায় দীন-দুঃখীকেই বরণ করেন নি, সেই সঙ্গে তাঁদেরও সরিক হতে চেয়েছিলেন যাঁরা মানুষের মধ্যে বরেণ্য (পরিশেষে—বর্ষশেষ কবিতা) :

"যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ···
যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়।
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।"

সর্বোপরি, জিতাত্মাকেও তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন আপন বলে :

"মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনাকে করেছেন জয়
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।"

সেইজন্যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিঃসঙ্গ তপস্যার মর্মবাণীটি ঠিক পরিগ্রহ করতে না পারলেও তাঁকে স্রষ্টা বলে নমস্কার করতে তাঁর বাধে নি, আমাকে লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন (তীর্থংকর, ১৯৪ পৃঃ) :

"শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে। সব সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জমেছে সকলের সঙ্গ—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?"

অমনি উপমাসম্রাটের মনে এল অনুপম উপমা : "যেজন্য মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে, তৃষ্ণার জন্যে। কিন্তু কলের পাইপটা যদি মেঘের মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া যায় তাহলে মেয়র সাহেবকে কাগজে গাল দিতেই হবে।"

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বমানবের জয়গানে উচ্ছ্বসিত হতেন তখনো তাঁর বাদী সুরটি ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবাদেরই সুর—ইউরোপের নারায়ণ-নিরপেক্ষ নরের গণতান্ত্রিক স্তব নয়—যার উদ্গাতা ছিলেন রোলাঁ বা ওয়াল্ট হুইটম্যান। কবির বহু প্রবন্ধের, গানের, ভাষণের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তাঁর উচ্ছ্বসিত ব্রহ্মবাদ যার ভিত্তি পাশ্চাত্ত্যের মানবসেবা (service) নয়—ভারতের জীবে শিবজ্ঞান। বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে একথা প্রমাণ করতে পারি—বিশেষ ক'রে তাঁর "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের নানা চিন্তাগভীর উক্তি থেকে। কিন্তু স্মৃতিচারণে এ-গবেষণা খানিকটা অবান্তর ব'লে দু'একটি উদাহরণ দিয়েই থামব।

"শান্তিনিকেতন"-এ কবি "অন্তর বাহির" ভাষণে লিখেছেন: "অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি ক'রে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেইজন্যেই আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।"

এ-ধরণের বাণীবাহককে পাশ্চাত্ত্য কর্মবাদীরা এ-যুগে রাতারাতি introvert বলে নাকচ ক'রে দিতে চান। কিন্তু কবি তাঁদের অবোধ মুখরতায় বিচলিত হবার পাত্র নন—কারণ তিনি যে অন্তরে খাঁটি ব্রহ্মবাদী—তাই বার বার উদ্ধৃত করেছেন "যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—যাই কেন না করো ভগবানকে উৎসর্গ করবে। কারণ এ-ব্রহ্ম যে সত্যিই নিত্যাসীন আমাদের অন্তরের অন্দরমহলে —যিনি:

"আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ ক'রে আছেন, বেষ্টন ক'রে আছেন। এই অবকাশ তো শূন্যতা নয়, তা স্নেহে, প্রেমে, আনন্দে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত-কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।...অন্তরের মধ্যে প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জ'মে উঠতে পারবে না, বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।" (অন্তর বাহির)

আমার মনে আছে যখন আমি পণ্ডিচেরিতে আট বৎসর একাদিক্রমে অজ্ঞাতবাস ক'রে কলকাতায় ফিরে ভজন-কীর্তন গান সুরু করি তখন আমার অত্যাধুনিক

কবি বন্ধুরা অনেকেই উত্যক্ত হয়েছিলেন। একজন স্পষ্টই বলেছিলেন : "এ-যুগেও কালী কৃষ্ণ শিব ? ধিক্ !" আমি জানি না কবির শান্তিনিকেতনের ছত্রে ছত্রে ব্রহ্ম-স্তব, ব্রহ্ম-বিহার, ব্রহ্ম-প্রণাম প'ড়েও তাঁর মন ধিক্ ধিক্ করে ওঠে কি না। জানি না রবীন্দ্রনাথের পিছনে তিনি বলতেন কিনা যে, কবি তাঁর দুর্বল মুহূর্তে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে ক্ষেপলেও মাথা ঠাণ্ডা হলেই সায় দেবেন মার্ক্স-এর মডার্ণ বেদবাক্যে যে, "ধর্ম হচ্ছে মনের আফিং।" এম্‌নি আর একজন ইদানীন্তনের মুখে শুনেছিলাম স্বকর্ণে যে, বুদ্ধ কার্লমার্ক্সের কাছে দীক্ষা পেলে তাঁর আর বনে গিয়ে অনশনে বাতাতপে চিঁ চিঁ করতে হ'ত না। কিন্তু মরুকগে এ-যুগের বাণীবাহদের কথা : আমরা রবীন্দ্রনাথের চরণে সেকেলে ঢঙেই অনহুতপ্ত ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন করব, তাঁর কণ্ঠে সনাতন ভারতের শাশ্বত বেদমন্ত্র নব ঝংকারে ঝংকারিত হয়েছিল ব'লেই, আমরা সানন্দে তাঁকে বরণ করব এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দিশারিদের সতীর্থ ব'লেই—যিনি কোনো দিনই ভুলতে পারেন নি (শান্তিনিকেতন, ১ম ভাগ—১২৮ পৃঃ) :

"যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' তেম্‌নি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র : 'অসতো মাং সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'—অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশ হবে ; তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।"

মোহিতলাল তাঁকে মিস্টিক উপাধি দিতে গভীর বিরক্তি বোধ করলেও আমরা ভুলতে পারব না কোনোদিনই যে, কবি ব্রহ্মবাদী মহর্ষির ব্রহ্মকেতনই উড়িয়েছিলেন পিতার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে। নৈলে তিনি পিতার জন্মোৎসবে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে এমন ঝংকৃত প্রার্থনার উদ্‌গাতা হ'তে পারতেন না (শান্তিনিকেতন, ৪০৩-৫, ৭ই পৌষ, ১৩১৬) :

"হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে।···জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই।···যে-সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত ক'রে 'আত্মানং পরিপশ্যতি,' 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'—সে এমনি হয়ে ওঠে যে, আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির

দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব।” কবি শেষে প্রণাম করেছেন সেই বরেণ্য পিতাকে সনাতন ভারতের উত্তরসাধক ব'লে : “যে-সাধক এখানে তপস্যা করেছেন···তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে ; এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব ক'রে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।”

পনেরো

শ্রীঅরবিন্দ পঁচিশ বৎসর আগে যোগ ও যোগীদের সম্বন্ধে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে একবার একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন আমার অশান্ত মনকে শান্ত করতে। সে-সময়ে আমার মন আকুল হ'য়ে উঠত প্রায়ই—যখনই কোনো যোগী বা সাধুর মধ্যে দেখতাম কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা। বাংলা লিখতে ব'সে ইংরেজি উদ্ধৃতির বহর বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তাই গুরুদেবের পত্রটির চুম্বক এখানে বাংলায় পেশ ক'রেই আমার “স্মৃতিচারণ” সুরু করি। (কেন এ-পত্রের গৌরচন্দ্রিকা অনুবাদে পেশ করছি—ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

গুরুদেব আমাকে বুঝিয়ে লিখেছিলেন : “মহাযোগীরাও কেউই নিখুঁৎ ব'লে গণ্য হবার দাবি রাখেন না। কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি বলবে যে তাঁদের তত্ত্বদর্শিতা সবই ভুয়ো, এ-জগতের কোনো কাজেই আসে না ? তাছাড়া যোগীও তো কত রকমেরই আছে। কেউ কেউ শুধু অধ্যাত্ম অনুভূতি (spiritual experience) হ'লেই খুসি ; বাইরেও নিখুঁৎ হ'তে চান না তাঁরা—প্রগতির জন্যেও নেই তাঁদের কোনো মাথাব্যথা। কেউ কেউ চান সাধুসন্ত হ'তে, কেউ বা চান বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হবার চৈতন্যে (cosmic consciousness) প্রবেশ ক'রে সর্বমৈত্রীর স্বাদ পেয়ে সেই সঙ্গে রকমারি শক্তির ধারয়িতা হ'তে—যেমন পরমহংস সাধু। যোগের যে-আদর্শ আমার মনঃপূত সে-আদর্শ কিছু সব যোগকেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। অধ্যাত্ম জীবন বলতে কী বোঝায় তার কোনো অনড় অচল সূত্র নেই, কোনো সুদৃঢ় মনগড়া নিয়মের দাসও সে নয়। অধ্যাত্ম জীবনের ক্ষেত্র হ'ল একটি বিরাট বিবর্তনের (evolution) ক্ষেত্র, সে-রাজ্যের প্রসার ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনায় তার নিচের

নানা রাজ্যের চেয়ে ঢের বড়—কত দেশ, ধরণ, স্তর, আকার, পথ, অধ্যাত্ম-আদর্শের রকমফের, আত্মিক প্রগতির ক্রম।" লিখে শেষে আমাকে বুঝিয়েছিলেন এই ব'লে যে দু-রকম বিচারভঙ্গি আছে: এক দেখে-শুনে তবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো, আর এক না ভেবেচিন্তেই সরাসরি রায় দেওয়া যে অমুক যোগ বা যোগী, এ ও তা। কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে না দেখলে অতীতের বা এ-যুগের তত্ত্বদর্শী তথা সাধকের মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। আর এ-মূল্যায়ন বিনা ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও স্তরকে বোঝা যায় না—যেসব আদর্শ ও স্তর মানুষের অধ্যাত্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।"

গুরুদেব আমার যেসব প্রশ্নের উত্তরে এ-গম্ভীর চক্ষুরুন্মীলক পত্রটি লিখেছিলেন তার একটি প্রশ্ন ছিল এই যে, সাধুসন্তরা অনেক সময়েই উদ্‌ভ্রান্ত বা ছিটগ্রস্তের (eccentric) মতন আচরণ করেন কেন? আমি লিখেছিলাম গুরুদেবকে যে, কাশীতে লালবাবা নামে একটি মস্ত সাধুর কাছে আমি একদিন গিয়ে দেখি তিনি উলঙ্গ হ'য়ে দোতলায় একটি জানলার খাটে ব'সে রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। আমি নিচে থেকে চেঁচিয়ে তাঁকে আবেদন জানালাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে ঢুকতে দিলেন না—মানে, তাঁর শিষ্যদের বললেন না একতলার প্রবেশদ্বার খুলতে। আমিও নাছোড়বন্দ, তিনিও তাই। ফলে তর্কাতর্কি চলতেই থাকে। আমি বলছি, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা না করলেই নয়; যোগিপ্রবরও উপরের তলায় খাটে ব'সে বলছেন: "কেন আমার কাছে এসেছ? আমার পড়শীদের কাছে যাও না বাপু, শুনবে আমি কি রকম মন্দ লোক।" শেষে আমি বললাম ঈষৎ উষ্মা দেখিয়ে: "কেন এমন ভান করছেন? আপনি যে খাঁটি সাধু আমি জানি যে। তেম্‌নি আপনারও তো জানার কথা যে আমি আপনার কাছে অধ্যাত্মতত্ত্বের খবর নিতেই এসেছি, কোনো ঐহিক কামনাই আমার নেই।" বলতেই তিনি একগাল হেসে আমাকে বললেন: "কাল এসো।" পরদিন যেতে কত যে চমৎকার চমৎকার কথাই বললেন, সে কী বলব? শেষে বললেন: "তুমি পাবে যা খুঁজছ, কিন্তু এখনো সময় হয়নি—কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।" আমি বললাম: "সময় হ'লে আপনার সাহায্য পাবো কি?" তিনি আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "পাবে।" আমি বললাম: "কিন্তু সে-সময়ে আপনার দেখা পাব কোথায়? শুনেছি আপনি যাযাবর।" তিনি হেসে বললেন: "আমার সাহায্য পেতে হ'লে আমার দেখা পাবার দরকার নেই—বরদাবাবু যে আমার সাহায্য পেয়ে-

ছিলেন সে কি আমার দেখা পেয়ে? তোমাকে যখন তিনি আমার কাছে এসে ধর্না দিতে বলেন, তখন কি বলেন নি তোমাকে যে আমি বহু দূর থেকেই তাঁকে সাহায্য করেছিলাম?”

এর পরেও চমৎকৃত না হ'য়ে করি কি? কারণ যোগিপুরুষ বরদাবাবু (বরদাচরণ মজুমদার—যাঁর কথা আমি আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে লিখেছি) আমাকে বলেছিলেন যে এই লালবাবা চিরদিন উলঙ্গ—তিব্বতে যোগে সিদ্ধিলাভ ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, নানা যোগার্থীকে সাহায্য করেন—অনেক সময়ে তাদের অজান্তে—বরদাবাবুকেও সাহায্য করেছিলেন, যদিও বরদাবাবু তাঁকে কখনো চর্মচক্ষে দেখেন নি। আমি অবাক হয়েছিলাম প্রধানতঃ এই জন্যে যে, বরদাবাবুর সঙ্গে আমার কি কি কথা হয়েছিল লালবাবার তা জানবার কথা নয়। অথচ সিদ্ধ মহাত্মা কেন আমাকে প্রথম দিন ধুলো পায়েই বিদায় দিতে চেয়েছিলেন—জাহির ক'রে যে, তিনি মন্দ লোক? এই ধরণের আরো কয়েকটি দুরবগাহ যোগিমনস্তত্ত্বের তল পেতে চেয়েই আমি গুরুদেবকে লিখি যে সুভাষ আমাকে প্রায়ই বলত: “We want Yogis but without their eccentricities.” একথার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন স্বহস্তে—সম্ভবত মনে মনে মৃদু হেসে: “আমার মনে হয় আমাকেও অনেকে এই ভাবে বিচার ক'রে দূষতে পারেন যে আমি ভদ্র নই উদ্ধত, চিঠিপত্রের জবাব দেই না—আরো কত কী” (“I suppose I myself am accused of rude and arrogant behaviour because I refuse to see people, do not answer letters, and a host of other misdemeanours.”)। লিখে শেষে জুড়ে দিয়েছিলেন যে, সামাজিক ভদ্রতা বা কেতাদুরস্ত আচরণের সঙ্গে যোগসিদ্ধির কোনোই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই—কেন না যোগ হ'ল আন্তর উপলব্ধির ব্যাপার, সামাজিকতা—বাইরের। এ-প্রতিপাদ্যটিকে নানা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন ক'রে শেষে গুরুদেব লিখেছিলেন, “আমি একজন বিখ্যাত যোগীর নাম শুনেছি যিনি কেউ এলেই ঢিল ছুড়তেন—নইলে মক্কেলদের স্রোত ঠেকানো অসম্ভব। কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে কি যে, তিনি বড় যোগী ছিলেন না?”···ইত্যাদি।

যোগ ও যোগীদের স্বপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এ-ধরণের ওকালতির মর্মজ্ঞ হ'তে আমার কিছু সময় লেগেছিল। কারণ সে-সময়েও আমি ছিলাম খানিকটা সামাজিক মানুষই বলব, তাই যোগীরা উদ্ভট ব্যবহার করলে অপ্রসন্ন হ'য়ে বলতাম—এঁরা সুভদ্র হ'লে কি বড় যোগী হ'তে পারতেন না? পরে বুঝেছি—কোনো

মহাত্মা যোগপথে যখন কোনো গভীর অধ্যাত্ম চেতনার এলাকায় পৌঁছন তখন তাঁর কাছে সে-স্তরের নিম্নলোকবর্তী চেতনার বিধিবিধান অনেক সময়েই অবজ্ঞেয় মনে হয়, লোকে তাঁকে কী ভাববে না ভাববে সে নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামান না। কাজেই সুভাষের উক্তিটিকে সামাজিক দিক্ থেকে সমর্থন করা গেলেও আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে সমর্থন করা অসম্ভব।

কিন্তু তবু একথা মানতেই হবে যে, যদি কোনো যোগী মহাত্মাকে দেখি অধ্যাত্ম চেতনায়ও মহাজন, শালীনতায়ও সুজন—তাহ'লে মনটা যেন হাঁপ ছেড়ে বলে: "বাঁচা গেল, এই-ই তো চাই—এবার এঁর কাছে দরবার করা যাক।" গীতায় বলেছে তত্ত্বদর্শীদের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা করলে তবেই তাঁদের তত্ত্বোপদেশের আলোয় মনের কালি ঘোচে। ১৯২৮ সালে যখন সর্বপ্রথম সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে দেখা হয় তখন মন যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছিল দেখে যে এতবড় যোগী তথা জ্ঞানী—এমন উদার, স্নেহশীল ও সুভদ্র হ'তে পারেন। আমাকে সাদরে বসিয়ে ধীরভাবে তিনি যেভাবে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, সে সব উত্তরের প্রতি কথায়ই তাঁর স্বভাবের সারল্য তথা চরিত্রের মাধুর্য ফুটে উঠেছিল। সে-সময়ে এবং তার পরেও বহুবারই মনে হয়েছে আমার যে, মহৎ জ্ঞানী তথা যোগীদের মধ্যে এ-ধরণের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় যদি আর একটু ফুটে উঠত তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁদের নানা উদ্‌ভ্রান্তির তরফে একশত ওকালতি করতে হ'ত না, আমাকে বোঝাতেও হ'ত না নানা পত্রে যে, সামাজিক দিক দিয়ে যাঁদেরকে ছিটগ্রস্ত (eccentric) মনে হয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে শিখলে তাঁদের অনেককে অন্তত: জ্ঞানী ব'লে সনাক্ত করা যেতে পারে—ঠিক যেমন ব্যবহারিক (practical) জগতে যাদের আচরণ হাস্যকর মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেক সময়ে বিরাট প্রতিভার দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

তাঁর পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিকতা, পুণ্যচরিত্র, বিবেক, বৈরাগ্য, বদান্যতা প্রভৃতি নানা গুণের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম—বিশেষ ক'রে তাঁর অসামান্য বিনয় ও ঔদার্যের নানা কাহিনী। কাজেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তবু কেমন যেন মনের কোনে একটু ভয় মতন উঁকি দিচ্ছিল থেকে থেকে—কি জানি তিনি হয়ত আমার দুচারটে প্রশ্নের দায়-সারা গোছের উত্তর দিয়েই ব'লে বসবেন: "এবার স'রে পড়ো বাপু, আমার বহু কাজ আছে—তোমার

মতন স্বভাব-সংশয়ীর সঙ্গ যে মাদৃশ স্বভাববিশ্বাসীর কাছে তৃপ্তিকর হ'তে পারে না অন্তত এটুকু বুঝে দয়া ক'রে আমাকে অব্যাহতি দাও।" একথা বলছি এই জন্যে যে, আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে যাদের বলা হয় বিরক্ত সন্ন্যাসী, অর্থাৎ যারা মানুষ দেখলে মুখ ফেরায়। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে একটি শ্লোকে এদেরই উল্লেখ করেছিলেন যখন তিনি করেছিলেন এই খেদোক্তি (শ্রীঅরবিন্দ এই শ্লোকটির প্রশংসা করেছেন তাঁর সিন্থেসিস অফ যোগ-এ):

প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদন্যশরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

আমার ভাগবতী কথায় আমি এ শ্লোকটির অনুবাদ করেছি এই ভাবে:

তাপসমুনি যারা দেখেছি প্রায় তারা বিজনচারী—শুধু সাধে আপন
সাধনা—মুক্তির মৌন-ব্রত ধরি', হৃদয়ে নীলমণি করি' গোপন।
পাপী তাপীর পানে চায় না ফিরিয়াও, কে দিবে তাহাদের শরণদান
না দিলে তুমি? ছাড়ি' তাপিতে মোক্ষও চাহিনা আপনার, ওগো মহান্!

আজ আমার মনে এ-বিরক্ত বৈরাগীদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ নেই, কারণ আমি সত্যিই আশ্বাস পেয়েছি যে, তাঁরাও খতিয়ে বিশ্ববন্ধুই বটে, কাজেই তাঁরা তাঁদের বিজনচারী মৌনসাধনায়ও পাপী তাপীর কিছু-না-কিছু কাজে আসেন। এ-সত্যেরও খবর পাই প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের কাছে—পরে রমণ মহর্ষির মুখে—যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন খুব জোর ক'রেই যে বিবেকানন্দের কথা সত্য যে, মহৎ চিন্তার মহৎ সাধনার ফল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েই পড়ে—এমন কি যদি যোগী চিরদিন গুহাবাসী হন তাহ'লেও। ভুলব না কোনোদিন রমণ মহর্ষির করুণাভরা দৃষ্টি ও সৌম্য স্নিগ্ধহাসি—যখন পনেরো ষোলো বৎসর আগে তিনি আমাকে তাঁর আশ্রমে বলেছিলেন যে, ভগবানের রাজ্যে বহির্মুখী দৃষ্টি যেখানে দেখে স্বতোবিরোধ, অন্তর্মুখী দৃষ্টি দেখতে পায় এমন সমাধান—যা যুক্তির কাছে অগ্রাহ্য হলেও উপলব্ধির কাছে অকাট্য সত্য। ব'লে তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন শঙ্করাচার্যের দক্ষিণা-মূর্তি স্তোত্র থেকে:

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

দেখ দেখ অপরূপ দৃশ্য বটতরুমূলে:
আসীন তরুণ গুরু বৃদ্ধ শিষ্যগণ!
মৌনের মাধ্যমে গুরু করে তত্ত্বব্যাখ্যা—যার
প্রসাদে শিষ্যের হয় সংশয়মোচন!

বহু বর্ষ বাদে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করেন পুনায় (১।৮।১৯৬১ তারিখে)—যখন তিনি আমাকে বলেন নানা উদাহরণ দিয়ে যে বুদ্ধির খাসতালুকে যাদের মনে হয় অহি-নকুল (paradox), আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জগতে তাদের মনে হয় শুধু যে গ্রহণীয় তাই নয়, একেবারে স্বতঃসিদ্ধ সত্য—যেমন শঙ্করাচার্য ফলিয়ে তুলেছেন চমৎকার ক'রে এই শ্লোকটির মধ্যে। তাঁর মুখের কথা উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে অসাধ্য, তবে তাঁকে ভুল বোঝানো হবে না যদি বলি যে, তিনি একদিন কথায় কথায় নানা উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে যতক্ষণ আমরা আমাদের বুদ্ধির অভিমানে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবি "আমি জানি"—ততক্ষণ যথার্থ জ্ঞানের আলো এসে আমাদের অজ্ঞানের গ্রন্থিমোচন করতে পারে না। আমরা দেখেও দেখতে পাই না যে, আত্মাভিমান দর্প গর্ব এসবই আড়াল করে সেই আলোকে যার অবতরণ বিনা আমাদের মনের আঁধার কাটে না, কাটতে পারে না। এই অবতরণকে কবিরাজ মহাশয় একদিন কেবলমাত্র "ভাগবতী কৃপার সাধ্য" ব'লে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, শুধু যে এ কৃপা ছাড়া যথার্থ দিব্যজীবনলাভ অসম্ভব, তাই নয়—প্রতিপদে কৃপা এসে আমাদের নানা অশুদ্ধির মালিন্য মোচন করে ব'লেই আমরা সাধনায় অগ্রসর হতে পারি। আমার "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাসটিতে আমিও এই কথা বলতে চেষ্টা করেছি—যতটা সম্ভব আমার নিজের তথা ইন্দিরা দেবীর নানা উপলব্ধির এজাহারে। আমার বর্ণিত "অঘটন" সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় পুনায় ব'সে একটি পত্রে লিখেছিলেন আমাকে (১৩।৩।৬০) :

"মানবদেহধারী যোগীও যোগাবস্থাতে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারেন, অবশ্য ইহাও সেই মহাশক্তির কৃপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার ইহাও বিবেচ্য—প্রাকৃত নিয়মের গণ্ডী কোথায় কে বলিবে? আজ যাহা অতিপ্রাকৃত বলিয়া মনে হয় কাল তাহা সকলে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতে পারে। আপনিও স্যর অলিভার লজ-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন * যে, এই বিশ্বব্যাপারে সম্ভব ও অসম্ভবের সীমারেখা কেহ টানিতে পারে না।"

* "Let us be as cautious and critical, aye, and as sceptical as we like, but let us be fair, do not let us start with a preconceived notion of what is possible and what is impossible in this almost unexplored universe, let us be willing to be guided by facts, not by dogmas" (MIND AND MATTER—Sir Oliver Lodge—"অঘটন আজো ঘটে"র মৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ MIRACLES DO STILL HAPPEN বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।)

আমি আমার মিরাক্লস্ ডু স্টিল্ হ্যাপ্‌ন্ বইটির ভূমিকায় আরো লিখেছি যে, আমার মাথাব্যথা শুধু অদ্ভুত ইন্দ্রজালদের নিয়ে নয়, আমি সবচেয়ে মূল্যবান্ মনে করি সেই জাতীয় অতিপ্রাকৃত অঘটনদেরকে—যাদের ঘটান দৈবী করুণা আমাদের মানব জীবনকে দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত করতে, আমাদের চেতনার বিকাশে সহায় হয়ে আমাদের প্রকৃতির শোধন ক'রে আমাদের দীনতার দীক্ষা দিতে। কবিরাজ মহাশয় এ-সম্বন্ধে লিখেছেন :

"অঘটন আজো ঘটে আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল, আমার বন্ধুদেরও লাগিয়াছিল। আশাকরি আপনার ইংরাজি অনুবাদ সহৃদয় ইংরাজি পাঠকদের চিত্তও তেমনি আকর্ষণ করিবে। সত্যের যদি কিছু প্রভাব থাকে তবে বৈজ্ঞানিকদেরও হৃদয় কি টলিবে না?"

এ-চিঠিটির আর একস্থলে কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন, আমার প্রতিপাদ্য সূত্রে সায় দিয়েই: "আমারও মনে হয় প্রকৃত মিরাক্ল হইতেছে মানুষের জীবনের পরিবর্তন, যে-পরিবর্তন মহা করুণার ফলে কোনো মহামুহূর্তে অকস্মাৎ তাহার সমগ্র সত্তাকে রূপান্তরিত করে। কার্যকারণের শৃঙ্খলাতে উহা ধরা পড়ে না। অহেতুক কৃপার আকস্মিক উল্লাস ব্যতীত উহাকে আর কী বলা যাইতে পারে?"

কবিরাজ মহাশয়ের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম একটি বিশেষ কারণে। কয়েক বৎসর আগে আমার এক বিজ্ঞ বন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে একটু অবিচার করেছিলেন এই ব'লে যে তিনি যোগবিভূতিকে যোগের চেয়ে বড় মনে করেন। বন্ধুটি অধ্যাত্ম বিদ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের কাছে বালখিল্য-প্রমাণ হলেও তাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ব'লে তাঁর শ্লেষ আমাকে একটু ভাবিয়ে দিয়েছিল বৈকি। কিন্তু পরে কবিরাজ মহাশয়ের স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য লাভ করার পরে ও তাঁর সঙ্গে পুনায় ও কাশীতে ধর্ম ও যোগ নিয়ে বহু আলোচনা করার পরে আমি মুগ্ধ হয়েছি শুধু যে তাঁর ভূয়োদর্শনের পরিচয় পেয়ে তাই নয়—এই আনন্দময় আবিষ্কারেও বটে যে, তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত হ'লেও সব আগে ভক্ত। তাই তিনিও একদিন পুনাতে আমাকে অকুতোভয়ে বলেছিলেন যে "অহৈতুকী ভক্তির পায়ে প'ড়ে থাকে কোটি কোটি মুক্তি।" শুনে মনে পড়েছিল বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ ভগবানকে দেখে বলেছিলেন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে :

ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ

"ধর্ম-অর্থ-কাম"-বর ল'য়ে তার কী হবে জীবনে—
মুক্তি করতলগত তার—
নিখিল বিশ্বের মূলে যে-তুমি সে-তোমার চরণে
শুদ্ধা ভক্তি নির্বিচল যার।

আমি তাঁর একথা শুনে খুসি হয়ে তাঁকে বলি : "শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছেন :

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথম্ অভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ *

এ-শ্লোকটির একটু ভাষ্য শুনতে চাই আপনার মুখে।" তাতে তিনি খুসি হ'য়ে এ-শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেছিলেন খানিকটা এই ঢঙে (ভাষাটা আমার তবে বোধ হয় তাঁর মূল ভাবটুকু ধরতে পেরেছি)—মুমুক্ষা বুভুক্ষা এ-দুইই ভক্তির পরিপন্থী। বুভুক্ষা কিনা ঐহিক নানা কামনা যে ভক্তির পথে বাধা, একথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু মুমুক্ষা—মুক্তিকামনাও—ভক্তির পথে সমান বাধা, কেন না ভক্তি চায় আরাধ্য ইষ্টকে, মুক্তি চায় সব বন্ধনের বিলুপ্তি! কিন্তু ইষ্টের সঙ্গে যে পরম মিলন কামনা করে সে যে একান্তী, চায় শুধু তাকেই। কাজেই মুক্তি নিয়ে সে করবে কী? এর মানে নয় অবশ্য যে, ভক্ত মুক্তি পায় না—পায় তো সহজেই ইষ্ট-মিলনের সঙ্গে সঙ্গে। না পেয়ে পারে? যিনি রসস্বরূপ, আনন্দের আকর, সর্বসার্থকতার আদিকারণ—তাঁকে যে একবার ভালোবেসেছে, তার সমস্ত সত্তা তাঁর পায়ে নিবেদন করেছে, তাকে বাঁধবে কোন্ ঐহিক বাসনা? আমার বলবার উদ্দেশ্য—ভক্তের প্রেমের এম্‌নিই ঐকান্তিকতা যে, সে তাঁকে ভালোবেসেই চরিতার্থ, তাঁকে পেয়ে পরমানন্দে থাকলেও—এমনকি আনন্দের জন্যেও সে তাঁকে চায় না, চায় তাঁরই জন্যে—'আমার স্বভাব এই তোমা বই জানি না'—এই-ই হ'ল তার মন্ত্র।"

এই কথাই বহুদিন আগে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম একবার আমাকে লিখেছিলেন একটু অন্য ভাবে ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে :

---

* যতদিন পিশাচী ভুক্তি ও মুক্তি হৃদয়ে থাকে ততদিন সে-চিত্তে ভক্তির অমল সুখের উদয় হবে কেমন ক'রে?

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥

অর্থাৎ কামক্রোধলোভমোহবর্গীয় রিপুদের কবল থেকে মুক্তি লাভ ক'রেও আত্মা তেমন ঝটিতি শান্তি পায় না—যেমন পায় ভক্তিপথে—কৃষ্ণসেবায়।

পুনায় নানা আলাপে ঘুরে ফিরে কবিরাজ মহাশয় কেবলই এই ধুয়োতে ফিরে আসতেন যে অহৈতুকী ভক্তির কাছে অদ্বৈতজ্ঞানও তুচ্ছ। কারণ, ভক্তি গড়ে যে ভাবতনুকে—সে-তনু আস্বাদন করে শুধু তো আনন্দকে নয়, তার উপরে রসকে। আনন্দ ও রস মূলে অভেদ হ'য়েও ঠিক কী ভাবে ভিন্ন, তিনি দুতিন দিন নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে কী চমৎকার ক'রেই যে বলেছিলেন! কিন্তু মুস্কিল এই যে তিনি এতরকম দিশা যুগপৎ ঝিকমিকিয়ে তোলেন তাঁর নানা ভাষণে ব্যাখ্যায় উপমায়, যে একটা ধরতে না ধরতে আর একটা এসে আরও চম্‌কে তোলে, ফলে খেই হারিয়ে যায়। তবু সাধ্যমত তাঁর বিশ্লেষণের সারমর্মটুকু বলবার চেষ্টা করব।

তিনি উদ্ধৃত করলেন প্রথমেই বৃহদারণ্যকের বিখ্যাত সূত্র: "স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে···স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।" অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) একাকী আনন্দ পেলেন না, তাই নিজেকে দুভাগ করলেন—পতি ও পত্নীতে। তার পরে জন্মাল মানুষ।

সচ্চিদানন্দ নিজের মধ্যে আনন্দ পেলেন না এ কেমন কথা?—উত্তরে কবিরাজ মহাশয় যা যা বললেন তার মর্ম আমি যা বুঝেছি তা এই:

ব্রহ্মের সৎ-ভূমি হল অস্তির ভূমি, সেখানে আছে আসন। তারপর চিৎ জানে যে সে আছে অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম। চিৎ যেই নিজেকে এইভাবে দেখে সেই হয় আনন্দের পদার্পণ। ব'লে কবিরাজ মহাশয় বললেন, যে এ ধরণের বিশ্লেষণকে ভুল বোঝা খুবই সহজ; কারণ একের পর এক ঘটেনি তো—সচ্চিদানন্দের মধ্যে সমস্তই ছিল, তবে বোঝাবার জন্যে ভাষা ও কালের সহায়তা নিতে হয় আমাদের—তবু খতিয়ে অনির্বচনী বচনের দ্বারা অনির্বচনীয়ের সামান্য আভাষ মাত্র দেওয়া যায়, তার বেশি নয়। এই আভাষ ইঙ্গিত থেকেই বাক্-এর সৃষ্টি। ব'লে কবিরাজ মহাশয় অ আ ই ঈ উ ঊ এসবের প্রতীক-তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু ব'লেই বললেন: "সে যাক্। আসল কথা হ'ল রসের উদ্ভব ও লীলা। যখন এক হ'লেন দুই—মিথুন—তখনই হ'ল লীলার সৃষ্টি—যার মূলে আছে এর সঙ্গে ওর সান্নিধ্য, সান্নিধ্য থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে শেষে মিলন। এই মিলনের অভিসারে

নানা ভাব, অনুভাব, বিভাব, উদ্দীপন, আস্বাদনাদির আলো ছায়া, খেলাধুলো। রস আছে ব'লেই এই খেলাধুলো চলে। আমাদের শাস্ত্রে বলে বটে যে রস নয় রকমের। , কিন্তু তা নয়, আসলে রস বহু—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা খাতে তার প্রবাহ। আমাদের মন যখন প্রকৃতি থেকে নিজেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারে তখনই সে পায় দ্রষ্টা পদবী, তখন সে যা-ই দেখে তা থেকে পায় দৃষ্টির আনন্দ—কিনা রস। দেখতে পেলেই রস। রসকে বলা যেতে পারে আনন্দের নির্যাস। আসলে দুইই এক, অথচ একটা সূক্ষ্ম ভেদ আছে। কি রকম ভেদ? একত্বের মধ্যে আনন্দ, বহুর মধ্যে রস। নানার নানাত্ব থেকে যখন এক-এর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই তখন পাই জ্ঞান যে, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। এতে আনন্দ। অথচ এই একমেবাদ্বিতীয়ম্-কেই আবার উপনিষদে বলেছে সর্বগন্ধ, সর্বস্পর্শ, সর্ববর্ণ ইত্যাদি। অর্থাৎ কি না এক যখন বহু হ'লেন তখন বহুর মধ্যে পরস্পরবিহারে রস উপচিত হয়। কিন্তু তার জন্যে চাই দৃষ্টি। যখন আমি প্রকৃতির অধীন তখন আমি ভোক্তা—কখনো সুখানুভূতির, কখনো দুঃখানুভূতির। কিন্তু যখন দ্রষ্টা পদবীতে উন্নীত হই তখন আর প্রকৃতির তাঁবে থাকি না তো—তখন দেখতে পাই যে সুখ দুঃখ—এ দুই প্রবাহেরই তলে অন্তঃশীলা ব'য়ে চলেছে রসধারা—আনন্দের সঙ্গে সে মূলতঃ অভিন্ন হ'লেও আস্বাদনে ভেদ আছে। কেমন? না, জ্ঞানী পায় আনন্দকে—কেন না তার স্থিতি এক-এ, আর রসিক পায় রসকে—কেন না সে সুখ দুঃখ কারুণ্য বেদনা হাসি অশ্রু সব তাতেই আছে—সব তাতেই সে রসাস্বাদনে চরিতার্থ হয় ব'লে। কেমন? না, ধরো তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয় দেখতে গেছ। অভিনয় অনবদ্য হ'লে সতী ভ্রমরের দুঃখ দেখে তুমি তার সঙ্গে দরদের মাধ্যমে মিলেমিশে যাও ব'লেই তার দুঃখে তোমার চোখে জল আসে। কিন্তু এই যে ভ্রমরের দুঃখে তুমি দুঃখ পাচ্ছ—খতিয়ে এ তো দুঃখ নয়। যদি দুঃখ হ'ত তাহ'লে বারবার ভ্রমর অভিনয় দেখতে আসতে কি? কখনই না, যেহেতু সাধ ক'রে কেউই চায় না দুঃখ পেতে। তা'হলে তুমি বারবার ভ্রমরের দুঃখ দেখতে যাচ্ছ কেন? না, আসলে তুমি পাচ্ছ আনন্দই বটে; কিন্তু আনন্দই বা আসে কোত্থেকে? তুমি কি তবে পাষণ্ড যে, সতীর দুঃখ দেখে উল্লসিত হচ্ছ? তা তো নয়—কারণ তোমারও যে বুক ফেটে যাচ্ছে ভ্রমরের বুকফাটা কান্নায়। তবে? তুমি দুঃখ পাচ্ছ বৈ কি। অথচ এ-দুঃখকেই তুমি মেখে চেখে আস্বাদন করছ রস—কারুণ্যের রস। তাহ'লেই দাঁড়ালো—বেদনাও ঐ আনন্দের নির্যাস—

রসে বিধৃত। তাই রসিক বলি তাকেই যে ব্যথায় ব্যথী, অর্থাৎ যে সর্ববিধ অনুভূতির অতলে ডুবুরি হ'য়ে স্বাদ পায় অন্তঃশীলা রসধারার—যেখানে দুঃখ সুখ কারুণ্য হাসি ভয় প্রভৃতি ভাব গ'লে রসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব'য়ে চলেছে। তাই সত্যিকার রসিক হ'লে তাকে সেই সঙ্গে হ'তেই হবে ভাবুক তথা সহৃদয়—কেন না ভাব বা রস সংক্রমিত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে। কার হৃদয়ে?—না, যে সহৃদয় তার।" আমি ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলাম যে ভাগবতের রস নিবেদন করা হচ্ছে রসিক তথা ভাবুককে—"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" তাতে কবিরাজ মহাশয় সায় দিয়ে বললেন: "ঠিক, কেবল ঐ যে বল্লাম—সহৃদয়ও হ'তেই হবে—নৈলে এ-রসের আস্বাদন মিলবে না।" ব'লেই হেসে বললেন: "তাই না রসিক অরসিককে দেখলেই শিরপা তোলে, বলে 'অশেষদুঃখশতানি বিতর তানি সহে চতুরানন'—যত দুঃখ দাও সইব হে ঠাকুর, কেবল—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ'—অরসিকের কাছে রসের তল্পি ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার দুঃখ আমাকে দিও না দিও না দিও না।"

এই ধরণের নানা কথা দিনের পর দিন তাঁর মুখে শুনে আমার একটি ভুল ভাঙে। সে-ভুলটি হ'ল এই যে—আমার ধারণা ছিল কবিরাজ মহাশয় মহাজ্ঞানী, বিকশিত যোগী, বহুপাঠী, মনীষী—সবই, কেবল রসিক নন—যেহেতু এ হেন গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ রসিক হ'তে পারে না। কিন্তু এ-জাতীয় মূল্যায়নে আমাদের অনেক সময়েই ভুল হয় এই জন্যে যে—বিধাতার বিচিত্র বিধানে একই মানুষের মধ্যে নানা ভাবধারা যুগপৎ প্রবহমান হ'য়ে থাকে। কাজেই কারুর একটি বা দুটি ভাবের খবর পেলেই সব ভাবের খবর পাওয়া যায় না। পুনাতে কবিরাজ মহাশয় আমাদের অতিথি হ'য়ে ছিলেন প্রায় একমাস, তাই তাঁর সঙ্গে একটু সহজ ছন্দে মিশতে মিশতে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম—আবিষ্কার ক'রে যে তিনি স্বধর্মে মহাজ্ঞানী হ'লেও স্বভাবে রসিকই বটে—তাই তিনি শুধু গভীর গম্ভীর তত্ত্বদর্শীই নন—সেই সঙ্গে হাল্কা হাসিরও সমজদার। কী ধরণের হাসিঠাট্টার প্রসঙ্গে তিনি মন খুলে সাড়া দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তেন তারই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব।

আমি তাঁকে প্রায়ই নানা মনীষীর নানা রসিকতার নমুনা দিতাম, বলতাম কোন্ মহাজনের সঙ্গে কী ধরণের মজার মজার গল্পগাছা হ'ত—যথা পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ—সবশেষে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। বলতাম—শ্রীঅরবিন্দ হাসির হররায় রীতিমত যোগ দিতেন তাঁর দুই রসরাজ শিষ্যের

রসিকতার সঙ্গতে। এঁদের নাম মহামতি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর বিপ্লবযুগের সতীর্থ তথা শিষ্য।

এর পরে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হ'য়ে আমি পণ্ডিচেরিতে তাঁর আশ্রমে প্রথম প্রথম বেশ একটু আড়ষ্ট বোধ করতাম, কেন না সে যুগে পণ্ডিচেরি আশ্রমের অধিকাংশ মনীষীই হাসি ঠাট্টাকে vital (উচ্ছল) ব'লে চলতেন সাধ্যম'ত তার ছোঁয়াচ কাটিয়ে। কিন্তু আমি স্বভাবে একটু বেপরোয়া তো, তাই একটু একটু ক'রে স্বয়ং গম্ভীরাত্মাদের গুরু, সাক্ষাৎ যোগিরাজ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও হাসি-ঠাট্টা সুরু করলাম—যার কিছু পরিচয় আমার Sri Aurobindo Came To Me স্মৃতি-চারণে লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু তাতে একটি রসিকতার প্রসঙ্গ দেওয়া হয় নি কেন না ইংরাজি ভাষায় এ-জাতীয় বাংলা রসিকতার রস পরিবেষণ করা দুঃসাধ্য। সে-প্রসঙ্গটি দিয়ে এ-প্রসঙ্গের ইতি করি।

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা সবাই বৎসরে তিনবার (পরে চারবার) দর্শন করতে যেতাম। এক এক ক'রে তিন চার শো (পরে হাজার বারোশো) দর্শনার্থী তাঁকে পর পর দেখে চ'লে আসত, প্রত্যেকেই এক মিনিট ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ত—সরল রেখায়। শ্রীঅরবিন্দের চোখে চোখ রেখে মনে মনে প্রণাম ক'রে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ চেয়ে থাকতেন গম্ভীর মুখে—নিষ্পলক নেত্রে। ফলে আমার মন খারাপ হ'ত অনেক সময়েই। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে মরীয়া হ'য়ে তাঁকে লিখলাম: "গুরুদেব, দর্শনের সময়ে আপনার অমন মেঘগম্ভীর মুখ দেখে আমার সময়ে সময়ে মনে এমন গুমট হয় যে প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। তাই কাতর অনুরোধ: আপনি যদি বেচারি দিলীপের অকালমৃত্যু ঘটাতে না চান, তবে পরের বার দর্শনের সময় যখন আমি ভয়ে ভয়ে আপনার সামনে দাঁড়াব —তখন একটু হাসবেন লক্ষীটি!"

কিন্তু বৃথা! তাঁর মন গলল না একটুও: পরের বারও দর্শনে তাঁর সামনে দাঁড়াতে—যথাপূর্বং তথা পরং—বুক আমার কেঁপে উঠল সেই গুরুগম্ভীর আনন দেখে।

আমার পিছনে একজন গম্ভীরাত্মা গুরুভাই ছিলেন, তিনি আমার মন খারাপ দেখে সবিস্ময়ে বললেন: "সে কি দিলীপবাবু! শ্রীঅরবিন্দ আপনাকে দেখে তো হেসেছিলেন!" আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: "হেসেছিলেন? কই না

তো!—আমি স্পষ্ট দেখলাম সেই সমান গম্ভীর—" তিনি টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন : "অবশ্য তিনি হেসেছিলেন। আপনি চিনতে পারেন নি।"

অগত্যা অসহায় হ'য়ে আমি গুরুদেবের শরণ নিলাম,—তর্কাতর্কির কথা জানিয়ে লিখলাম—বাংলা ছড়ায় (যেমন আমি প্রায়ই লিখতাম ও কখনো কখনো তিনি ইংরাজি ছড়ায় জবাব দিতেন) :

"জানি আমি হায়—দিলীপ "মানস"-রাজ্যেরই প্রজা, পোড়া কপাল!
তাই মানি গুরু—জানে না সে আজো ভবদীয় 'অতিমানস'-কথা।
কিন্তু, যে তার শৈশব হ'তে এসেছে হেসেই চিরটাকাল,
চিনিতে সে হারে 'হাসি' বলে কারে? এ-জুলুমে মনে উপজে ব্যথা।"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসে লিখলেন (যেমন প্রায়ই লিখতেন স্নেহের প্রশ্রয়ে) : "I did smile at you, though it was not the radiant smile of a Tagore or the child-like smile of a Gandhi."

কবিরাজ মহাশয় শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়লেন, বললেন : "তারপর?"

আমি বললাম : "তারপর আর কি? গুরুদেবকে আর একটি কাতর লিপি পাঠালাম, লিখলাম :

গুরুদেব!

শুনি তুমি দীনদয়াল, আমার তাই এ-মিনতি চরণতলে :

আজ হ'তে হাসি হাসিও এমন—হাসি ব'লে যাকে চিনিতে পারি।
নহিলে হয়ত তব গম্ভীর দর্শনে—ভয়ে নয়নজলে
কোথা যাব ভেসে! তখন কে পার করিবে অপারে হে কাণ্ডারী!"

লিখে একটু পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিলাম "একদা হনুমান দ্বারকায় উপস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণের রাজসভায় বলেছিলেন : যদিও

শ্রীনাথ জানকীনাথ যে অভেদ পরমাত্মায়—জানি হে মনে,
তথাপি হনুর প্রাণাধিপ শুধু রাম সীতা, তাই চরণতলে
এ-মিনতি—আজ রাম সীতা রূপ ধরি' বোসো দোঁহে সিংহাসনে,
নহিলে এ-সভা ভেঙে চুরে এক লঙ্কাকাণ্ড করিব পলে।"*

---

*শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

"তাতে নাকি কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলেছিলেন :

'কী করি হে রাণী পরম ভক্ত হনুর মান তো রাখিতে হবে,
তাই তুমি ধরো সীতার মুরতি, আমি হই রাম সগৌরবে।'

"একথার উত্তরে অবশ্য আপনি লিখতে পারেন—একশোবার—'কলির দিলীপ কি দ্বাপরের হনুমানের মতন ভক্ত যে, তার মান রাখতে আমিও ব্যস্ত হব?' এ-কথার উত্তরে আমি শুধু বলব : 'তা বটে। কিন্তু একটিবার ভাবুন হনুমান কী চেয়েছিল—কৃষ্ণ রুক্মিণীকে একেবারে ভোল বদ্‌লে ফেলাতে, আর আমি কী চাইছি—শ্রীমুখের একটুখানি বদান্য হাসি'।"

কবিরাজ মহাশয় তো শুনে হেসে কুটি কুটি।

* * * * *

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আরো কত কথাই যে তাঁর সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা পরে লিখব। আজ শুধু সংক্ষেপে বলি তাঁর ভগবৎ-নির্ভরের কথা।

তিনি অসুস্থ হয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন নিজের দেহে একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পরে। কিন্তু দেহের দুঃখ তাঁর ভক্তিবিশ্বাসকে যেন চতুর্গুণ উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছে। কতবারই না তিনি আমাদের বলেছেন যে দুঃখও ভগবানের করুণা, কেন না বেদনার ফলে চেতনার রূপান্তর হয়ই হয়—যদি সত্যি সত্যি বেদনাকেও আমরা ভগবানের করুণার বিধান ব'লে মেনে নিতে শিখি। আমার কাছে উদাহরণ দিয়েছিলেন সেণ্ট ফ্রান্সিস অব আসিসির। সেণ্ট ফ্রান্সিস জীবজন্তু পাখী প্রভৃতি সবাইকে "ভাই বান" সম্বোধন করতেন; Brother tiger, Brother bird, Sister wind ইত্যাদি। শেষ জীবনে মৃত্যুর আগে দেহকে বলেছিলেন : "ভাই গাধা, ক্ষমা কোরো যে তোমাকে বহু দুঃখ দিয়েছি।"

দেহের দুঃখকে কী ভাবে তিনি নিয়েছেন সত্যিই দেখবার জিনিস। কিন্তু শুধু দুঃখকেই নয়—গুরুকে, করুণাকে, অতীন্দ্রিয় নানা উপলব্ধিকে—জীবনের প্রতি পদেই তিনি বাহ্য ঘটনাকে দেখেছেন আন্তর আলোর যৌগিক প্রভায়। এই প্রজ্ঞা তাঁর অতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সাধনায়। তাই তাঁর মধ্যে এসেছে পরম দীনতা (humility) ও অভীপ্সা (aspiration)—মনে হয় যেন কবচ-কুণ্ডলের মতনই তাঁর সহজাত। নৈলে কি তিনি এমন অপরূপ সরল ছন্দে আমাকে লিখতে পারতেন (যে-আমি তাঁর চরণে আশীষপ্রার্থী) :

"প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সস্নেহ অনুরোধ পাইলাম। আপনি আমাকে আপনাদের মন্দিরে একদিন কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি বক্তা নই, উপদেষ্টাও নই—অতি ক্ষুদ্র একজন শুশ্রূষু মাত্র। আমি কোথাও কিছু বলি না—সে-অভিমান কোনো দিনই আমার ছিল না, এখনও নাই। শক্তিও নাই। শুনিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল—অবশ্য যদি শুনিবার মতন কথা হয়—এখনও আছে। তবে এখন সে-ইচ্ছাও অতি ক্ষীণ ভাব ধারণ করিয়াছে। কি যেন কি একটা **মহাক্ষণের** প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ভাবে বসিয়া আছি—একমাত্র সেইদিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে। সেই **মহাক্ষণ**···যে কোনো সময়ে ফুটিতে পারে। সন্ধিক্ষণ অখণ্ড মহাকালের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে যখন বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সন্ধি ও সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আশীর্বাদ করুন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সেই **মহাক্ষণের** প্রকাশে আমি ধন্য হইয়া যাই। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের মহাসন্ধিরূপে সেই **মহাক্ষণ** পুরুষোত্তমের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।···কালের অতীত সর্বকালময় সেই মহাক্ষণেই যাত্রার অবসান ও একমাত্র বিশ্রাম।

"কিন্তু সে-অবসানও অবসান নয়। সেই অবসানের মধ্যেই অসীম স্পন্দনের অভিনব লীলার প্রারম্ভ—যে-লীলার অবসান নাই। তখন হয়ত বলার সময় আসিবে—বলাও হইবে। এখন 'স্তাবক' থাকিয়া সেই লক্ষ্যের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছি। ক্ষমা করিবেন।

আগামী রবিবার যখন যাব তখন কথা হবে। ভালবাসা লইবেন।

ইতি। ৯ই জুন ১৯৬০।

আপনার গোপীনাথ"

শেষে শুধু আর একটি কথা বলতে চাই। কবিরাজ মহাশয় মহাপণ্ডিত, কঠোপনিষদের ভাষায় "আশ্চর্য বক্তা" (তিনি "না না" বললে কী হবে?)— ভারতের যোগিবৃন্দের মধ্যে একজন প্রধান উচ্চবিকশিত ব্যক্তিরূপ—আরো কত কী। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি—তিনি পরম-ভাগবত—প্রেমময় পুরুষ। তাই ৫ই আগষ্ট যখন তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললাম: "আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব আপনার গভীর স্নেহ, উপদেশ ও আশীর্বাদের জন্যে?" তাতে তিনি কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "আপনিই ভালোবেসে

আমাকে আপন ক'রে নিয়েছেন।" উত্তরে আমি বললাম: "আপনি আগে স্নেহের শুভাশীষ দিয়েছেন তাই না আপন হ'তে পেরেছি।" তিনি হেসে বললেন: "একহার্ত (Eckhart—বিখ্যাত জর্মন যোগী) লিখেছেন: 'অহং গেলেই ভগবানের উদয় এবং ভগবান্ এলেই অহম্-এর লুপ্তি'—কোন্‌টা আগে কোনটা পরে কেউ কি বলতে পারে?"

কবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিরূপের আরো নানা উজ্জ্বল দিক আছে, যেমন প্রতি মহাজনেরই থাকে। আমি সাধ্যমত ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি তাঁর যে যে গুণ আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এদের মধ্যে একটি গুণের কথা বলা হয়নি—সেটি হ'ল এই যে তাঁর মধ্যে একটি বিরল সমন্বয় বড় অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য শ্রোতা তথা বক্তা। কথাটাকে একটু ফলিয়ে বলি—যদিও ইতিপূর্বে কোথায় যেন বলেছি।

কথাটা এই যে, সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে, যাঁরা ভালো বলতে পারেন তাঁরা শুনতে চান না, যাঁরা শুনতে আগ্রহী তাঁরা প্রায়ই পারৎপক্ষে মুখ ফুটে কিছু বলেন না। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের কাছে গিয়ে বসতে না বসতে মনে হয়—তিনি দরদী যার কাছে মনের কথা বলা চলে। তাই তাঁকে নানা সময়ে আমার জীবনের নানা অধ্যায়ের নানা কথাই বলতাম—নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব হর্ষবিষাদ ও বিশেষ ক'রে নানা ক্ষেত্রে অভাবনীয় পথে ভাগবতী করুণার স্পর্শ পাওয়ার কাহিনী। তিনি অখণ্ড মনোযোগ সহকারে শুনতেন সে সব দিনের পর দিন ঠিক যেমন আমিও শুনতাম তাঁর নানা ভাষণ একান্ত শ্রদ্ধায়, আগ্রহে। আমি বলতাম তাঁকে শ্রীঅরবিন্দকে কবে কী প্রশ্ন করেছিলাম, রমণ মহর্ষি কবে কোন্ অধ্যাত্মতত্ত্ব কী ধরণের সহজ উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বাল্যকালেই কী ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "কথামৃত" প'ড়ে আমার মনে বিপ্লব জাগে, ইন্দিরার অভ্যুদয়ের পরে কত কী অলৌকিক কাণ্ড দেখেছি—আরো নানা প্রসঙ্গে ব'লে চলতাম মনের কথা। অন্যদিকে আমি শুনতাম তাঁর মুখে তাঁর গুরুদেব শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহারাজের (কিম্বা রামঠাকুরের) শূন্যে উত্থানের কথা, তাঁর দেহাঙ্গ থেকে পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হবার কথা, বেদনার মধ্যে দিয়ে চেতনা কীভাবে আত্মসমর্পণের পথে অগ্রসর হয়, গুরু বিজয়কৃষ্ণের অশরীরী আত্মা কেমন ক'রে তাঁর শিষ্য ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পদে পদে পথের নির্দেশ দিত, পাতঞ্জলের নানা ভূমির সমাধি-প্রজ্ঞার কথা, বিস্ময়কর যোগবিভূতির প্রত্যক্ষ এজাহারের কথা।

কথায় কথায় তিনি অবলীলাক্রমে তত্ত্বকথাকে এমন সহজ সরল রঙে এঁকে ছবির মতন ফুটিয়ে তুলতেন যে, "তত্ত্বকথা" শুনবামাত্র যে-মন আমার এক সময় শিউরে উঠত "ও বাবা" ব'লে—সেই তত্ত্বকথাই তাঁর নানা ভাষণে ঝরত আর আমি পান করতাম পরমানন্দে, কেন না তাতে পেতাম রস।

একদিন কথায় কথায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উঠল। আমি স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে লিখেছি কেন আমি খৃষ্টদেবকে গভীর ভক্তি ক'রে বরণ করেছি মনেপ্রাণে, কিন্তু বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা করা সত্বেও সেভাবে বরণ করতে পারিনি। বুদ্ধদেবের মহিমা আমাকে মুগ্ধ করলেও তাঁর ব্যক্তিরূপ বা বাণী আমাকে খৃষ্টদেবের মতন অভিভূত করতে পারেনি কোনোদিনই। বৌদ্ধধর্মেও কোনোদিনই আমার অন্তর সাড়া দেয় নি, মনে হয়েছে (নিশ্চয়ই বৌদ্ধ সাধনার কোনো খবর রাখিনি ব'লেই) বড় নীরস—চাঁদের মতন আপন নয়, নক্ষত্রের মতনই সুদূর। কবিরাজ মহাশয়ই সবপ্রথম আমার চোখ খুলে দেখিয়ে দিলেন বুদ্ধদেবের তপস্যা ও বাণীর মহিমা। দুদিন তাঁর কাছে শুনেছিলাম দুতিন ঘণ্টা ধ'রে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে সে যে কত কথা। আর তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর ভক্তি তথা সহজবোধের আলোয় সে-বর্ণনা এমন উপাদেয় ক'রে ফলিয়ে তুললেন যে মনে হ'ল—নীরস কোথায়? এ যে প্রত্যক্ষ অমৃতধারা!

এ-দুদিনে তিনি বর্ণনা করেছিলেন মুখ্যতঃ বুদ্ধদেবের সাধনার নানা স্তরের কাহিনী। সব আমার মনে নেই—বলাই বাহুল্য। কেবল তাঁর একটি কথা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল যখন তিনি তাঁর অনুপম মৌখিক ভাষায় আমাকে বুদ্ধদেবের যোগসিদ্ধির বাণীর ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার সারমর্ম এই যে বুদ্ধদেব একদা উপলব্ধি করেন—একা মুক্তি পেলে চলবে না—যাবতীয় বদ্ধ জীবের বন্ধনমোচন করতে না পারলে বিশ্বের পরম ও চরম বিকাশ হ'তে পারে না। উত্তরে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এই কথাই বলেছেন তাঁর সাবিত্রীতে বার বার, যথা:

But how shall a few escaped release the world?
The human mass lingers beneath the yoke.

লভে মুক্তি কতিপয়—বিশ্বের কোথায় মুক্তি তাহে—
কাঁদে যবে কোটি কোটি নিয়তি চক্রের নিষ্পেষণে?

কবিরাজ মহাশয় সায় দিয়ে বলেছিলেন "ঠিক কথা। আর এইজন্যেই

শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন পৃথিবীতে সুপ্রামেণ্টাল (অতিমানস) শক্তির সেই পূর্ণাবতরণ যা আজ পর্যন্ত হয়নি, বলেছিলেন—এ-শক্তি অবতীর্ণ হ'লে সব মানুষই ভগবৎকরুণার স্পর্শ পেয়ে পরম সার্থকতার পথে চলবে।”

ব'লে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা কাহিনী গল্পের ভঙ্গিতে বর্ণনা ক'রে আমাকে চমকে দিয়েছিলেন। কত যে সংস্কৃত নজির দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর প্রতিপাদ্যটি সে কী বলব ? সব কথা মনে রাখা অবশ্য আমার পক্ষে অসম্ভব—তবু যেটুকু মনে আছে লিখে রেখে যেতে চাই—একটা রেকর্ড রেখে যেতেও বটে।

কবিরাজ মহাশয় বললেন যে, বুদ্ধদেব বৈরাগ্যের অঙ্কুশাঘাতে বেদনায় অধীর হ'য়ে সংসার ছেড়ে ভিক্ষুকের বেশে গেলেন পাঁচটি ব্রাহ্মণ সাধকের সঙ্গে তাদের গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে। অতঃপর কয়েক বৎসর বহু কৃচ্ছ্রসাধন করলেন। সে কী উগ্র তপস্যা ! কিন্তু দেহ সইল না—শেষে একদিন মূর্ছা। এই সময়ে সুজাতা দেখা দিয়ে দুগ্ধপান করিয়ে তাঁকে বাঁচায়। দেখে তাঁর পাঁচটি গুরুভ্রাতা তাঁকে ভ্রষ্ট নামে দেগে দিয়ে তাঁকে অস্পৃশ্যবৎ পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করল। তারপরে তিনি বোধ গয়ায় গিয়ে বিখ্যাত বোধিদ্রুমের নিচে আসন পেতে বসলেন এই দারুণ পণ নিয়ে :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়ম্ অতঃ চলিষ্যতি ॥

শরীর আমার যাক রসাতলে, ত্বগস্থিমেদ হয় হবে লীন :
এ-আসন হ'তে উঠিব না আমি বোধি প্রজ্ঞা না লভি যতদিন।

তারপরে—ব'লে চললেন কবিরাজ মহাশয়—বুদ্ধদেবের বহুবিধ উপলব্ধি অনুভূতি দর্শনাদি হ'ল, নানা লোককেই করলেন প্রত্যক্ষ, নানা চেতনার ভূমি ভেদ ক'রে উঠলেন উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বতর ভূমিতে, কিন্তু এমন কোনো লোকের দেখা পেলেন না যেখানে দুঃখ নেই। তবু ছাড়লেন না, প্রাণপণে সাধনা ক'রে চলতে চলতে শেষে মিলল দিশা, কাটল নিশা, মিটল তৃষা—দেখতে পেলেন যে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এক নির্বাণে পৌঁছলে তবে। তখন তিনি সংকল্প করলেন দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে মহা নির্বাণে লীন হ'য়ে যাবেন—এমনি সময়ে তাঁর ধ্যানে এক আশ্চর্য অনুভূতি হ'ল, বিশ্বের আর্তি * তাঁর হৃদয়ে

* জীবজন্তুর দুঃখেরও প্রত্যক্ষ বেদনানুভূতি যে মানুষের সমাধিতে উপলব্ধি হয় ইন্দিরা তার ধ্যানে দু-দুবার প্রত্যক্ষ করেছে। অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু গোপীনাথ কবিরাজ শুনেই সানন্দে বললেন যে এ একটি অতি উচ্চ অনুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এ-অনুভূতির অভ্যাগম হয়েছিল সবাই জানেন।

গিয়ে যেন আছড়ে পড়ল, তিনি শুনতে পেলেন জগতের সর্বজীবের কান্না : "তুমি তো দুঃখের পারে চ'লে যাচ্ছ প্রভু, কিন্তু আমাদের কী হবে ?" এ-কান্না শুনতে না শুনতে তাঁর চিত্তলোকে জেগে উঠল প্রগাঢ় করুণা যাকে যোগিকবি জর্জ রাসেল বলেছেন "tenderness for the whole world" ; তখন সিদ্ধার্থ স্থির করলেন যে যতদিন একজন জীবও নির্বাণ-মুক্তি না পেয়ে বদ্ধ দশায় কাঁদবে ততদিন তিনি মহানির্বাণে লীন হবেন না। স্থির করলেন সকলকেই দিতে হবে নির্বাণের নির্দেশ। ফিরে এসে প্রথমেই সেই পাঁচজন গুরুভাইকে দিলেন দীক্ষা।

কিন্তু তারপরে সিদ্ধার্থ দেখলেন যে সাধারণ জীব সে-সাধনা করতে চায় না যে-সাধনার পথ ধরলে তৃষ্ণা-লয়ে নির্বাণ লাভ হয়। সাধনা করবে কি ? নির্মোহ বা অনাসক্তির নাম করলেও যে সাড়ে পনের আনা বদ্ধজীব শিরপা তোলে ! নির্বাণ এমন সস্তা হরির লুট নয় যে, না চাইলেও সবাইকে বিতরণ করা যায়। তখন বুদ্ধদেব অন্বেষণ সুরু করলেন কী ক'রে সকলকে অমৃতমুক্তি চাওয়ানো যায়। ফের তপস্যা করতে সুরু করলেন। ক্রমে দেখতে পেলেন যে সাধারণ জীব নানামুখে একাগ্র হ'তে পারে বটে—যার নাম "বৃত্তি একাগ্রতা" কিন্তু অবিদ্যা ওরফে তৃষ্ণা (তন্‌হা) পরিহার করতে নারাজ হ'লে সে-"ভূমি একাগ্রতা"-য় আসীন হওয়া যায় না যার সহায়তা বিনা মানুষ কিছুতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উপরে উঠতে পারে না। তখন কেমন ক'রে সাধারণ জীবকে ভূমি-একাগ্রতায় দীক্ষা দেওয়া যায় সেই সন্ধানে বুদ্ধদেব আরো তপস্যা করতে করতে পৌঁছলেন বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞায়। সেখানে দেখা পেলেন সর্বোত্তম প্রজ্ঞা-পারমিতার, যার অন্য উপাধি—বুদ্ধজননী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম খৃষ্টদেব ও তাঁর চিরকুমারী মাতার সঙ্গে বুদ্ধদেব ও প্রজ্ঞাপারমিতার কোনো সাদৃশ্য আছে কি না। তাতে কবিরাজ মহাশয় বললেন : কিছু আছে।

যাই হোক আরো তপস্যা করতে করতে প্রজ্ঞাপারমিতাকেও পেরিয়ে বুদ্ধদেব অবশেষে উপনীত হ'লেন বুদ্ধত্বে। সেখানে তিনি প্রথম বুদ্ধত্বের বীজ সৃষ্টি করবার শক্তি পেলেন, যে-বীজ পৃথিবীতে বপন করলে পার্থিব মানুষের দৃষ্টি হবে অন্তর্মুখী তথা উর্ধ্বমুখী।

আমি হতাশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম : "কিন্তু কই, মানুষ তো আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে—হয়ত আরো গভীর তিমিরে।"

কবিরাজ মহাশয় বললেন : "সাততলা বাড়ি গ'ড়ে তুলতে হবে। একদল মিস্ত্রি গড়ল একতলা, আর একদল দোতলা, আর একদল তিনতলা—সবশেষে যারা

সাততলা তৈরি করবে তারা ভোগ করবে চরম ও পরম সিদ্ধির ফল। কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা তৈরি হ'লে তবে তো সপ্তম তলা তৈরি হবে। বুদ্ধদেব তাঁর সর্বোত্তম চেতনা লাভ ক'রে বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সৃষ্টি করলেন "মন্ত্রযান" বুদ্ধত্বের বীজের বাহনরূপে—রচনা করলেন মুক্তি-মঞ্চের প্রথম তলা ও ধাপ—যাই বলো। এখানে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই যে বুদ্ধত্বের বীজ, একে তিনি পৃথিবীর মাটিতে বপন করতে চেয়েছিলেন মাত্র দুচারজন মুমুক্ষুর জন্য নয়—সকলের জন্যে অমৃত-মুক্তির ফল ফলিয়ে সকলকেই তার মহাস্বাদের অধিকারী করতে। এরি নাম বুদ্ধের মহাকরুণা।"

আমি বললাম ; "তাঁর মহাকরুণার মহিমা স্বীকার ক'রেও তবু দুঃখ হয় যে! মন ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলে এমন মহাকরুণাময়ের আবির্ভাবের পরেও তো কত শত যুগ কেটে গেল—অথচ এখনো দেখি অমৃতের অধিকারীর সংখ্যা এ-আড়াই হাজার বৎসরে একটুও বাড়ে নি। তাই তো সিনিকরা বলেন সাধুসন্ত মুনিঋষি অবতারদের ছোঁয়াচে দু-চার জন মুমুক্ষু মুক্তি পেলেও সাড়ে পনর আনা মানুষের অন্তরব্রহ্ম তো আজো তেমনি কাঁদছে—মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে—বলে না ?"

কবিরাজ মহাশয় বললেন : "সে-কান্নারও যে দরকার ছিল। আর তাই জন্যেই না গীতায় বলেছে 'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।' অর্থাৎ কোনো মহৎ সাধনাই নিষ্ফল হ'তে পারে না। কি রকম জানো ? পিতৃবীজে মাতৃগর্ভে নবজাতক লালিত ও বর্ধিত হয় মাতৃশক্তিতে। তেমনি গুরুদত্ত বীজে আমাদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে যে-ভাবতনু, সাধনার প্রতি জপে ধ্যানে প্রার্থনায় সে-তনু লালিত বর্ধিত হয় সাধকের তপঃশক্তিতে। পরে ঠিক কাল পূর্ণ হ'লে যেমন শুভ জন্মলগ্নে গর্ভের-অন্ধকারে-বন্দী ভ্রূণ মুক্তি পায় দেহ মন প্রাণের বিকাশের আলোক-লোকে ঠিক তেম্‌নি আমাদের ভাবতনু—রসময়ী তনু—মুক্তি পায় মৃন্ময়তার তমোলোক থেকে চিন্ময়তার জ্যোতির্লোকে। এ-লক্ষ ত্রুটি-চ্যুতি ভরা জীবনে চেতনার নিচের তলায়ও যদি একথা সত্য হয় যে কোনো সাধনাই নিষ্ফল হয় না, হ'তে পারে না পারে না পারে না, তাহ'লে শুধু বুদ্ধের মহিমময় যোগসিদ্ধির ফলই হবে নিষ্ফল ? মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম চিরদিন কাঁদতেই থাকবেন ? কখনোই না—বুদ্ধের অদ্ভুত সাধনা নিষ্ফল হ'তেই পারে না। ভাবুন তো সে কী অভাববোধ ছিল তাঁর—যার বিরাট আগুনে আর সব ছোটখাটো অভাবই ভস্ম হ'য়ে গেল! আর কিছু নয়, নয়, নয়, নয়—শুধু চাই মানুষের অশুস্তি আর্তির প্রথমে নিদান পরে নিবৃতি, শান্তি।

বৈষ্ণবেরা বলেন না—বিরহের আগুনে অন্য সব কামনাই ভস্ম হ'য়ে যায়—শুধু থাকে বিরহের, অর্থাৎ মিলনতৃষ্ণার দীপ্ত শিখা? অভাববোধ থেকেই আসে ভক্তি, সে গ'ড়ে তোলে ভাবতনু, যে একবার গ'ড়ে উঠলে আর ভয় নেই কেন না তার আর নাশ নেই, কাজেই অন্তিমে ব্যর্থতা অসম্ভব। কেবল কালের অপেক্ষা—ব্যাসদেবের ভাষায় 'কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা'।"

প্রাণের তাপেই প্রাণ জাগে বিশ্বাসের ছোঁয়াচে বিশ্বাস, প্রেমের প্রসাদে প্রেম। বুদ্ধদেবের এমন মর্মস্পর্শী মহিমাকীর্তন আমি আর কখনো শুনি নি। তাই উৎসাহিত হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী থেকে কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করলাম যা আমার মনকে দোলা দেয় নানা সংশয়েরই অন্ধকারে:

"A few shall see what none yet understands ;
God shall grow up while wise men talk and sleep.
For man shall not know the coming till the hour
And belief shall be not till the work is done."

(লভিবে এ-ধ্যানসত্য শুধু কতিপয় কবি ঋষি
বোধে যারে পায় নাই আজো কেহ। স্বয়ম্ভু অরূপ
দিনে দিনে অভিনব রূপায়ণে লভিবে বিকাশ
সুবিজ্ঞের গবেষণা, অঘোর নিদ্রার অন্তরালে।
সে-আবির্ভাবের লগ্ন না রঙিলে জানিবে না কেহ,
প্রত্যয় পাবে না ভিত্তি সাধনার সিদ্ধি না মুর্তিলে।)

বললাম: "এই অবতরণকেই শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন মানুষের মহামুক্তির অগ্রদূতরূপে যার নাম দিয়েছেন তিনি অতিমানস-শক্তি, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এ-শক্তি অবতীর্ণ হবেই হবে। তাঁর জীবদ্দশায় এ-অবতরণ হ'ল না তাতে কি? তিনি গেয়েছেন মন্ত্রের উদাত্ত কল্লোলে:

Our splendid failures sum to victory···
His failure is not failure whom God leads.

প্রতি দীপ্ত বিফলতা রচি' এক নব আরোহিণী
লভিবে অন্তিমে তুঙ্গ মৃত্যুহীন জয়ের শিখর।···
নিয়ন্তা ঈশ্বর যার ব্যর্থকাম হবে সে কেমনে?"

কবিরাজ মহাশয় অবশেষে আমার প্রাণের সাড়া পেয়ে খুসি হ'য়ে বললেন : "এই বিশ্বাসই তো চাই যে বুদ্ধদেবের বা শ্রীঅরবিন্দের মহা তপস্যা ব্যর্থ হ'তে পারে না, পারে না, পারে না। সেই পরম সুদিন আসন্ন যেদিনে মানুষকে ভগবৎমুখী করবে এক অভিনব প্রেম রুদ্র করুণার মূর্তি ধ'রে—যাকে বলা যেতে পারে aggressive grace—যখন জড়ের মৃন্ময়তার মধ্যেও ফুটে উঠবে চিন্ময়ের দিব্য স্পন্দন, নাস্তিকও সে-মহালগ্নে ফিরে পাবেই পাবে বুদ্ধের মন্ত্রযানের বরে আনন্দলোকে তার হারানো স্বাধিকার।"

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : "এখানে আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই। হয়ত বুদ্ধদেব তাঁর ধ্যানে মানুষের যে-মহান্ ভবিষ্যতের ছবি দেখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দও সেই ছবিই দেখেছিলেন যখন লিখেছিলেন তাঁর সাবিত্রীর শেষ অধ্যায়ে—" ব'লে আবৃত্তি করলাম যে লাইনগুলি আমাদের মন্দিরে মাঝে মাঝেই আবৃত্তি ক'রে থাকি শ্রীঅরবিন্দের মহিমা-তর্পণে—আরো কয়েকটি লাইন আমি মুখস্থ আবৃত্তি করেছিলাম—কিন্তু সে থাক :

"A heavenlier passion shall upheave men's lives,
Their minds shall share in the ineffable gleam,
Their hearts shall feel the mystery and the fire,
Earth's bodies shall be conscious of a soul,
Mortality's bondslaves shall unloose their bonds,
Mere men into spiritual beings grow···
And common natures feel the wide uplift,
Illumine common acts with the Spirit's ray···
The Spirit shall take up the human play,
This earthly life become the life divine···
The Spirit shall look out through Matter's gaze
And Matter shall reveal the Spirit's face.

(এক দিব্যতর রাগে উচ্ছ্বসিবে মানব জীবন ;
অবর্ণ্য প্রভায় দীপ্ত হবে প্রতি মন ; প্রতি প্রাণ
উচ্ছল পুলক তথা অনলের লভিবে স্পন্দন,
এ-মৃন্ময় দেহ হবে আত্মসচেতন ; মরতার
ক্রীতদাস যত হবে মুক্ত বন্ধনের পাশ হ'তে ;

সামান্য মানবও হবে বিকশিত আত্মবোধে…প্রতি
নগণ্য আধারও হবে ধন্য সমূর্ধ্বের আকর্ষণে,
দৈনন্দিন কৃতি ক্রিয়া আলোকিবে আত্মার রশ্মিতে…
মর্ত্য লীলা নিয়ন্ত্রিত হবে পরমাত্মার নির্দেশে,
পার্থিব জীবন হবে সমুত্তীর্ণ স্বর্গীয় জীবনে…
জড় দৃষ্টি মাঝে হবে মূর্ত শাশ্বতের দৃষ্টিপাত,
জড় বস্তু প্রকাশিবে চিন্ময়ের অরূপ আনন।)

শুনতে শুনতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন: "এই-ই তো হবে—শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় দেখেছিলেন সুপ্রামেণ্টাল শক্তির ভাগবতী করুণার অবতরণে আমাদের চেতনার রূপান্তর এইভাবে আসবে ক্রমশ বিবর্তনের পথে।"

আমি বললাম: "তা তো হ'ল। কিন্তু যতদিন এ রূপান্তর না হবে ততদিন কি সাধারণ মানুষ চলবে অগুন্তি আধিব্যাধি পীড়নপেষণ অবিচার অত্যাচারের তাপে জর্জরিত হ'য়ে? শুধু সাধারণ মানুষই বা বলছি কেন? অসামান্য মানুষকেও কী দুঃখটাই না পেতে হয়, বলুন তো? আপনার মতন পরম ভাগবতেরও দেহদুঃখ পেতে হ'ল কেন—জিজ্ঞাসা করেছেন সেদিন এক ব্রহ্মচারী সাধক। এ-দারুণ দুঃখকেও কি বলবেন ভাগবতী করুণা?"

কবিরাজ মহাশয় একটু হেসে বললেন: "বলবই তো। একশোবার। শুধু বাইরেটা দেখে বিচার করলে তো সেটা সুবিচার হবে না। দেখতে হবে তিনি দেহদুঃখ বা বেদনার মধ্যে দিয়ে চেতনার কি রূপান্তর ঘটাচ্ছেন। বলুন তো, সেণ্ট ফ্রান্সিস কী অসহ্য দেহদুঃখ পেয়ে তবে ফুটে উঠেছিলেন সেণ্ট হ'য়ে? আপনি কি নিজেও কম দুঃখ পেয়েছেন? কত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবে না আলোর মধ্যে ফুটে উঠেছেন এমনটি হ'য়ে—এমন সরল উদার সহিষ্ণু সুন্দর! কত বিরহ নিরাশার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবে না আপনার কণ্ঠে জেগে উঠেছে এমন প্রাণগলানো ভক্তির গান! আমি বলছি জোর গলায়ই যে, দুঃখ বেদনাকে ঠিকম'ত গ্রহণ করতে শিখলে সাধনপথে সত্যিই এমন উপলব্ধি হয় যে বেদনাকেও মনে হয় ভগবানের দান যে-কথা কুন্তী বলেছিলেন কৃষ্ণকে তাঁর প্রার্থনায়: 'বিপদে আপদে বেদনায় যন্ত্রণায় যখনই আমি দিশাহারা হয়েছি তখনই পেয়েছি তোমার দর্শন ঠাকুর!—তাই তোমার কাছে এই প্রার্থনা

জানাই আজ যে তুমি আমাকে দুঃখের বিপদের মধ্যেই রেখো।' দুঃখশোক আধিব্যাধি জ্বালা যন্ত্রণার কালো ঝড়ে আমাদের চোখের ঠুলি অনেক সময়েই খ'সে পড়ে না কি—যার ফলে করুণার চিরন্তন জ্যোতিকে আমরা তার স্বরূপে দেখতে পাই, চিনতে শিখি ?"

কবিরাজ মহাশয় আমার গান সত্যিই ভালবাসেন। কিন্তু আমার নাস্তিক বুদ্ধিবাদী বন্ধুরা আমার গানে যে-রসটির স্বাদ পেয়ে খুসি হন—অর্থাৎ আমার গানের আর্টটুকু—কবিরাজ মহাশয় সে-রসটির পরে জোর দেন না। তিনি আর্দ্র হয়ে ওঠেন যখন আমার গানের মধ্যে ভক্তিরস ফুটে ওঠে। আমাদের মন্দিরে গত গুরুপূর্ণিমার রাতে (২৭. ৭. ১৯৬১) এসে তিনি এক ঘণ্টার উপর ছিলেন। তাঁকে কীর্তন ভজন শুনিয়ে শেষে শোনালাম মীরা সম্বন্ধে আমার সদ্যোজাত ইংরাজি কাব্যনাট্য Mira in Brindaban-এর এক অঙ্ক। শুনে তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে যাবার সময়ে বললেন : "এ মন্দিরে কী সুন্দর ভক্তির আবহ গ'ড়ে উঠেছে ! যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু যেতে তো হবে।"

*　　*　　*

কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু পাছে সে-সব ব্যক্তিগত কথা শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে বিরত হয়ে শুধু ঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনা জানিয়ে ইতি করি : যেন এমন অপরূপ মানুষটি শেষ জীবনে উত্তরোত্তর আরো অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠে আমাদের বিতরণ করেন সেই ভাগবতী করুণা—যার আলোয় তাঁর মনে নেমেছে শান্তি, চোখে জ্বলেছে আলো, অন্তরে এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ও প্রীতি।

নিউদিল্লি

২১. ৮. ৬১

দিলীপকুমার

প্রীতিভাজনেষু

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। আপনার ওখানে এতদিন আনন্দে ছিলাম। আপনাদের যত্ন ও সৌজন্য জীবনে ভুলিতে পারিব না।

আপনি ভূমি-একাগ্রতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, যোগীর চিত্ত ত্রিগুণাত্মক এবং সত্ত্বগুণপ্রধান। সকলের চিত্তই ত্রিগুণাত্মক, তথাপি সাধনসংস্কারের প্রভাবে যোগীর চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে।

আচার্যগণ চিত্তের পাঁচটি ভূমির কথা বর্ণনা করিয়াছেন—একটি মূঢ় ভূমি, একটি ক্ষিপ্ত ভূমি, একটি বিক্ষিপ্ত ভূমি, একটি একাগ্র ভূমি, একটি নিরুদ্ধ ভূমি। এই ভূমিগত পার্থক্য চিত্তের সংস্থানগত গুণভেদবশতঃ ঘটিয়া থাকে। সমাধি চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম। 'অর্থাৎ চিত্তের যে-কোনো ভূমিতে ক্ষণিক সত্ত্বগুণের উৎকর্ষবশতঃ সমাধি ঘটিতে পারে। কিন্তু সকল সমাধি যোগরূপে পরিণত হয় না। মূঢ় ও ক্ষিপ্ত ভূমির তো কথাই নাই, কারণ ঐ দুই ভূমিতে ক্রমশঃ তমোগুণ ও রজোগুণ প্রবল থাকে। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে রজোগুণের প্রাধান্য থাকিলেও সত্ত্বগুণের কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকে। কিন্তু তথাপি বিক্ষিপ্ত ভূমিতেও সমাধি যোগপদবাচ্য হয় না, কারণ ঐ অবস্থায় বিক্ষোভ থাকে চিত্তের অঙ্গী, এবং সমাধি হয় উহার অঙ্গ। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সমস্ত ভূমিটাই বিক্ষেপময়। তাই ঐ ভূমির সমাধি বিক্ষেপের অঙ্গীভূতভাবেই প্রকাশ পায়। এইজন্য যোগভূমি বস্তুতঃ দুইটি। মুখ্য যোগভূমি নিরুদ্ধ, গৌণ যোগভূমি একাগ্র। চিত্তের যাবতীয় বৃত্তির নিরোধই নিরুদ্ধ ভূমির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যাবতীয় বৃত্তির নিরোধের পূর্বে একাগ্রবৃত্তির উদয় হওয়া আবশ্যক। একাগ্রবৃত্তির উদয়কালে এক ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তির নিরোধ থাকে। তখন ঐ একবৃত্তি প্রজ্ঞা বা জ্ঞানবৃত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রজ্ঞার উদয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস হয়। অবশ্য ইহা ক্রমিক অভ্যাসের ফল। যোগের সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাতে ক্রমশঃ এই প্রজ্ঞা শোধিত হইতে হইতে অস্মিতারূপ ধারণ করে। প্রতি স্তরেই প্রজ্ঞার উদয়ের ফলে অজ্ঞানের বিনাশ সংঘটিত হয়। প্রতি স্তর মানে বিতর্ক বিচার প্রভৃতি স্তর বুঝিতে হইবে। প্রজ্ঞার উদয় হইলে এবং প্রজ্ঞা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ নিরোধের ভূমি নিকটবর্তী হইতে থাকে। প্রজ্ঞার উদয়ে কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। এইজন্য সম্প্রজ্ঞাত ভূমিতে, অর্থাৎ একাগ্র ভূমিতে, প্রজ্ঞার উদয়ের পর যখন প্রজ্ঞারও নিরোধ হইয়া যায় তখন যে সর্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হয় তাহাই প্রকৃত যোগ—তখন অজ্ঞান থাকে না এবং জ্ঞানও থাকে না—অজ্ঞানসংস্কার জ্ঞান-সংস্কারের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়—জ্ঞান-সংস্কার নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। এই নিরোধ-সংস্কার যতদিন অবস্থিত থাকে ততদিন চিত্ত অবস্থিত থাকে। বিবেক-খ্যাতি পূর্ণ হইয়া গেলে চিৎস্বরূপ পুরুষ চিত্তসত্ত্ব হইতে পৃথক্ হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই কৈবল্য। তখন সাধারণতঃ চিত্ত থাকে না। বিশেষ ভাগ্যবান্ হইলে প্রকৃষ্ট বা বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ চিত্ত থাকিতে পারে, তাহা পৃথক্ কথা।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে বৃত্তি একাগ্র হইলেও যোগ হয় না যদি ভূমি একাগ্র না হয়। সমাধি অর্থাৎ সমাধান, বৃত্তির একাগ্রতা হইলেই সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা স্থায়ীও হয় না বা প্রকৃত যোগরূপে পরিণতও হয় না যদি ঐ বৃত্তির আধার বা ভূমি একাগ্রভূমি না হয়। চিত্তে কোনো একটি ভাব স্থায়িভাব রূপে বিরাজমান না থাকা পর্যন্ত ভূমির একাগ্রতা সম্পন্ন হয় না। ভূমি একাগ্র হইলেও বৃত্তি একাগ্র না হইতে পারে, এবং বৃত্তি একাগ্র হইলেও ভূমি একাগ্র না হইতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষরূপে বুঝিয়া মনে রাখা আবশ্যক। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে সমাধি হয় সেই স্থলে সমাধি অঙ্গ, বিক্ষেপ অঙ্গী। কিন্তু একাগ্র ভূমিতে যে-বিক্ষেপ হয় বা থাকে উহা অঙ্গী নয়, অঙ্গ। প্রকৃত যোগের জন্য আবশ্যক ভূমি একাগ্র হইলে বৃত্তিও একাগ্র হইবে। এইজন্য যোগীর পক্ষে শুধু বৃত্তির একাগ্রতার জন্য চেষ্টা বা অভ্যাস মুখ্য নহে। কারণ তাহা ক্ষণকালের জন্য সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে ঘটিয়াও যাইতে পারে। যোগীর প্রধান লক্ষ্যই নিজ চিত্তের ভূমিকে বিক্ষেপ হইতে সরাইয়া একাগ্ররূপে পরিণত করা। একাগ্রভূমি লাভ হইয়া গেলে ব্যবহার কালে যে বিক্ষেপ হয় উহা যোগের বাধক নহে, কারণ ব্যবহারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তির একাগ্রতা সমাগত হয়। তখন ভূমি ও বৃত্তি উভয়ের একাগ্রতা সিদ্ধ থাকে বলিয়া তাহাই প্রকৃত যোগাবস্থা। আশা করি একটু চিন্তা করিয়া বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

২। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, উচ্চতম সত্যের উপলব্ধির জন্য অধিকার সম্পত্তি থাকা আবশ্যক। সত্যের যেটি পূর্ণ স্বরূপ তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ অধিকার থাকা আবশ্যক। এই উপলব্ধি দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ সাক্ষাৎ অব্যবহিত ভাবে, এবং দ্বিতীয়তঃ উপদেষ্টার উপদেশের মাধ্যমে। প্রথম প্রকার সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের উদয় হইবার অবকাশ নাই। কারণ যে চিত্তে সত্যের প্রকাশ ঘটিবে তাহার স্বচ্ছতার তারতম্য অনুসারে ঐ প্রকাশেও তারতম্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। চিত্ত দর্পণের ন্যায়, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আগন্তুক মল এবং স্বাভাবিক আবরণ চিত্ত হইতে অপসৃত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যের অবিকৃত স্বরূপ চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে না। যাহা কিছু চিত্তে প্রতিফলিত হয় তাহা সত্যের বিকৃত রূপ ভিন্ন অপর কিছু নহে। অধিকার ভেদ চিত্তশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। চিত্ত সংস্কার হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশুদ্ধ সত্যের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না।

বৌদ্ধগণ বলিতেন, শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা ইহাই সাধনার ক্রম। শীল এবং সমাধির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ও একাগ্রতা লাভ করে, তাই ঐ চিত্তে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। শীল ও সমাধির অভাবে সত্যের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব।

এবার দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে বলা হইতেছে: উপদেষ্টা শ্রোতার যোগ্যতা অনুসারেই উপদেশ দিয়া থাকেন। তাই বোধিচিত্তবিবরণ-এ লিখিত আছে "দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা"—অর্থাৎ যাঁহারা জগদ্গুরু ও বিশ্বের উপদেষ্টা তাঁহাদের উপদেশ শ্রোতৃবর্গের চিত্তে সংস্কার ও ভাব অনুসারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রোতা যে-প্রকার অধিকারী উপদেষ্টা গুরু তাহাকে সেই প্রকারেই উপদেশ দেন যাহাতে সে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং উপদেষ্টা এক হইলেও শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার সম্পন্ন হইলে উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যে যেভাবে ধারণা করিতে সমর্থ হয় তাহার নিকট সত্যকে সেই ভাবেই বুঝাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উপদেশের প্রকৃত লক্ষ্য একই থাকে। ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না। প্রকৃত লক্ষ্য এক, অর্থাৎ সত্যের প্রকাশ। তাই সদ্গুরুর উপদেশ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ পূর্ণ সত্য তো এক ভিন্ন নানা হইতে পারে না। অতএব অধিকার-ভেদ স্বীকার্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা না মানিলে সত্যের বিকৃতি অপরিহার্য।

মহত্তম কাব্য সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলি। কারণ পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়ে রস-বোধ জাগ্রত না থাকিলে ঐ প্রকার কাব্যের আস্বাদন ঠিক ঠিক হইতেই পারে না। সহৃদয় না হইলে রসের উদ্বোধ হইতে পারে কি? অরসিক ও রসিক সকলের পক্ষেই মহত্তম কাব্য সমভাবে আস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না। আমার স্নেহাশীষ জানিবেন। ইতি।

আপনার স্নেহার্থী গোপীনাথ

নিউদিল্লী

১০।৯।৬১

প্রীতিভাজনেষু

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এখন আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছি।

যখন বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা রচিত কোনো বস্তু ক্রিয়া করিয়া থাকে তখন ঐ ক্রিয়াটি সমষ্টির ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়, কিন্তু উহাতে সকলগুলি অবয়বের ক্রিয়াই

অন্তর্গত থাকে। তবে যেটি প্রধান, তাহার ক্রিয়া অপ্রধান অবয়ব সকলের ক্রিয়াকে অভিভূত করিয়া রাখে এবং উহাই লোকদৃষ্টিতে প্রকট হয়, অন্যগুলি অপ্রকট থাকে। তখন ঐ প্রধানটি অঙ্গী বলিয়া পরিগণিত হয়, অন্যগুলি হয় উহার অঙ্গ। অঙ্গী= Principal, অঙ্গ=Auxiliary বা সহায়ক।

বিবেকখ্যাতি=বিবেকজ্ঞান। প্রাকৃত সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের অবিবেকাত্মক মিশ্রণ রহিয়াছে, অর্থাৎ non-discrimination of one from the other; ইহাই সাংখ্যের 'অজ্ঞান'। এই অজ্ঞানবশতঃ সত্ত্ব (গুণাত্মিকা প্রকৃতি) ও পরুষ (চিৎ) এই দুইটি তত্ত্ব ভিন্ন হইলেও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। ইহাই পরিশুদ্ধ চিত্তস্বরূপ। ইহার ধর্ম অস্মিতা, অর্থাৎ "আমি আছি" এই বোধ। ইহা হইতেই স্থূল জগৎ পর্যন্ত যাবতীয় প্রপঞ্চের উদয় হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসের ফলে যোগী পর পর বিতর্ক, বিচার ও আনন্দভূমি পার হইয়া অন্তে অস্মিতা-ভূমিতে উপনীত হয়। এইখানেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবসান এবং সালম্ব প্রজ্ঞার চরম পরিণতি। প্রকৃত যোগবিভূতির এখানেই চরম বিকাশ। ইহার পর ঐ অস্মিতাটিকে ভাঙিয়া উহার চিৎ ও অচিৎ অংশদুটিকে পৃথক করিতে হয়। এই অস্মিতাই চিদচিৎ-গ্রন্থি বা অহংকার-গ্রন্থি। চিৎ-অচিতের পৃথক্‌করণ ব্যাপারটি জ্ঞানাত্মক। ইহাই বিবেকজ্ঞান যাহার নামান্তর বিবেকখ্যাতি। বিবেকখ্যাতির পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে চিৎ তত্ত্ব বা পুরুষ অচিৎ বা প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম কৈবল্য বা মুক্তি। আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহার্থী—গোপীনাথ

ষোলো

শ্রীঅরবিন্দের অদ্ভুত টানে দেশবিদেশ থেকে ভেসে আসত কতরকমেরি যে বিচিত্র মানুষ: সাধু, ব্রহ্মচারী, কবি, দার্শনিক, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, লেখক, দেশসেবক······ আরো কত নোঙরহারা মানুষ যাদের নেই সংজ্ঞা, নেই উপাধি, নেই চাল, নেই চুলো! এদের মধ্যে একটি বিচিত্রতম মানুষের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়—পণ্ডিচেরিতে—বিশ বৎসর হ'তে চলল। তিনি স্বনামধন্য শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—পণ্ডিত, রসিক, গৃহী, যাযাবর, বিপ্লবী তথা শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী—দশনামী সম্প্রদায়ের। মহাযোগী ভোলানন্দ গিরি তাঁকে হরিদ্বারে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়ে নাম দেন—বিশুদ্ধানন্দ

গিরি। কিন্তু আমরা সবাই তাঁকে "ঋষিদা" ব'লেই ডাকতাম—তিনিও আপত্তি করতেন না। বলতে কি, তাঁর কিছুতেই আপত্তি ছিল না, বলতেন প্রায়ই: আমি ঝালে ঝোলে অম্বলে সব তাতেই আছি ভাই. নাম নিয়ে কী হবে?" গেরুয়াধারী, শুদ্ধাচারী অথচ গৃহীদের সঙ্গে গৃহী, অনাচারীর সঙ্গে সহজিয়া। সংস্কৃতে অসামান্য বহুপাঠী, অথচ হাসিখুসিতে শিশুসরল। সর্বোপরি, চিন্তায় ভাবুক অথচ আচরণে উজ্জ্বল—রসরাজ! এককথায়, একটি অবিস্মরণীয় মানুষ যাকে বলে।

তাঁর কথা প্রথম শুনি বন্ধুবর শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের মুখে। নলিনীদা সম্প্রতি সপরিবারে পণ্ডিচেরির আশ্রমবাসী হয়েছেন, যদিও শ্রীঅরবিন্দকে তিনি গুরু বলতেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—যে সময়ে বারীনদা, উপেনদা, ঋষিদা ও মতিদার (শ্রীমতিলাল রায়) সঙ্গে তিনিও গুরুর কাছে যোগশিক্ষা করতেন পণ্ডিচেরির সদ্যোজাত যোগাশ্রমে। তাঁর কাছে কত যে শুনতাম ঋষিদার অন্তহীন রসিকতার গালগল্প! তারপরে বারীনদার কাছে শুনি ঋষিদার দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যের তথা অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তির কথা যে-প্রাণশক্তিতে বারো বৎসর আন্দামানে বাসের পরেও ভাঁটা পড়ে নি। আর উপেনদার মুখে শুনতাম তাঁর দুঃসাহসিকতার কথা।

দুঃসাহসী ব'লে দুঃসাহসী! যে-মানুষ গৃহী হ'য়েও বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দেয়, তীক্ষ্ণধী হ'য়েও (ঋষিদারই ভাষায়) "ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে"—ধ্রুব নিরাপদকে ছেড়ে অধ্রুব সংকটযাত্রার নেশায় মাতে, আর ক্ষণোচ্ছ্বাসের ঝোঁকে নয়—জেনেশুনে যে, দেশকে জাগাতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করলেও দেশ জাগবে না (এ-বিপুল ঘুমের দেশে ভাই, লোকে যে জাগতে না জাগতে ফের ঢুলে পড়ে—বলতেন ঋষিদা প্রায়ই—মাঝ থেকে ফল হবে শুধু হাতের পাঁচ খুইয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া) দুঃসাহসী বলব না তাকে? শ্রীঅরবিন্দ ও বারীনদার গুরু শ্রীবিষ্ণুভাস্কর লেলের কথাও ঋষিদার মুখে শুনতাম। "লেলেমহারাজ যোগী ছিলেন বটে ভাই", বলতেন ঋষিদা, "নৈলে ভাবো, মনকে একদম খাঁ খাঁ শূন্য করতে পারে কেউ? শ্রীঅরবিন্দ এঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তবে না পেয়েছিলেন গীতার 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' নির্দেশটি পালন করার কৌশল আয়ত্ত করতে? জানো তো?"

জানতাম বৈ কি। কারণ গুরুদেব ১৯৩২ সালে ৮ই মে তারিখে একটি পত্রে আমাকে স্বহস্তে লিখেছিলেন যে, লেলের নির্দেশে চ'লে তিন দিনে তিনি এমন চিন্তাশূন্যতায় আসীন হয়েছিলেন যে-ভূমিকা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় কী

ভাবে চিন্তাধারা আসে বাইরে থেকে।* আমাকে লিখেছিলেন আরো যে লেলের কাছ থেকেই তিনি প্রথম এ-আশ্চর্য অবস্থার হদিশ পান, তার আগে তিনি জানতেন না যে কোন্ চিন্তাকে আসতে দেব না দেব স্থির করবার মতন আত্মকর্তৃত্ব যোগবলে অর্জন করা যায়। এবিষয়ে আমার ইংরাজি স্মৃতিচারণ Sri Aurobindo Came to Me-তে লিখেছি বিশদ ক'রেই। তবু এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম শুধু ঋষিদার যোগতাত্ত্বিকতার খবর দিতে।

এ-খবর দেওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে এই জন্যে যে ঋষিদা সচরাচর ঘুণাক্ষরেও আভাষ দিতেন না তিনি অন্তরে কতবড় নির্ভেজাল যোগী—শান্ত, স্থির, অনাসক্ত। আমাদের সঙ্গে হাসিগল্পেই কাল কাটাতেন যাকে গ্রাম্যভাষায় বলে "ফষ্টিনাষ্টি"। কী হাসাতেই যে পারতেন!—সময়ে সময়ে তাঁর কথায় হাসতে হাসতে আমাদের সত্যিই বুকে খিল ধ'রে যেত। এমনই গুপ্তযোগী ছিলেন তিনি যে, এর, ওর, তার সঙ্গে আমি প্রায়ই বলাবলি করতাম—"ঋষিদার নিজমূর্তির খবর পাওয়া ভার, ছদ্মবেশী তিনি স্বভাবে। তাছাড়া বারোবৎসর আন্দামানে কাটিয়ে এসেও এ-সরসতা বজায় রাখা সমভাবে—কজন পারে এহেন অসাধ্য সাধন করতে?" ইত্যাদি।

কিন্তু আমি ছিলাম স্বভাবে নাছোড়বান্দা তো—ছেঁকে ধরতাম তাঁকে "এহো বাহ্য ঋষিদা, আগে কহন আর," ব'লে। তখন তিনি বলতেন—সব সময়ে নয়, তবে মাঝে মাঝে। ভাগ্যক্রমে তাঁর কয়েকটি আত্মকাহিনী প্রবন্ধে তথা গল্পাকারে প্রকাশ করেছিলাম—তাই থেকে কিছু উদ্ধৃত করি অকুতোভয়ে (একটু রং চং দিয়েই বলব—তবে মূল আখ্যান তথা ভঙ্গি বজায় রেখে)।

"কেন জানি না ভাই, আমাদের এই মনঠাকুরের লীলাখেলার তল পাবে কে বলো?"—বললেন ঋষিদা একদিন—"তবে ঠাকুর বলেছেন না মন ধোপাঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে নীল—তাই হয়ত বৈরিগিদের কথা শুনতে শুনতে আমার বালক মনে লেগে গেল সে-রঙের ছোপ। মনে হ'ল লালাবাবুর কথা, বিল্বমঙ্গলের কথা—এঁরা যখন ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে পেয়েছিলেন হরিঠাকুরকে, তখন আমিই বা পাব না কেন যদি ঘর ছাড়ি এক

* এ-চিঠিটি ছাপা হয়েছে SRI AUROBINDO ON HIMSELF & MOTHER গ্রন্থে ১৩৩ পৃষ্ঠায়: "In a moment my mind became silent……and then I saw one thought and then another coming in a concrete way from outside……" ইত্যাদি

কাপড়ে? ভাবতে দুর্মতি চাপল: স্কুলপালানো স্যাঙাৎও মিলে গেল—ঠাকুর দয়াল তো, জুটিয়ে দিলেন ব্যথার ব্যথী—সেও বলল হরিঠাকুরকে পাওয়াই চাই। অথ, একদিন রাতে আমরা দুই কিশোর, তখন আমার বয়েস তেরো কি চোদ্দ—এক কাপড়ে ঝুলি কাঁধে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম ধ্রুবের জাঁকালো শপথকে নিজের মনে ক'রে জপতে জপতে: 'তৎস্থানম্ একম্ ইচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎ পুরা'—অর্থাৎ আমি চাই শুধু সেই রাজ্য যা আমার আগে কেউ ভোগ করে নি। টোলে পড়া ছেলে—সংস্কৃত জানার অভিমানও ছিল বৈ কি। তার উপর ভর করল বৈরিগি হবার অভিমান—কাজেই আমাকে আর রোখে কে!

"ঠিক হ'ল যাব পুরী। কিন্তু পূব দিকে না গিয়ে পশ্চিমে মোড় নিয়ে পৌঁছলাম গয়া! তখন লোকে বলল এখান থেকে কাশী যাওয়াই বেশি সহজ। গয়া ভালো লাগল না, কারণ আমি তো নির্বাণ ঠাকুরকে চাই নি, চেয়েছি হরিঠাকুরকে। কাশী অবশ্য শিবের রাজধানী। হোকগে, হরি হর তো ভিন্ন নয়। তবে আর ভয় কি? তাছাড়া কাশীর দশাশ্বমেধের নাম শোনা ছিল। চললাম সেই দিকে মরিয়া হ'য়ে। হাতে যে-দুচার টাকা ছিল পথে খরচ হয়ে গেল। কাশীতে পৌঁছলাম একেবারে অকিঞ্চন অবস্থায় যাকে বলে।

"কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের প্রথম ধাক্কা এল সেখানে। ভাষ্য—দারুণ উদরাময়। হেতু—ছাতু।

কোথায় বা হরদেব কোথায়ই বা হরি?
কোথায় বা মালপোয়া—ছাতু খেয়েই মরি?

"কী করি! অগত্যা বৈরিগিকে শরণ নিতে হ'ল সংসারীর। বাবু তো আমাদের দেখেই গ'র্জে উঠলেন: 'কে রে?' আমাদের বুক কেঁপে উঠল, চিঁ চিঁ ক'রে বললাম: 'আমরা—বাবু মশায়!—দুটি কলকাতার ছেলে—কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে ভিড়ে আমাদের 'কাকা কোথায় যে হারিয়ে গেছেন—'

"বাবু মশায় দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচিয়ে নাকী সুরে বললেন: 'তঁবেঁ আঁর কী' আমার মাঁথাঁ কিঁনেছেন—কলকাতার ছেঁলে যঁখন!

"কে রে বাংলা কথা কয়?' বলতে বলতে গিন্নির অভ্যুদয়। 'আহা! কাদের বাছা রে?'

"ভরসা পেয়ে যথাবিধি চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিলাম, বললাম, 'আমাদের কাকা হারিয়ে গেছেন মা, পথের ভিড়ে—তাই দুদিন পথে পথে ঘুরছি না খেয়ে—'

"কর্তা বাদ সাধবার আগেই গিন্নি আমাদের হাত ধ'রে দাওয়ায় বসালেন : 'আহা! বোসো বাবা, বোসো। এমন সোনার অঙ্গে ছাই মাখালোই বা কোন্ পোড়ামুখো নাগা সন্নিসি শুনি?' আমরা ভয়ে ভয়ে কর্তার দিকে আড় চোখে তাকাতেই গিন্নি ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠলেন : 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা। ও-অলপ্পেয়ের ভীমরতি হয়েছে বাটবছর বয়সেই—দয়াধর্মকে বিদেয় করেছে কুলোর বাতাস দিয়ে। নৈলে এমন দুধের বাছাকে মুখ খিস্তি করে?—যাও না, তোমার পিণ্ডি গিলে যাও না আপিসে—হাঁ ক'রে দেখছ কি?'

"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—গৃহী করেনই বা কী? সোনাহেন মুখ ক'রে দুটি অন্ন গলাধঃকরণ করতঃ টঙ্গায় চেপে প্রয়াণ করলেন আপিস। পরদিন সকালেই আমাদের বললেন—'চল্, তোদের জন্যে চাঁদা চেয়ে আনি—ট্রেনভাড়া।'

"বিশ্বাস ক'রেই দ'-য়ে মজলাম। তিনি ধুরন্ধর জাঁহাবাজ—নিয়ে গেলেন গিন্নির আশ্রয় থেকে সোজা পুলিশ আখাটার বেঘোরে। পুলিশ সাহেব শুনেই সহুংকারে বললেন : 'ননসেন্স! কাকা হারিয়ে গেছে! আষাঢ়ে গল্প। মিথ্যেবাদীর ডিম—বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে মজা ক'রে ইস্কুল কামাই করতে।'

"আমরা কেঁপেই সারা। বললাম : 'মা গঙ্গার দিব্যি পুলিশসাহেব—আমরা সত্যিই—'

'ড্যাম্ ইওর মাদার গ্যাঞ্জেস! উল্লুক ছেলে! বজ্জাতির আর জায়গা পাও নি? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। থাক্ দুটোতে থানায় নজরবন্দী—বল্ বাড়ির ঠিকানা কি? অ্যাঁ?—ভবানীপুর।—চ্ছা। সেখানে আজই তার করছি। শোন্—এই! কী দুটোতে গুজুর গুজুর করছিস? শোন্ কান খাড়া-ক'রে—যদি ভালো চাস। আমার তারের আজই জবাব পাবো। যদি তোরা সত্যি হারিয়ে গিয়ে থাকিস তবে—কাকা টাকা থাক—বাড়িতে বাবা মা আছে তো! তাঁদের কাছেই পাঠিয়ে দেব, কে তোদের নেই-কাকার খোঁজ করবে শুনি? ফে-র গুজুর গুজুর!' ব'লেই আমাদের দুজনের দুকান ধ'রে টেনে এনে : 'তোরা যদি সত্যিই হারিয়ে গিয়ে থাকিস তো কোনো দুর্ভাবনা নেই, পুলিশের লোক তোদের বাড়ি পৌঁছে দেবে। কিন্তু যদি মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে থাকিস, কি বাড়ি থেকে না ব'লে পালিয়ে এসে থাকিস তো বেতিয়ে তোদের ছাল চামড়া না তুলি তো আমার নাম কৃতান্তকুমার কারকর্মা নয়।'

"আমাদের বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কেঁচো খুঁড়তে এ কী সাপ বেরুলো!

কেন মিথ্যে হরিঠাকুরকে চেয়ে বৈরিগি হ'তে বেরিয়েছিলাম! কিন্তু কী করা? একে পুলিশসুপুরিঠন্ঠন্ তার ওপরে কৃতান্তকুমার! নাম আর পদবী এ বলে আমাকে দেখ্ ও বলে আমাকে।

"কিন্তু বোকা বোকা দেখতে হ'লে কী হয়—ভিতরে ভিতরে শয়তান তো! ভালোমানুষের পো হ'য়েই র'য়ে গেলাম জমাদারের তদারকে এক টিনের ঘরে। রাতে উঠে জমাদারকে মাঠ থেকে আসছি ব'লে গাড়ু হাতে বেরিয়েই লম্বা। আমার সমানধর্মী ভায়াটিও আমার মতনই যদৃষ্টং তল্লিখিতং পন্থায় অচিরে মিললেন এসে আমার সঙ্গে মণিকর্ণিকার ঘাটে। তারপর ভোর রাত থেকে ফের চলা শুরু, এবার পুব দিকে—কলকাতা বাগে—গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোড ধ'রে। গিন্নিমা আমাদের হাতে তিনটি ক'রে টাকা দিয়েছিলেন—দোকানে ইচ্ছে হ'লে কিছু কিনে খেতে। কিন্তু সে টাকা দুদিনেই নিঃশেষ। তারপর আর কী? সনাতন ভিক্ষাবৃত্তি, আর পথ চলা। রাস্তায় জল ঝড় ধুলো কাদা কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু আশ্রয়ের। কারণ ঠেকে শিখেছিলাম তো—যেখানে সেখানে আশ্রয় চাইতে আর ভরসা পেতাম না। হয় চটি, না হয় ধর্মশালা না হয় কোনো গোয়াল ঘর গোয়াল ঘরই সই। ভাই, কলিতে যে ধ্রুব জন্মায় না—তখন বুঝলাম হাড়ে হাড়ে—ধ্রুব—যে নাকি 'সর্বতো মন আকৃষ্য' তাকে 'বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়' করতে পারত ক্ষুৎপিপাসা ভুলে। আমাদের পাপ মন ভাই, ক্ষিধে পেলে বিশ্ব ভুলে যায়—বিষ্ণু তো বিষ্ণু!

"তবু ভাই আপ্তবাক্য মিথ্যে হবার নয়—'চলাচলম্ ইদং সর্বং'—সবকিছুই চলন্ত—কাজেই দিনের পর দিন চলতে চলতে পৌঁছলাম শেষে আমরা গিরিডিতে।

"সেখানে আমার স্যাঙাতের এক মামা থাকত। সে আর না পেরে 'মামার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি' ব'লেই আমাকে রাতে একা ফেলে দে চম্পট। আমি তখন একলা আশ্রয় নিলাম এক ভাঙা মন্দিরে। আমি বুঝেছিলাম সে আর ফিরবে না—অগস্ত্যযাত্রা। কিন্তু এত ক্লান্ত যে পাশ ফিরতে না ফিরতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। যা ভেবেছিলাম। সে উবে গেছে। অম্নি ফের দুর্জয় অভিমান এল—এ-সংসারে কেউ কারো নয়। একটা গান আছে—না?

'ভেবে দেখ মন, কেউ কারো নয় মিছে ফেরো ভূমণ্ডলে
ভুলো না দক্ষিণে কালী বদ্ধ হ'য়ে মায়া জালে—'

"চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কাতর হ'য়ে ঠাকুরকে বললাম: 'ঠাকুর! তুমি জানো তোমাকে পেতে, ধ্রুব হ'তে, ঘর ঠেলেছিলাম।

কিন্তু ধ্রুব হওয়া মাথায় থাক্—এখন বাড়ি ফিরে প্রহ্লাদের বাড়া মার খেতে হবে। এমনি ক'রেই কি ছলতে হয় ঠাকুর ?'

"বলি, আর কান্না নামে তোড়ে, অভিমান ওঠে ফুঁশে : হরিঠাকুরকে তাহ'লে পাওয়া যায় না—হাজার ঘর ছাড়লেও ? ভাবি—দূর হোক গে ছাই, যে আমায় চায় না তার জন্মে আমারই বা কেন এত মাথাব্যথা ? অথচ হরিঠাকুর আমাদের সত্যি চান না একথা ভাবতেও যে বুকের মধ্যে টনটনিয়ে ওঠে ! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেমাহুষি ক্ষোভে বলি : 'ঠাকুর ! সবচেয়ে রাগ হয় তোমার ওপর—তোমার এই না-থাকার জন্মে।' এমন সময়ে কে যেন স্পষ্ট বলল : 'দূর্ ! কে বললে তিনি নেই ? তিনি আছেন বলেই সব কিছু আছে।' রুখে উঠে বললাম : 'আছেন না ঢেঁকি ! আর, যে থেকেও নেই তাকে নিয়ে আমার হবে কী শুনি ? বেল পাকলে কাকের কী ?'···এমনি সে কত ছেলেমাহুষি অভিযোগ—চোদ্দ বৎসরের অপোগণ্ড বৈ তো নই ভাই—'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি'—বলেছেন তো ঐ ঠাট্টার ঠাকুরটিই।

"এমন সময়ে"—বললেন ঋষিদা আমার হাত চেপে ধ'রে—চোখে অশ্রু-আভাস—"হলপ ক'রে বলছি তোমাকে ভাই, শুনলাম পরিষ্কার একটি অপরূপ স্বর—আহা, স্বর তো নয়, যেন বাঁশি গো ! বলছে : 'ওরে, এখানে যদি তুই কৌপীন প'রে মাত্র পনের দিন হরি হরি বলতে পারিস তবে তাঁর দেখা পাস।'

আমি এই প্রথম টুকলাম, কারণ সে-সময়ে (ইন্দিরার অভ্যাগমের আগে) আমি কোনো স্বর কি বাঁশি কি নূপুর শুনি নি। বললাম : "অ্যাঁ ! বলেন কি দাদা ? পরিষ্কার শুনলেন—যেমন শুনছেন আমার স্বর ? না, কল্পনা ?"

ঋষিদা হেসে বললেন : "ভাই ! তুমি যতটা পরিষ্কার সুরে এ-প্রশ্নটি করলে তার চেয়েও পরিষ্কার সে-স্বর। আমি এরকম স্বর আরো একবার শুনেছি—অনেক পরে। বলছি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গটা শেষ করি আগে।"

আমি বললাম : "রসুন। আমি শুনেছি সত্যিকারের দৈববাণী শুনলে মন নাকি আনন্দে ছেয়ে যায়—কল্পনার স্বরে এ হয় না।"

ঋষিদা হেসে বললেন : "সাধু সাধু ! ভুল শোনো নি ভাই। কিন্তু শুধু আনন্দই নয়—যথার্থ দৈববাণী শুধু সুধাময়ই নয়—খরধার—হৃদয়গ্রন্থি সব ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে—যেখানে ছিল সংশয়ের মরুভূমি সেখানে ফেটে পড়ে প্রত্যয়ের আকাশগঙ্গা—যেমন অর্জুনের বাণে মুমূর্ষু ভীষ্মের মুখের কাছে ছল্‌কে উঠেছিল।"

"তারপর?"

"সে কী আনন্দ! ধ'রে রাখতে পারি না। তবে কে বলে ঠাকুর ডাকলে সাড়া দেন না? আর এত কাছে তিনি! মাত্র পনেরটি দিন হরিনাম জপ করলেই তিনি দেবেন দেখা? তবে আর কি? কেল্লা ফতে—মার্ দিয়া!"

ব'লে একটু থেমে মুচকে হেসে ঋষিদা বললেন: "কিন্তু তখন কি জানি ভাই, যে অধর আর পানপাত্রের মাঝখানে চুলচেরা ফাঁকটিও পর্বতপ্রমাণ? যেই রুখে উঠে মাত্র দুটি দিন হরি হরি করেছি, অমনি বিরাট শুষ্কতায় মন হয়ে গেল মরুভূমি, আর সঙ্গে সঙ্গে—বলব কি ভাই?—মার হাতের রান্না মাছের ঝোল আর দিদিমার পায়েসের বাটি ভেসে উঠল কলির ধ্রুবমহারাজের ধ্যাননেত্রে—সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের দাবিয়ে-রাখা খিদে লোভের ঝোড়ো হাওয়ায় জ্ব'লে উঠল দাউ দাউ ক'রে—আমি সেই দিনই ভিক্ষে-ক'রে পাওয়া টাকায় টিকিট কিনে রওনা হলাম কলকাতায়।"

ঋষিদা বললেন করুণ হেসে: "এমনিই হয় ভাই তারকের তীর্থ পথে: নশ্বর দুধের বাটি আর মাছের ঝোল 'সলিড্' হ'য়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়ায় শাশ্বতের। কেবল সেদিন এই একটা মস্ত শিক্ষা হয়েছিল আমার: যে, ভগবান্‌কে চাইলে পাওয়া যেমন সুসাধ্য, পেতে চাওয়া ঠিক্ তেম্‌নি দুঃসাধ্য। আর এরই নাম হ'ল আচার্য শঙ্করের 'অনির্বাচ্যা মহতী মায়ালক্ষণা শক্তিঃ—যা নানাভাবং নয়তি—' এই হ'ল মায়া শক্তির লক্ষণ—এই বহুরূপী প্রবঞ্চনা।"

বলতে বলতে ঋষিদার চোখ দুটি শঙ্করভক্তিতে ফের চিকমিকিয়ে উঠল—বললেন গাঢ় কণ্ঠে: "অথচ একেই তোমাদের পণ্ডিচেরি আশ্রমের সবজান্তারা বলেন জগৎকে অস্বীকার করার মূঢ়তা। অর্বাচীনরা কেউ পড়েছে তাঁর ভাষ্য—ব্রহ্মসূত্র—বিবেকচূড়ামণি—আত্মবোধ? আর যদি প'ড়েও থাকে বোঝবার বুদ্ধি আছে তাদের যারা শুধু জয় গুরু জয় গুরু ক'রে ভাবে সরাসর সুপ্রামেণ্টালে পৌঁছে গোঁফে চাড়া দেবে? আচার্য শঙ্কর বরং বলেছেন বারবারই যে ভয় ভ্রান্তের কাছে সর্পে রজ্জুজ্ঞানই তো সত্য। মায়া কি নেই না কি যে তর্কের দাপটে নস্যাৎ ক'রে দেবে? আর শুধু কি শঙ্করাচার্যই মায়াকে মঞ্জুর করেছেন? গীতার ঠাকুরও বলেন নি কি—গুণময়ী মায়া দৈবী তথা দুরত্যয়া? মায়ার মোহ যদি না থাকত তাহ'লে মাছের ঝোল আর দুধের বাটির টানে কি ঠাকুরের টান হার মানত টাগ-অব-ওয়ার-এ? এ-জগতে—ঐ যে তুমিও তো গাও কী চমৎকার তোমার বাবার গান—আহা, কী গানই তিনি লিখে গেছেন:

'কেন ভূতের বোঝা বহিস মিছে,
ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উথলিছে
পূর্ণ-ইন্দু-পরকাশে!

শঙ্কর আর যাই হোক এতবড় বেকুব ছিলেন না যে বলবেন মনের স্তরে মন যা দেখে তার অস্তিত্ব নেই? তিনি বলতেন এ-স্তর পেরিয়ে শিবনেত্রে এ-জগতের যে-চেহারা দেখা যায় সে-চেহারার সঙ্গে আমাদের চর্মচক্ষে-দেখা বিশ্বের চেহারার তফাৎ আকাশ পাতাল।"

আমি বললাম: "পণ্ডিচেরির যদু মধুর ওপর রাগ করবেন না দাদা, তারা আপনার শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনতে চায় নি ব'লে। আমার আর এক বিদ্বান্ বন্ধু শ্রীরামপুরে একবার ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে শঙ্করের প্রতিভার উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে ছিল শ্রীঅরবিন্দের দুটি ধনুর্ধর শিষ্য। তারা বন্ধুবরকে অপমান করে: কী? আপনি গুরুদেবের শিষ্য হ'য়ে শঙ্করের প্রশংসা করছেন—যিনি মায়াবাদী ছিলেন ব'লে গুরুদেব তাঁর মত খণ্ডন ক'রে এসেছেন তাঁর প্রতি বইয়েই!"

ঋষিদা বললেন হেসে: "ঐখানেই তো গাড়োলেরা গোলে পড়েছে ভাই—না বুঝল শঙ্করকে, না শ্রীঅরবিন্দকে। তুমি জানো শ্রীঅরবিন্দকে আমি কী চোখে দেখি। সেদিনও তোমাকে বলেছি আমি আর এ-সাধু ও-সাধু ক'রে বহূদক হ'তে চাই না, শ্রীঅরবিন্দকে দেখে কুটীচক ব'নে গেছি, সার্থক হ'য়ে গেছে আমার জন্ম। কিন্তু তাই ব'লে কি আর সব মহাগুরুকে ছোট না করলেই নয়? আরে, শঙ্কর শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই দিক্‌পাল—শঙ্করও মণ্ডন মিশ্রের মতামত খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, যেমন চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমের মত খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। এ তাঁদের সাজে। কিন্তু তাই ব'লে যদু মধু বিধু সিধু এরাও মত দেবে শঙ্কর বড় না শ্রীঅরবিন্দ বড়, বিষ্ণু বড় না ব্রহ্মা বড়? বিক্রমাদিত্য যদি যুদ্ধ করতেন চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাহ'লে কি তাঁদের জমাদার-কোতোয়ালরা ব'লে দিতে পারত লড়াইয়ে জিৎবেন কিনি? তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ কি নিজে তাঁর 'লাইফ ডিভাইনে' প্লেটো ও শঙ্করকে বুদ্ধিলোকে মানুষের শীর্ষস্থানীয় বলেন নি?"

এর পিছনে একটি ব্যথার ইতিহাস আছে—thereby hangs a tale: সেটি হ'ল এই যে, ঋষিদা একবার পণ্ডিচেরিতে শঙ্কর সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে পাঠ দিতেন:

শ্রীঅরবিন্দের এক অতিভক্ত তাঁর ভাষণের কুব্যাখ্যা ক'রে তাঁকে থামিয়ে দেয়। ঋষিদার মনে সে-দুঃখ বরাবরই কাঁটার মতন খচ খচ করত। তাছাড়া আরো একটা কথা বুঝতে হবে ঋষিদাকে ঠিক বুঝতে হ'লে : যে, তিনি হরিদ্বারে শঙ্করভাষ্য শুধু যে পড়েছিলেন তাই নয়—শুধু স্বাধ্যায় নয়, শঙ্কর ছিলেন তাঁর কাছে ভারতের পুণ্যশ্লোক মহাজনদের অন্যতম। কী যে উৎসাহ ছিল তাঁর শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে! ঈশ কেন কঠ মণ্ডুক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদের সটীক বাংলা অনুবাদ তিনি যে কী বিপুল পরিশ্রম ক'রে প্রকাশ করেছিলেন—করতে করতে চোখের পাতা বেড়ে চোখ ঢেকে যায় তাঁর। প্রতি উপনিষদে শুধু মূল শঙ্করভাষ্য নয় সে-ভাষ্যের সুদীর্ঘ বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন তিনি যাতে শঙ্করকে লোকে ভুল না বোঝে। এ-টীকাগুলি আমাকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন—আজও পড়তে পড়তে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ের আমার অবধি থাকে না। আর যেখানেই ভালোবাসা গভীর সেখানেই একটু আঘাতও শেল হ'য়ে বাজে—কে না জানে? কিন্তু শুধু শঙ্করভাষ্য নিয়ে প্রেমের গবেষণাই নয়, তিনি যে পণ্ডিচেরিতে এবং তারপরে উত্তর-পণ্ডিচেরি জীবনে কী দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন ইষ্টকে উপলব্ধি করতে সে-খবর তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও খুব কম লোকেই রাখতেন, কারণ, বলেছি—ঋষিদার এমনিই স্বভাব ছিল—কোনদিনই ধরা ছোঁওয়া দিতে চাইতেন না তিনি! আমি তাঁকে উপাধি দিয়েছিলাম : "অগাধ জলের মীন"—মাঝে মাঝে শুশুকের মত জলের উপরে ডিগবাজি খেতেন বটে পরমানন্দে—কিন্তু তার পরেই ফিরে যেতেন স্বধামে—অগাধ জলে। বাইরে—অবিমিশ্র কাটুস-কুটুস, ছড়াকাটা, ঠাট্টা তামাসা, হাসিগল্প, ভিতরে—আত্মারাম, শান্ত, আপূর্যমান, অচলপ্রতিষ্ঠ।

সচরাচর তিনি বলতেন না তাঁর নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি-উপলব্ধির কথা। কিন্তু আমি ও ইন্দিরা হরিদ্বারে তাঁকে চেপে ধরতাম। ইন্দিরাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন বিশেষ ক'রে তার ভাবসমাধি দেখার পরে। হয়ত আরো সেই জন্যেই তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন একদিন আর একটি দৈববাণী শোনার কাহিনী। এ-কাহিনী শুনে আমি তখনই লিখে একটি মাসিকীতে ছেপেছিলাম। সেই লেখা থেকেই টুকে দিই।

* * *

পণ্ডিচেরির সঙ্গে ঋষিদার যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার পরে সেখান থেকে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হয়—নানা দুঃখকষ্ট স্বপ্নভঙ্গের মাধ্যমে

উপলব্ধি করেন ভাগবতী করুণা। কিন্তু হরিদ্বারে আমাদের মাঝে মাঝেই বলতেন: "ভাই, এখন দেখি যে কিছুই জানি না, জানতে পারি নি জানার মতন ক'রে। অথচ যৌবনে জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের কী অভিমানই না ছিল? ফলও যা হবার: হ'য়ে উঠলাম হঠকারী—কাঁচের জন্যে কাঞ্চন খোয়ালাম, বলে না? কেমন ক'রে—বলি শোনো।

"পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে কিছুদিন থেকে চ'লে আসার পরে আমার প্রথম দিকে গভীর বৈরাগ্য হয়। কেবল জপতাম ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যম্ এবাভয়ম্।' পণ নিলাম—ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে। পরিব্রাজক হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলাম মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মঠে—অদ্বৈত আশ্রমে। সেখানে এক বৎসর ধ'রে স্বাধ্যায় ও ধ্যানধারণা করার পরে হঠাৎ বিরাট শুষ্কতায় মন ছেয়ে গেল, মনে হ'ল—শুধু যে অপরোক্ষ অনুভব আমার হবার নয় তাই নয়, আশে পাশে আর কারুরই হয় নি ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। ক্ষোভ উঠল ফুলে—'দুত্তোর' ব'লে নেমে এলাম হিমালয় থেকে। কেন মিথ্যে বিড়ম্বনা? ভগবান্ পাওয়া যখন অসম্ভবের কাছাকাছি—তখন শুধু শোনা কথার বেসাতি ক'রে সিদ্ধ মহাত্মার ভড়ং ক'রে কী হবে? তার চেয়ে সৎকর্মে ব্রতী হ'য়ে সুভদ্রের মতন দেশের কাজে নামা যাক্। এখানে ওখানে নানা সাধুর কাছে গিয়ে দরবার করা শুরু করলাম: 'আপনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সবাইকে বলুন দেশের সেবা করতে, আর আপনারাও নেমে যান দেশের কাজে। মিথ্যে নাকের ডগায় ত্রাটক ক'রে ব্রহ্মনাম জপ ক'রে কেন এ-খাবি-খাওয়া? আপনাদের সাধু ব'লে নামডাক আছে, আপনারা দেশের কাজে নামলে লোকে শুনবে, দেশ বড় হবে।'

"কিন্তু উঁহুঃ! সাধুরা ভবীরও বাড়া—ভুলবার নয়। আমাকে হাঁকিয়ে দিলেন অর্ধচন্দ্র দিয়ে। আমার বিষম রাগ হ'ল, ব'লে বেড়াতে লাগলাম যে সাধুরা সবাই হয় মোহমুগ্ধ তাই না পেয়েও ভাবছে পেয়েছে, কিম্বা ভণ্ড—ভড়ং-সম্বল পরের মাথায় হাত বুলিয়ে শাস্ত্র ও ভগবানকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। লেখাপড়া তো একটু শিখেছিলাম ভাই, বলতেও পারতাম—বুলিবাজ হওয়া কিন্তু শক্ত কাজও নয়। কাজেই নানা জায়গায় এযুগের নাস্তিক ভোগবাদীদের মধ্যে লেকচার দিয়ে হাততালির হরির লুট কুড়োতে লাগলাম—প্রমাণ ক'রে যে, এই সব মেকি সাধুদের তথাকথিত জাঁকালো অনুভূতি উপলব্ধি কিছুই নয়—শুধু স্নায়বিক উত্তেজনার ফল। একমাত্র বাস্তব হ'ল মানুষ—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', বলেছেন সাক্ষাৎ

চণ্ডীদাস! অতএব ভগবান্ ভগবান্ ক'রে অনর্থক হাহুতাশ বা ভেল্কিবাজি না ক'রে জনহিতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল সৎকর্ম, বৈরাগ্য অপকর্ম, আত্মবোধ ব্রহ্মলাভ ইত্যাদি সবই বুলিবাজি।

"কিছুদিন এইভাবে যত্র তত্র বক্তৃতা দিয়ে শেষে নিলাম এক ইস্কুলে চাকরি। ছেলে ঠেঙাই আর সাধুদের ভেঙাই।

"কিন্তু—এসবের ফলে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ হ'লেও অন্তরের দিকে মাঝে মাঝে তাকাই আর চম্‌কে উঠি। সে কী অন্ধকার রে বাবা!—খাঁ খাঁ করছে! ফাঁকি দিয়ে কি আর ফাঁক ভরে রে ভাই? অথচ কর্ম জড়ায় হাজারো ফাঁসে। এতদিন ব'লে বেড়িয়েছি—সাধুরা ধ্যানীরা কেউই কিছুই পায় নি, এখন আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি কোন্ মুখে? বলি কী কোন্ মুখেই বা যে, বক্তৃতা দিয়েও বিশেষ কিছু হয় না?

"এম্‌নি শোকাবহ নাস্তিক শূন্যবিলাসী অবস্থায় একদিন এক বৈষ্ণবপদাবলীর পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ চোখে পড়ল বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিতরমণী সমাজে
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন্ কাজে?
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা!

"অম্‌নি ফের শুনলাম দৈববাণী—একেবারে প্রত্যক্ষ—ঠিক যেমন তোমার কথা শুনি তেম্‌নি পরিষ্কার: 'অমুক ভ্রান্ত, তমুক ভণ্ড—এসব রটিয়ে তোর কী লাভ হ'ল শুনি? নিজে কি পেলি কিছু—ওরা কেউই কিছু পায় নি বলতে বলতে? ছাড়্ এ মিথ্যে বাগাড়ম্বর। ছেলেবেলায় যে-ডাক শুনেছিলি অথচ সাড়া দিয়েও দিতে পারিস নি—সেই পথেই চল্ তোর স্বধর্ম পালন ক'রে—পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

"চম্‌কে গেলাম! সঙ্গে সঙ্গে চোখে নামল অশ্রুর ঢল, মনে অনুতাপ: কী ক'রে কাল কাটাচ্ছি? শ্রীঅরবিন্দকে কি দেখি নি? লেলেকে কি দেখি নি? শঙ্করাচার্যকে কি ভালোবাসি নি? আরো কত মহাজনের মুখের শান্তির ছবি ফুটে উঠল স্মৃতিপটে। অম্‌নি মুহূর্তে যেন হারানিধি ফিরে পেলাম—সঙ্গে সঙ্গে বিবেক মণি, বৈরাগ্য রতন। ফিরে এলাম সাধুর স্বধর্মে—গভীর জিজ্ঞাসায়। মনে প'ড়ে গেল—একবার কতদিন আগে পণ্ডিচেরিতে কী উপলব্ধি হয়েছিল: কৃষ্ণ এসে বলেছিলেন: 'দেখ্—তুই খাচ্ছিস নে, আমি খাচ্ছি।' অম্‌নি কী

কাণ্ড ভাই, দেখি ঘটি থেকে জল ঢালছি মুখে—কিন্তু কে ঢালছে? আমি তো নই—এ যে কৃষ্ণ! এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কৃষ্ণ চলেছেন, আমাকে বাহন ক'রে! সে যে কী আনন্দের অবস্থা ভাই, ভাষায় কেমন ক'রে প্রকাশ করব? অথচ এ-হেন দুর্লভ অবস্থা পাওয়ার পরেও ফের- এল কি না অবিশ্বাস! তবু বলবে মায়া ব'লে কিছু নেই, শঙ্কর ভ্রান্ত?"

ইন্দিরা ও আমি গভীর ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলাম।

* * *

অনেক সাধু দেখেছি—কিন্তু গৈরিকধারী শঙ্করপন্থী মায়াবাদী সাধু যে এমনটি হ'তে পারে ঋষিদাকে না দেখলে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারতাম না। এমন সরল, স্নেহময়, উদার, রসরাজ।

তিনটি কারণে তিনি আমার কাছে থাকবেন চিরস্মরণীয়: পাণ্ডিত্য থেকেও নিরভিমান; বৈরাগী হ'য়েও স্নেহশীল এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানী হ'য়েও আশ্চর্য রসিক। শেষে তাঁর রসিকতার সম্বন্ধে দু-তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ইতি করব।

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে এক ছাইমাখা নগ্ন সাধুকে দেখেছিলাম। কনকনে শীত, সাধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম: "এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বাইরের কনকনে হাওয়ায় সারাদিন ব'সে থাকেন শীত করে না আপনার?"

সাধুজির সে কী হাসি: "করলই বা শীত!"

আমি বললাম: "সে কি? যদি ধরুন অসুখ করে?"

সাধুজি ফের স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "এ-দেহ মন প্রাণ তাঁকে নিবেদন ক'রে দিয়েছি। কাজেই দেখবার ভার এখন তাঁর—আমার নয়। এই দেখ না সামনে দুটি কৃষাণ মেয়ে রাঁধছে—হাঁড়িকুঁড়ি তাদেরই। এম্নি সব সময়েই জুটে যায়। তাঁর পরে নির্ভর ক'রে কেউ কি কখনো ঠকেছে?"

আমি ও ইন্দিরা মুগ্ধ হ'য়ে সাধুজিকে প্রণাম করলাম। আমি বললাম: "সাধুজি! আশীর্বাদ করবেন যেন আপনার ভগবৎনির্ভরের ছিটেফোঁটা পাই এ-জীবনে। আপনি খাঁটি সাধু—ত্যাগী—"

সাধুজি বললেন: "রোসো বাবা! ত্যাগী কিসে? কী ছিল আমার—যাকে ত্যাগ করেছি? নৈমিষারণ্যে আমার জন্ম গরিবের ঘরে। উলঙ্গ হ'য়ে জন্মেছিলাম, সারা জীবন কেটেছে উলঙ্গ হ'য়ে—শেষ নিশ্বাস ফেলবও উলঙ্গ হ'য়ে। জন্ম-নিঃস্বকে কি ত্যাগী বলা যায়? না বাবা, ত্যাগ ট্যাগ নিয়ে কথা নয়—আসল

কথা হ'ল ঠাকুরকে ভালোবাসা—তাঁর জন্যে সব পণ করা, প্রাণ পর্যন্ত। তবে এসবই তো তুমি জানো।"

"তবু বলুন, সাধুজি।"

"কী বলব বাবা?"—সাধুজি হাসলেন ফের—"তুমিই আজ সকালে গাইছিলে না—

তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল,
বলিবার কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু
পরাণ আমার তোমারে যাচে।

এই হ'ল শেষ কথা—'শ্যামলকে বলা—তোমাকে নৈলে আমার চলে না। তোমাকে আমার চাই-ই চাই। এই একান্তী হওয়া—তাঁকে ছাড়া আর কিছুই না চাওয়া—ব্যস্, তাহ'লেই মিলবে—না মিলেই পারে না। তাঁকে যেই কেউ বলে: 'ঠাকুর আমি তোমার', সেই ঠাকুরও তাঁকে বলেন: 'আমিও তোমারি।' তবে বলার মতন বলা, ডাকার মতন ডাকা চাই, তবে না?

আরো অনেক চমৎকার চমৎকার কথা বলেছিলেন সাধুজি। কিন্তু সে থাক্। ঋষিদাকে গিয়ে বললাম: "দাদা, চমৎকার সাধু দেখে এলাম। আপনাদের দশনামী সম্প্রদায়ের সাধু, নাম বললেন—ব্রহ্মগিরি। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। একটি কথা যা বললেন আপনার কথা মনে করিয়ে দিল।"

ঋষিদার সে কী খিল খিল ক'রে হাসি। বললেন "হবে না? সব সাধুরই এক রা তো! যাহোক রা-টি কি?"

"আপনি সেদিন এক ভদ্রমহিলাকে বলছিলেন না? অবিকল সেই কথা। তিনি বলতে চেয়েছিলেন কী ক'রলে ভগবান্ লাভ হবে। আপনি বলেছিলেন: 'যখন তাঁকে আর পাঁচটার মধ্যে না চেয়ে চাইবে সবার আগে। আমি ঠাকুরও চাই, কুকুরও চাই, মুগুরও চাই পুকুরও চাই—এ নয়। শুধু ঠাকুরকেই চাই তার পরে যদি আরো কিছু চাওয়ার থাকে তবে সে তিনিই ব'লে দেবেন। ব্রহ্মগিরিজিও ঠিক এই কথাই বললেন। একেবারে নির্ভেজাল সাধু দাদা, খাঁটি মাল যাকে বলে।"

ঋষিদা হেসে বললেন: "ঠিক বলেছ ভাই। আর যুগে যুগে এরকম কয়েকটি নির্ভেজাল সাধু দেখা যায় ব'লেই এত ভেজালের বাজারেও ভগবান্‌কে ঢুঁ দিতে হয়। ভারতকে ধারণ ক'রে আছে আজ এঁদেরি তপস্যা জেনো। মহাভারতে এই কথাই

বলেছেন ব্যাসদেব। 'লোকাঃ হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে'—বিধাতার সৃষ্ট প্রতি জগৎকে তপস্যাই ধারণ করে। আর কাদের তপস্যা জানো? এই ধরণের কয়েকজন খাঁটি সাধুর।"

ব'লেই ফিক্ ক'রে হেসে: "তবে যেমন এও সত্যি যে এইজাতীয় সাঁচ্চা সাধু আজও দেখা যায় তেম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে এদের দেখা যত্র তত্র মেলে না। অনেক খুঁজতে খুঁজতে তবে মেলে। কেবল তোমাদের কলকাতার বাবুরা ত্বচারটে মেকি সাধু দেখেই যে সিদ্ধান্ত করেন যে 'অশক্তঃ তস্করঃ সাধুঃ বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী'—অর্থাৎ তস্কর যখন অক্ষম হয় তখনই সাধু হয় যেমন বেশ্যা তপস্বিনী হয় বৃদ্ধা হ'লে তবেই।" ব'লেই থেমে: "তবে সবচেয়ে বিপদ কাদের জানো? তাদের—যাদের সাধু হবার সাধ্য নেই অথচ সাধ আছে—অর্থাৎ যাদের পাকা চোর হবার প্রতিভা আছে তারাও যখন পেলা পাবার লোভে গায়ে ছাই মেখে বোম্ বোম্ ক'রে সাধু ব'নে শিষ্যদের মাথায় হাত বুলোয় তখনই ঘটে ফ্যাসাদ। কিম্বা বলতে পারো—যারা সব ছাড়বার ডাক শোনে নি তাদেরও যোগী কি ত্যাগী হ'তে চাওয়া। এইরকম সাধুরাই দু-চারদিন সাধুগিরি ক'রে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে যায়—আর অম্‌নি লোকে বলে টিটকিরি দিয়ে: 'বলেছিলাম!' আমি কিন্তু একবার এমন একটি যৌবনে-যোগী সাধু দেখেছিলাম যার জুড়ি মেলে না, মানে যে নিন্দুকদের টিট্‌কিরি দেবারও পথ রাখে নি—গুরুর কাছে গর্জন ক'রে আল্‌টিমেটাম দিয়ে। শোনো বলি।

"সে সময়ে আমি খুব সাধন ভজন করছি। হঠাৎ এক বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী গেরুয়াধারী যুবক ছাই মেখে 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'দের ক্লাসে ভর্তি হয়ে সোজা আমার কাছে এসে দরবার করলেন—ভগবান্ পাইয়ে দিতে হবে। আমি তাকে শাস্ত্রবাক্য ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে বললাম: 'ভগবান্ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় ভৈয়া! আগে গুরুবরণ করতে হবে।' উত্তরে সে যা বলল তাতে আমার চক্ষুস্থির!"

"কী রকম?"

ঋষিদা বললেন: "আর কী রকম? সে বলল: 'আমার গুরুকরণ হয়ে গেছে সাধুজি! গুরুজি বাৎলেও দিয়েছে কী কী করতে হবে। আমি সেসব করছিও বাকায়দা। কিন্তু ফল পাচ্ছি না।'

'পাবেন, চিন্তা কী?'

'মা চিন্তা আমার কিছুই নেই সাধুজি'—যৌবনে-যোগী বললেন হেসে—'আর গুরুজিও জানেন।'

"আমি তো অবাক্ শুনে"—বললেন ঋষিদা। "তাই কী বলব ভেবে না পেয়ে, শুধালাম : গুরুজি জানেন মানে? কী জানেন?'

"সে অম্লানবদনে বলল হেসে : 'গুরুজিকে বলেছি—আমার নববধূ বালিকা—বয়স এগারো। আমি গুরুজিকে পাঁচবৎসর সময় দিয়েছি। এই পাঁচবছরে ভগবান পাইয়ে দেন তো ভালো নৈলে ফিরে যাব বৌয়ের কাছে—মনে রাখবেন সে তখন হবে যোড়শী।'

ব'লেই ঋষিদার সে কী খিল খিল ক'রে হাসি!

* * *

আর এক কাহিনী!

একদিন ঋষিদা বললেন—তখন আমি কলকাতায় আশ্রমের জন্যে চ্যারিটি কন্সার্ট দিয়ে টাকা তুলছি। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই আলিঙ্গন ক'রে বললেন : "বুক জুড়োলো ভাই—কী ফ্যাসাদেই যে পড়েছিলাম!"

"ফ্যাসাদ?"

"নয়ত কী? ট্রামে ঠাঁই নেই একটি বেঞ্চিতেও—কেবল একটি মহিলাদের বেঞ্চিতে একটি মহিলার পাশে ছাড়া। আমি বললাম : 'মা! বসতে পারি কি একটু?' ওমা! তখন কি জানি—সাম্নের বেঞ্চিতেই যে-মহাকায় মহাজন হ্যাট-কোট পরা—তিনি তার ভর্তা তথা কর্তা? তিনি মুখ ফিরিয়ে গ'র্জে উঠলেন : 'অফকোর্স নট্—লেডীস্ সীট।'

"আমি বললাম একগাল হেসে : 'আমারও কোঁচা কাছা নেই, ভয় কি?' ভর্তা কর্তা প্রায় হর্তা হয়ে ওঠেন আর কি, এমন সময়ে ভর্ত্রী ধম্কে উঠলেন 'গোল কোরো না। বুড়ো মানুষ—সাধু, বসলেনই বা।'

"ভর্তা গোঁ হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। পরে একটু ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকাতেই আমি বললাম : 'সাহেবের করা হয় কী?'

"তিনি ধম্কে উঠলেন : 'আমি খেটে খাই।'

"আমি 'ও!' ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে ফের সলজ্জে বললাম : 'সাহেব খাটান কাকে?'

তিনি গম্ভীর মুখে বললেন : 'আমি কন্সাল্টিং এঞ্জিনিয়র।'

আমি একগাল হেসে বললাম : 'তবে তো আপনি আমারি দলে। আমিও যে কন্‌সাল্‌টিং এঞ্জিনিয়র।'

"তিনি ভ্রূভঙ্গ ক'রে বললেন : 'ননসেন্স! You are a parasite.'

"আমি সুধামাখা হেসে বললাম : 'না সাহেব। আপনি যেমন ইট কাট চুন সুরকির খবর রাখেন—বাড়ি কি ভাবে তৈরি করতে হয়, রাখতে হয়, মেরামত করতে হয় তার উপদেশ দেন—আমিও ঠিক তাই করি। এই যে দেহ—এতে কে থাকে, কেমন ক'রে একে টেঁকসই করা যায়। ভাঙন ধরলে কী ভাবে মেরামত ক'রে কর্তাকে রাজার হালে রাখা যায়—রোগ শোক পাপ তাপ অসুখ বিসুখে ধ্ব'সে পড়বার জো হ'লে কী ধরনের শান্তির সিমেণ্টে তাকে খাড়া রাখা যায়—কুচিন্তারা আক্রমণ ক'রে অশান্তিতে নাজেহাল করলে কী ভাবে মনকে পবিত্র করা যায় গুরুর করুণার আলোহাওয়ার ভেন্টিলেশনে—এই সব উপদেশ আমিও দিই ঠিক আপনার মতন। তবে আপনার সঙ্গে আমার কেবল একটি জায়গায় ভেদ আছে : আপনি কেউ কনসাল্‌ট্‌ করতে এলে তার কাছে ফী নেন—আমি উপদেশ দিই ফ্রী অব চার্জ, অর্থাৎ যে আসে তাকেই উদ্ধার করি—বিনামূল্যে'।"

আমরা একঘর লোক—হেসে কুটি কুটি।

আর একদিন আরো মজা হয়েছিল। ঋষিদার জবানিতেই বলি :

"আজও ফের আসছি তোমার গান শুনতে ভাই। কেবল ট্রামে নয়—বাসে। সেখানেও ফের ঐ অবস্থা। কেবল একটি কলেজের মেয়ের পাশে জায়গা আছে। আমি গিয়ে বসতেই সে বলল :

'How dare you? It's ladies'—আমি তাকে থামা দিয়ে বললাম : 'চুপ কর্। এম্‌নি কী কুরুক্ষেত্তর ঘটেছে বল্ তো যে রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে যাচ্ছিস? দিদিমা বুড়ো হয়েছেন একটু বকেছেন তাতে কী এমন মনে করবার আছে?'

"মেয়েটি তো থ। 'কী বলছেন সব ননসেন্স!"

"বাসের সবাইয়েরই চোখ তখন মেয়েটির 'পরে। আমি বললাম তাদের দিকে তাকিয়ে মিনতির সুরে : 'দেখুন তো স্যরেরা সবাই! আপনাদেরই সালিশি মানছি, বলুন তো—এ কি উচিত? অবলা যার নাম সে এমন সবলার মতন ব্যবহার করলে কি ভালো দেখায়? ওর দিদিমা ব'কে কেঁদে সারা—বললেন মেয়ে গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেল, বললে—চলে যাবে জব্বলপুর। আমি বুড়ো মানুষ—হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে বাস ধরলাম ওকে ধরতে। বলুন তো—এ কি ভালো? কার

দিদিমা না বকেঝকে? তাই ব'লে কি গঙ্গাবাগে-পা দাদামশায়কে দৌড় করাতে হয়? চ' অবলা! বাড়ি চ'—দিদিমা বকবে না আর কথা দিচ্ছি। এককাপড়ে কোথায় চলেছিস—জব্বলপুর কি এখানে রে?'

"মেয়েটির মুখ লাল হ'ল—লাফিয়ে উঠে গট্ গট্ ক'রে চ'লে গেল—লজ্জায় রাগে লাল হ'য়েও বটে, খানিকটা ভয় পেয়েও বটে—কে জানে কোন্ পাগলের হাতে পড়েছে ভেবে।"

এম্‌নি আরো কত গল্পই না করতেন ঋষিদা! রসিকতার ভাণ্ডার ছিল তাঁর অফুরন্ত। স্থানাভাব তাই আর একটু জের টেনেই ইতি করব।

* * *

ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিকলনীরা বলেন যারা আমিষাশী তারা নিরামিষাশী হ'লে প্রায়ই রসিয়ে রসিয়ে গল্প করে তাদের পুরাকালে মাছ মাংস খাওয়ার কথা। ঋষিদা গল্প করতেন তাঁর মিষ্টান্ন-প্রিয়তার কথা। বলতেন প্রায়ই হেসে: "ভাই, বয়েস আশী পেরুলো ব'লে, কিন্তু দাও আমাকে ক্ষীর ছানা ননী, দাও আমাকে মাখন পনীর সর, দাও আমাকে সন্দেশ গোল্লা জিলিপি, দাও আমাকে সরভাজা, সরপুরিয়া, মোহনভোগ মতিচুর, মনোহরা, তোফা বোঁদে, ভাপা দই, জিভে গজা—উঁহুঃ অরুচি হবে না কিছুতেই, কথা দিচ্ছি। খেলাপ হয় তো ফের পাঠিও আন্দামানে। হ্যাঁ গাওয়া ঘি—ঐ দেখ স্বরাজ হ'ল, দিল্লির লোকসভায় গরু এল যে কত দেশ থেকেই ভিড় ক'রে—শিং ভেঙে বাছুর তাই বা কত!—অগুন্তি! অথচ ঘরে ঘরে গাওয়া ঘি-ই কিনা হ'ল বাড়ন্ত!—শুধুই গোবর—তা আবার ষাঁড়ের! অথচ বলো তো ভাই, ভব্য যোগীর কি গব্য ঘৃত না হ'লে চলে?" ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে "শুধু মনস্তাপেই মিইয়ে গেলাম মা!—শরীরে আর পদার্থ নেই—" ব'লেই কপালে করাঘাত ক'রে: "কিংবা স্বয়ম্ভু শিবশক্তিদেবা কুর্বন্তি কপালদুঃখং ন দূরম্—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তেত্রিশ কোটি দেবতা সবাই মিলে চেষ্টা করলেও কপালে যা আছে হবেই হবে মা, হবেই হবে, হবেই হবে—তাই আমার হয়েছে ঘৃতচিন্তা চমৎকারা—যোগে মন বসাই কী ক'রে বলো?" ইন্দিরার চোখ ছল ছল ক'রে উঠল, বলল: "মুসুরিতে আমার বাবার চমৎকার গরু আছে, রোজ পনের সের দুধ দেয়—"

"আহা-হা-মা! তোমার বাবা আমাকে পোষ্যপুত্র নিন না—লক্ষ্মী মা আমার!—তাঁর কাছে এখন থেকে নিরন্তর কোরো আমার গুণগান।"

ইন্দিরা চোখে জল মুখে হাসি অবস্থায় সেদিনই মুসুরিতে লিখে দিল। ওর পিতা ক্যাপ্টেন কৃপারাম তাঁর বিখ্যাত সাভয় হোটেলের কর্মকর্তাকে দিয়ে বাড়ির গরুর দুধ থেকে তোলা গাওয়া ঘি পাঠিয়ে দিলেন দুবোতল। এদিকে আমি দুটিন চীজ কিনে দিলাম ঋষিদার হাতে।

বললাম: "কেবল একটা কথা, ঋষিদা। চীজের টিন খুললে তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ করে ফেলবেন কিন্তু! রেখে রেখে খাবার চেষ্টা করবেন না—বেশিদিন খাওয়া যায় না এ-বস্তু।"

"বেশ বেশ ভাই! আহা, এমন না হ'লে দরদী! এসো বুকে এসো—ঘি চাইতে চীজও এল। শতায়ু হও ভাই, সহস্রায়ু হও মা ইন্দিরা!"

তিন দিন পরে ফের দেখা—ভোলাগিরি আশ্রমে হরিদ্বারে। বললাম "কী দাদা? গাওয়া ঘি আর চীজ পেয়ে যোগে মন বসছে তো এখন?"

ঋষিদা করুণ হাসি হেসে বললেন: গাওয়া ঘি ফিরিয়ে আনল নবযৌবন ভাই—'শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল—'তুমিই সেদিন গাইছিলে না কী একটা কীর্তনে? কিন্তু হা হতোস্মি! চীজ খাওয়া বুঝি হ'ল না আর এ-জন্মে।"

"সে কি দাদা?"

"আর সে কি?" বললেন ঋষিদা সুদীর্ঘশ্বাসে। "খেলেই যে ফুরিয়ে যাবে দুদিনে!—সেই ভয়ে আর টিন খুলতে পারি নি প্রাণ ধ'রে।"

ইন্দিরা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

* * *

দুদিন বাদে সে আর এক কাণ্ড!

ঋষিদা ভোলাগিরি আশ্রমে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। চমৎকার রান্না—রাবড়ি তথা মিষ্টান্নাদি ছিল অপর্যাপ্ত। খেতে বসেছি পাশাপাশি। ঋষিদা মিষ্টান্ন দেখিয়ে বললেন: "বেল্লিক ডাক্তারে সেদিন কী বিধান দিয়েছে জানো ভাই? আমার ইউরিনে না কি শর্করার প্রাদুর্ভাব হয়েছে অত্যধিক, তাই মিষ্টি-ত্যাগ।"

'সে কি দাদা?"

"আর সে কি? তুমিই সেদিন গাইছিলে না মীরার ভজন: 'ঘায়েলকী গতি ঘায়েল জানে আওর ন জানে কোই?' কী? না, মিষ্টি খেলে এবার ঘাল হ'তেই হবে। আরে অর্বাচীন! না খেলে যে আরো ঘাল—বুঝিস না কেন?"

একজন গুরুভাই বললে: "ডাক্তারকে আপনি আরো যে-কথাটি বলেছিলেন—?"

ঋষিদা জিভ কেটে ইন্দিরাকে দেখিয়ে বললেন: "শ্-শ্!—মার সাম্‌নে বলা যায় সে-কথা?"

আহারান্তে ইন্দিরা হাত ধুতে কলতলায় গেলে ঋষিদাকে বললাম নিচু স্বরে। "কী বলেছিলেন দাদা?"

ঋষিদা (ফিস ফিস ক'রে): বলব আর কী! শুধু আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ।

আমি (সবিস্ময়ে): আনন্দ?

ঋষিদা: বাঃ সোজা আনন্দ? ইউরিনে চিনি? ভাবো তো একবার—এ আক্রাগণ্ডার দিনে! গঙ্গাজলে তো টেক্স নেই—শুধু রোদ্দুরে শুকোলেই অ্যামোনিয়া উবে যাবে থাকবে শুধু চিনি আর চিনি। আমার কপাল ফিরল ভাই—এর পরের বারে এসে দেখবে নিশ্চয় চিনি বেচে আমি লক্ষপতি হয়ে গেছি। তখন আর আমাকে পায় কে?" ব'লে সে কি শিশুর মতন হাসি!

শুধু আর একটি গল্প বলব ঋষিদার জবানীতেই।

* * *

"শ্রীঅরবিন্দের কাছে কতরকম চিড়িয়াখানার জীবই যে আসত! একদিন এসেছে এক মোটাসোটা মোহান্ত। শ্রীঅরবিন্দ তখন ঘরের মধ্যে। আমরা তাঁর অপেক্ষা করছি বাইরের বারান্দায়—আমি বারীন ক্ষিতীশদত্ত আরো কে কে। সে বললে আমাকে: 'শ্রীঅরবিন্দ মস্ত যোগী শুনে এসেছি। তিনি নিশ্চয়ই জ্যোতিষ জানেন?' আমি তৎক্ষণাৎ বললাম: 'না, তিনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি।' মোহান্তর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বললে: 'জানেন? তবে বলুন তো আমার সুদিন কবে আসবে?' আমি বললাম: 'তথাস্তু। কেবল চোখ বন্ধ করতে হবে।' সে পরমানন্দে চোখ বন্ধ করল। 'খুলো না কিন্তু যতক্ষণ না বলি—আমি দেখছি তোমার কপালটা। হ্যাঁ—এবার জিভ বের করো—আরো—আরো একটু—হয়েছে, হয়েছে, দিব্যি জিভ! একটু রোসো, আমি সমাধিস্থ হয়ে দেখি কত ধানে কত চাল। কেবল যতক্ষণ না বলি, চোখ খুলো না, এবং জিভ বের ক'রে রেখো।'—নৈলে স-ব যাবে ভেস্তে।

বেচারা তো মাকালীর মতন লকলকে জিভ বের করে চোখ বুঁজে ঠায় ব'সে

রইল। আমি আর সবাইকে ইশারা করতেই তারা পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল আমার পিছু পিছু।

"পরে শুনলাম—আধঘণ্টা সে ঐ অবস্থায় ছিল। যখন চোখ খুলল তখন দেখে ঘরে কেউ নেই।"

ব'লে ঋষিদার ফের সেই প্রাণখোলা হাসি।

* * *

উপসংহার

২০ নভেম্বর, ১৯৬১

শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ মৈত্র

কল্যাণীয়েষু,

আমরা পরশু রাতে কলকাতা কাশী অযোধ্যা ও প্রয়াগ ঘুরে পুনায় ফিরেছি। তুমি জানতে চেয়েছ এবারকার সফরের খবর। বলি—স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতেই। উপসংহারে মানাবে বেশ।

প্রতিভাবান্ অভিনেতা শ্রীতরুণ রায় কলকাতায় আমার "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাসটির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছে। তাদের থিয়েটার সেন্টারে সপ্তাহে চার বার ক'রে অভিনয় হচ্ছে। নাটকটি সে আমাদের মন্দিরে বসেই লিখেছিল গত আগস্টে। অসিতকে কেন্দ্র ক'রে সে এ-নাটকটির চমৎকার রূপ দিয়েছে— আমার সংলাপকে প্রায় সর্বত্রই বজায় রেখে। কৃতিত্ব হিসেবে আশ্চর্য বৈকি, যেহেতু তরুণ আমার ভাবের ভাবুক না হওয়া সত্বেও আমার ভাবধারা মোটামুটি বজায় রেখেছেই বলব, যার ফলে উপন্যাসটির মূল ভক্তিরস নাটকীয় চরিত্র-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোই ফুটেছে।

আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম এবার শুধু এই অভিনয়টি দেখতেই। দেখলাম দর্শকেরা সাড়া দিল। কেউ কেউ তিনবার দেখতে এসেছেন। ভাবো!

রক্সিতে আমাদের জন্যে একটি বিশেষ অভিনয় হ'ল ৭ই নভেম্বর সকালে। অভিনয়ের আগে আমি প্রায় এক ঘণ্টা গান গাইলাম।

প্রথমে আমি গেয়েছিলাম আমার স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত "মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী"— ধ্রুপদ-ধামারে পাখোয়াজের সঙ্গতে—অনামীতে গানটি দ্রষ্টব্য। ধ্রুপদের চল আজ বাংলাদেশে লুপ্তপ্রায় এ-দুঃখ রাখবার আমার জায়গা নেই। কারণ খেয়াল ঠুংরিতে

ধ্রুপদের বীর্য ওজস ও প্রাণশক্তি ঢিমিয়ে আসে। পাখোয়াজের সঙ্গতে এ-ধ্রুপদ-ধামারটি সেদিন জমেছিল আরো এইজন্যে যে সেদিন ছিল কালীপূজা। ইদানীন্তন বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধি ও আধুনিকতার যতই স্তবগান করুন না কেন, ভারত যে আজও ভারত—যা কয়েক সপ্তাহ পরে অযোধ্যায় দেখলাম—(সে কাহিনী পরে বলছি)—তাই কৃষ্ণ কালী শিবের নামকীর্তনে আজো হিন্দুর হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে—সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, আবেশে। শুধু তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দ বলতেন : ভারতীয় মনের এই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে আমাদের মধ্যে ভগবানে অবিশ্বাস প্রবল হ'লেও অনেক সময়েই সাধুসন্তকে দেখে আমরা মাথা নোয়াতে কুণ্ঠা বোধ করি না। ঠিক তেম্‌নি, গানে আর্টই সর্বেসর্বা একথা মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো গান ভজন হ'য়ে উঠে ভক্তিরস পরিবেশন করে তা'হলে দেখেছি বহুবারই যে, শ্রোতারা ভক্ত না হ'য়েও ভক্তিরসে আবিষ্ট হয়েছেন। রকসিতেও এবার ঠিক এই অঘটনটিই ফের ঘটল : যাঁরা এসেছিলেন শুধু গানের সঙ্গীতরস উপভোগ করতে তাঁদের মধ্যেও অনেকেই ভজন শুনে চোখের জল ফেললেন, তর্ক তুললেন না ভজনে শিল্পের অনুপাতে ভক্তির মশলা বেশি না কম। যাক।

এর পর ধ্রুপদী ভঙ্গিতেই গাইলাম ঢিমা তেতালায় পিতৃদেবের অপূর্ব গঙ্গাস্তোত্র সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে : "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।" পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এ-স্তোত্রটি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, যখনই কাশী যেতাম আমাকে অনুরোধ করতেন গাইতে ; বলতেন : এমন গঙ্গাস্তোত্র আর রচিত হয় নি শংকরাচার্যের "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে" স্তবটির পরে। সম্প্রতি ইন্দিরা এ-গানটির চমৎকার হিন্দি অনুবাদ করায় আমার এই মস্ত সুবিধে হয়েছে যে যত্র তত্র বাংলাগানটি গেয়ে পিঠ পিঠ হিন্দি তর্জমাটি গাই একই সুরে তালে, ফলে বহু হিন্দি শ্রোতাও পরম তৃপ্তিলাভ করেন যেমন সেদিন রকসিতে করেছিলেন।

তার পরে ইন্দিরার বাঁধা একটি মঞ্জুল মীরাভজন গাইলাম :

মেরো ধন শ্যাম নাম কৃষ্ণ হে মুরারি,
মেরী সখি, টেক এক মোহন বনওয়ারি।

এ-অপরূপ ভজনটির আমি অনুবাদ করেছি (অনামী ২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) :

সখী, মোর প্রাণধন মরণহরণ কান্ত বঁধু মুরারি।
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু যার মধুনাম বনোয়ারি।

এ-গানটি গাইতে গাইতে আর একটি অঘটন ঘটল। ভজন গায় অনেকেই। কিন্তু ভজনে ভক্তির পদার্পণ না হ'লে সে থাকে মাত্র গান—অর্থাৎ মনোহর,শ্রুতিমধুর গান হ'তে পারে, কিন্তু ভজন হয় না। যাঁরা ভক্তিকামী ওরফে আমাদের মতন সেকেলে, তাঁরা গাইবার সময়ে ঠাকুরের চরণে শুধু একটি প্রার্থনা করেন: ভজনে ভক্তির তোড় নামুক। কারণ ভক্তিকামীরা ভজন গেয়ে তৃপ্তি পান না যদি না গাইতে গাইতে বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। ভাগবতের ভাষায়:

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ? (১১-১৪-২৩)

অর্থাৎ

পুলকের শিহরণ না জাগিলে, না গলিলে প্রাণ.
আনন্দাশ্রু না ঝরিলে অঝোর ধারায়—
কেমনে লভিবে ভক্ত ভক্তিবরদান
বাসনামলিন চিত্ত হবে শুদ্ধ, হায়?

এই গানটি গাইতে গাইতে যেন আবার নতুন ক'রে ভগবানের এ-বাণীটি অনুভব করলাম যখন তান-আঁখরের সহযোগে গাওয়া শুরু করলাম শেষ চারটি চরণ:

যার গান করে গুণী, ধ্যান ধরে মুনি, রঙে রাঙে মীরা মাতি';
জপি' প্রতি শ্বাসে যার নামঝংকার—জনম মরণসাথী,
শিরে শিখিচূড়া যার—মীরা দাসী তার—জীবনের কাণ্ডারী:
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম বনোয়ারী।

সুর ভঙ্গি তাল মূর্ছনা আমার আঁখর সবই আছে নেই কেবল ভক্তি—এ অভিজ্ঞতা তো কতবারই হয়েছে আমার, আর সঙ্গে সঙ্গে মন ধিক্কার দিয়ে বলেছে: "কী হবে মিথ্যে গানের শিল্পে এর ওর তার চিত্তরঞ্জন ক'রে—ভজনকে শুধু শিল্পসুন্দর সঙ্গীতে রূপ দিয়ে?" মীরার ভাষায় "যদি ভক্তির রঙে হৃদয় না ওঠে রঙিয়ে. ঠাকুরের প্রেমে মন না ওঠে মেতে—তাহ'লে সে-গান গেয়ে হাজার বাহবা পেলেও অন্তর তো থেকে যাবেই যাবে যে-তিমিরে সেই তিমিরে!" এ-গানটি গাইবার সময়ে তাই ঠাকুরকে ডাকছিলাম: "ঠাকুর লজ্জানিবারণ করো—ভক্তির একটু ছোঁওয়া দাও"—এম্‌নি সময়ে হঠাৎ কী একটা ওলট পালট ঘটে গেল অন্তর গহনে! পরিষ্কার বুঝতে পারলাম গানের ভোল বদ্‌লে গেল—সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন ছুটে

গেল ঠাণ্ডা সুরবিহারে! অমনি মুহূর্তে বুকের মধ্যে নামল ভক্তি, চোখে ঝরল ধারা। অবশ্য আমার মতন অনধিকারীর ভক্তির আবেশ কতটুকুই বা, কিন্তু সেই অণুপ্রমাণ ভক্তিতেই ফেটে পড়ল আণবিক বোমার অঘটন—রকমারি বহু শ্রোতারই হৃদয় উঠল আর্দ্র হ'য়ে, নয়ন হ'ল সজল। যখন এ-ভক্তির জোয়ার একবার অন্তরে জাগে, তখন গায়কের মনে আর সংশয়ের লেশও থাকে না যে ঠাকুরের কৃপা সাড়া দিয়েছে প্রার্থীর আকুল ডাকে। তখন শুধু মন চায় তন্ময় হ'তে, আর প্রাণ চায় তাঁকে প্রণাম করতে—যাঁর বরে গান ভজনের সুরধুনী ছন্দে ব'য়ে চলে বাঁধভাঙা আনন্দে।

এর পরেই ধরলাম চণ্ডীদাসের অবিস্মরণীয় কীর্তন :

বঁধু, কী আর কহিব আমি ?
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি।

ভাব তখন গাঢ় হয়ে উঠেছে, পরিবেশ সম্বন্ধে এসে গেছে অর্ধবিস্মৃতি—
—আঁখরের পর আঁখর কে যেন জুগিয়ে দেয় একটার পর একটা বিনায়াসে—সে আর এক অঘটন! গান যখন শেষ হ'ল তখন রকসির বিরাট প্রেক্ষাগৃহ থমথম করছে ভাবাবেগের নীরব স্পন্দনে! তরুণ তো আমাকে আলিঙ্গন ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল! একাধিক বন্ধু আমাকে সাশ্রুনেত্রে বললেন : "আহা! কলকাতায় এমন গান আপনি বোধহয় আর কখনো গান নি।" অশীতিবর্ষীয় অধ্যাপক শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বললেন : "মহাপ্রভুর ভাবগঙ্গার বন্যা বইয়ে দিলে তুমি, দিলীপ! কত লোক দেখলাম চোখ মুছছে!" কিন্তু এসব বলছি নিজের কোনো কৃতিত্ব জাহির করতে নয়, শুধু এই সত্যটির 'পরে জোর দিতে যে সুরে প্রেমের আগুন জ্বলে কেবল তখনই যখন তিনি আগুন জ্বালিয়ে দেন। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মন্যতে"—আমি নিজের চেষ্টায় এ-আগুন জ্বালাতে পারি একথা যিনি বলেন তিনি অহঙ্কারের মূঢ় পথে চলেছেন দেউলে হ'তে। কারণ সত্যিকার আস্তিক হতে পারে শুধু সেই অকিঞ্চন যে অমৃতনিধানের কাছে হাত পাতে চোখের জলে। এই দীনতাই হ'ল সব সম্পদের মূল। আমি একবার একটি গান বেঁধেছিলাম :

বহুদুর্লভ তুমি হে শ্যামল, আপনি না দিলে ধরা,
কে কোথায় কবে শুনেছে তোমার মুরলী মধুস্বরা ?...
অকিঞ্চনের বল্লভ তুমি তারে শুধু দাও ধরা।

নয়নের নীরে তাই গাই : "করো আমারে হে দীনতম ;
তনুমন হোক আমার তোমার চরণের ধূলিসম।
প্রতিভা শকতি গরব-বিভব
করো পদানত প্রণতি-নীরব,
হে ঘনশ্যামল, অহেতু-বরষা হ'য়ে এসো তাপহরা।"
দুর্লভ তুমি, তাই গাই কেঁদে : "করুণায় দাও ধরা।"

আমার ভজন শেষ হবার পরে "অঘটন আজো ঘটে" অভিনীত হ'ল। সাঙ্গীতিক কয়েকটি ত্রুটি সত্ত্বেও দীনদয়ালের করুণার বাণী এ-নাট্যরূপে ফুটেছে এইতেই আমার আনন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। আমার মনে আজকাল কেবল দুটি প্রার্থনা জাগে যখনই লিখি বা গান গাই বা কোনো ভাষণ দিই সভাসমিতিতে : "যেন আমার প্রতি কৃতি সুকৃতি হ'য়ে ওঠে ভক্তির ছোঁয়াচে, আর যেন এই ভক্তির রঙে ভক্তিকামীদের মন একটুও অন্তত রঙিয়ে ওঠে, নৈলে বৃথাই গান গাওয়া, কথা বলা, গল্প গাঁথা, কাব্যরচনা।"

আমাকে ভুল বুঝো না। সাহিত্যসাধনায় উল্লাস নেই এমন কথা আমি বলি না। ঋষিরা বলেছেন উপনিষদে : "আনন্দেই আমাদের জন্ম, আনন্দেই আমরা বিধৃত, আনন্দেই আমদের লয়।" শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতে আছে :

There is a joy in all that meets the sense,
A joy in all experience of the soul,
A joy in evil and a joy in good,
A joy in virtue and a joy in sin :
Indifferent to the threat of karmic law,
Joy dares to grow upon forbidden soil,

অর্থাৎ

ইন্দ্রিয়ের প্রতি পথে আনন্দের পাই নিত্য দেখা,
অন্তরের প্রতি অনুভবে জাগে আনন্দ-স্পন্দন,
আনন্দ সুকৃতি মাঝে, দুষ্কৃতির মর্মেও সে রাজে,
আনন্দ পুণ্যের মাঝে, আনন্দ নিহিত পাপবুকে,
কর্মের শাসনভয় অবহেলি' নিষিদ্ধ মাটিতে
আনন্দ বিকাশ লভে দুর্দম স্পর্ধার রঙ্গে যেন!

তাইতো "শিল্প শিল্পেরই জন্যে" (art for art's sake) এ-জাতীয় মন্ত্রেরও সবটুকুই মেকি নয়। কারণ এ-মন্ত্রের মূল নিহিত রসের সত্যে। যেখানেই মানুষ রস পায় সেখানেই তার গতিবিধি হবেই হবে, কারণ আমাদের মন প্রাণ এই ভাবেই গড়া—রস নৈলে সে শুকিয়ে যায়। কিন্তু এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে রসেরও স্তর আছে, ভাবেরও গভীরতার পর্যায় আছে। তাই যে-গান, যে-কাব্য শিল্পকলার আনন্দ জোগায় তাদের রসমূল্য স্বীকার ক'রেও বলা চলে যে তাদের আঙ্গিক (কারুকৃতি) ভক্তির বাহন হ'লে গভীরতর আনন্দ সঞ্চার করে, পূর্ণতর সার্থকতার স্বাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই সাহিত্য যখন পার্থিব রসের রসদদার হয় তখন সে যেভাবে আমাদের মনপ্রাণের পুষ্টিসাধন করে তার চেয়ে গভীরতর বিকাশের সহায় হয় যখন সে পার্থিবতার আবহ কাটিয়ে আসীন হয় ভাগবতী কৃপার অপার্থিব রসলোকে। এইভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়েই আমি "অঘটন আজো ঘটে" লিখেছিলাম—গল্পভারতীকে দেবী উপাধি দিয়ে শিল্পী নাম কিনতে নয়, কল্পনাকে ভক্তির চরণমূলে নত ক'রে দাসী পদবী দিয়ে ধন্য করতে। ঠিক তেম্‌নি এক সময়ে গান গাইতাম শিল্পানন্দে, আজ গাই ভজনানন্দে—গানের কাব্যসৌন্দর্য তথা সুরের ধ্বনিসুষমার মাধ্যমে শুধু ভক্তি পরিবেশন করতে। এরই নাম শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"Art for the Divine's sake," জানি অবশ্য—এ ধরণের উক্তিকে ইদানীন্তনেরা সেকেলে—medieval—নাম দিয়ে নস্যাৎ করতে চাইবেন। কিন্তু আজকের দিনে তাঁরা নাস্তিক্যের দাপটে ভক্তি ও ভগবানের চিরন্তনী মহিমা নিয়ে হাসাহাসি ক'রে যতই কেন না আসর জমান, কালাতিপাতে শাশ্বত সত্য মানব-হৃদয়ে তার সনাতন আসন ফিরে পাবেই পাবে—রবীন্দ্রনাথের ঝংকৃত ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হ'তে পারে না :

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।

* * *

এবার কলকাতায় পরম ভাগবত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনকে ফের দর্শন করতে গিয়েছিলাম বন্ধুবর শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। সেন মহাশয় একটি চমৎকার বই লিখেছেন : "জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে"—তাঁর একটি দিব্য অনুভূতিকে ভিত্তি

ক'রে। এ-বইটির একটি ভূমিকা আমি লিখে দিয়েছিলাম শিশিরকুমারের অনুরোধে। বইটির কথা একটু বলাই চাই, কেন না সেন মহাশয়ের অনুভূতিটি শুধু দিব্য নয়—অলৌকিক আশ্চর্যতার দিক দিয়েও একটি অবিস্মরণীয় উপলব্ধি-রূপে গণ্য হবেই হবে ভক্ত তথা জ্ঞানীদের সংসদে। ঘটনাটি দুর্ঘটনার চরম হ'য়েও ভগবৎকৃপায় হ'য়ে দাঁড়ালো আনন্দময় অঘটন—যার ফলে ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের নবজন্ম হ'ল কৃষ্ণৈকান্ত বৈষ্ণবরূপে। দুর্ঘটনাটি এই: ১৩৫৬ সালে ট্রাম থেকে প'ড়ে গিয়ে চলন্ত গাড়ির চাকায় তাঁর একটি পা কাটা পড়ে। এ-শাপ কি ভাবে ঠাকুরের কৃপায় বর হ'য়ে দাঁড়ালো তাঁর ভাষাতেই বলি:

"পাখানা তখনো ট্রামের নীচে পড়িয়া আছে। কিন্তু এতবড় একটা আঘাতে বিশেষ ব্যথা অনুভব করিলাম না। কেহ যেন জোরে পাখানি একটু টিপিয়া দিয়াছে—বড় জোর এইটুকু মনে হইল।" (জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে—৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এ তো সবে আদিপর্ব অঘটনঘটনপটীয়সী কৃপার। তার পরেই কী হ'ল? না:

"ট্রাম হইতে পড়িয়া যাইবার পর দেখিতে পাই—চারদিকে যেন একটা জ্যোতির তরঙ্গ খেলিতেছে; হঠাৎ এক অপূর্ব আলোক চতুর্দিকে চকমক করিয়া উঠিল এবং সেই আলোকের স্পর্শে আমার দেহ মন যেন একটা গোটা পদ্মফুলের মত দল মেলিয়া দিল।" (৯ পৃষ্ঠা)

অপিচ: "সেই রূপের স্ফুরণজনিত কিরণ-বিকীরণে জগৎ ডুবিয়া গেল অন্য কোনো আলো থাকিল না।" (১৪ পৃষ্ঠা)

সঙ্গে সঙ্গে: "চারিদিকে মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম সকলেই ভগবানের নামকীর্তন করিতেছে।...এক সঙ্গে যেন 'ভয় নাই, ভয় নাই', এইরূপ শব্দের ঝংকার চারিদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। 'জয়, জয়, জয়' এইরূপ ধ্বনি মধুর ছন্দে হিন্দোল তুলিতেছিল। সেই স্বরের লহরে, ভাবের প্লাবনে আমার মনোবুদ্ধি এবং অহংকার ভাসিয়া গেল—আমি ডুবিলাম।" (১০ পৃষ্ঠা)

সর্বোপরি: "শুধু শোনাই নয়, শ্রবণের সঙ্গে অপূর্ব দর্শনলাভও আমার ঘটে। ফলতঃ, সেই অবস্থায় আমি অন্তরে বাহিরে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" (৯ পৃষ্ঠা)

তাঁর এই ইষ্টদর্শন ছিল একটি দিব্য দর্শন, অকাট্য সত্য দর্শন। তাই তার ফলে তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘ'টে গেছে: ভক্তিকামী আসীন হয়েছেন পরম ভাগবতের ভূমিকায়, জিজ্ঞাসু লাভ করেছেন জ্ঞানীর পদবী, সুখদুঃখের বাজারে আলো-আঁধারী পথের পথিক হয়েছেন "আনন্দী"। তাই তিনি একটি সংকীর্ণ গলির ছোট্ট বাসায় একটি ঘরে পঙ্গু হ'য়ে ছেঁড়া মাদুরে ব'সেও অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভাবে ভাবিত হ'য়ে পরমানন্দে শুধু কৃষ্ণকথাই ব'লে চলেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাকে বলেছিলেন যে নামানন্দ তাঁর অন্তরে সমস্তক্ষণই প্রবহমান, এক মুহূর্তও তিনি কৃষ্ণনাম ভোলেন না। কোনো ধ্যানোপলব্ধির প্রসঙ্গে বলেছিলেন ভাবাবেগে: "ও কিছুই নয়, কৃষ্ণলীলার সাথী হ'য়ে সব কিছুর মধ্যে তাঁর লীলা দেখে হ'তে হবে কৃষ্ণদাস। তাঁকে দর্শন ক'রে তাঁর সেবাদাস হ'তে না শিখলে কিছুই হ'ল না, কিছুই হ'ল না, কিছুই হল না।" ব'লে সোচ্ছ্বাসে ভাগবতের একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করলেন:

> "অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
> প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
> যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
> মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ (৫. ১৯. ২০)

এর ভাবার্থ: দেবতারা, স্বর্গ থেকে কৃষ্ণের মানুষ লীলাসাথীদের ভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রে বলছেন সখেদে:

> লভিল ভারতে জন্ম যাহারা—করেছিল কোন্ পুণ্য হায়!
> কৃষ্ণের লীলাসাথী আজ তারা—জাগে সাধ যার দেবহিয়ায়!

সেন মহাশয় এই ভাবে বিহ্বল হ'য়ে কত কথাই যে ব'লে চললেন একটানা। আর কী আনন্দেই যে উজিয়ে উঠলেন আমাদের দেখবামাত্র! বললেন ইন্দিরাকে দেখে যে তার হৃদয়মধ্যে দেখেছেন সাক্ষাৎ গোপীকে। ইন্দিরা আমাকে বলেছিল দুবৎসর আগে (সেনমহাশয়কে প্রথম দর্শনের পরে) যে তিনি সত্য দর্শন পেয়েছেন ঠাকুরের, তাই তাঁর আজ এমন সদাবিহ্বল অবস্থা—ভাবমুখে স্থিতি। আগে আগে ইন্দিরা প্রায়ই আমাকে বলত যে কৃষ্ণঠাকুরটি সহজে সকলকে দর্শন দেন না। বলত আরো এই জন্যে যে পণ্ডিচেরি ও অন্যত্র নানা বন্ধুই আমাকে সঘনে বলতেন যে, তাঁরা কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন আর অমনি আমি হাহুতাশ করতাম যে: "সবাই পেল

পরশমণি, আমিই শুধু রইনু প'ড়ে! ইন্দিরা হেসে বলত: "এত বুদ্ধি যার সে বুদ্ধি খাটায় না—এ আর এক আশ্চর্য! ঠাকুর কি এতই সস্তা যে তুমি তাঁর জন্যে সংসার ছেড়ে দুর্নাম কিনে নিঃস্ব হ'য়ে এত ডাকাডাকি ক'রেও তাঁর দর্শন পাচ্ছ না, আর যারা তাঁর অভিসারে বিশেষ কিছুই ছাড়ে নি, তাঁকে যারা চেয়েছে বড় জোর হাতের-পাঁচ হিসেবে—তারা শুধু দুচারটে তীর্থদর্শন ক'রে, গঙ্গাযমুনায় ডুব দিয়ে, কি কিছুদিন জয় গুরু জয় গুরু করে মেরে দেবে? যারা তাঁর দর্শন পায় তাদের জীবনের গতি ছন্দ ভাব দৃষ্টিভঙ্গি সবেরি মধ্যে বিপ্লব ঘটে যায়। তাঁর দর্শনের পরেও যাদের জীবনযাত্রা টিকিয়ে টিকিয়ে চলে 'যথাপূর্বং তথাপরং' ছন্দে—তারা নিজেদের ভোলাচ্ছে জেনো।"

সেন মহাশয় একথায় পুরো সায় দেন। লিখছেন তাঁর ইষ্টদর্শনের পরে ২১ পৃষ্ঠায়: "ভগবদ্দর্শন, দিব্যদর্শন, জ্যোতি এসব দেখা এদেশে নূতন নয়। ছোট বড় অনেকের মুখেই আমরা ঐসব কথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাই।...মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণ ঐভাবে দেখা দেন না। বাস্তবিক পক্ষে প্রেমস্বরূপ ভগবানকেও দেখিব, অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার কোনো পরিবর্তন ঘটিবে না, ইহা সম্ভব নহে। একখানা সুন্দর মুখ দেখিলে আমরা সহজে ভুলিতে পারি না, আর যিনি চিরসুন্দর তাঁহাকে দেখিবার পরেও বাহ্য ভোগবিহারে মাতামাতি করিব, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি চালাইব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির নিতান্ত স্থূল আকর্ষণের দিকে শিশুর ম'ত আসক্ত থাকিব, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।"

ইন্দিরাকে এ-কথাগুলি প'ড়ে শোনাতেই সে খুসি হয়ে আমাকে বলেছিল: "দেখলে তো? উনি যে সত্যি দেখেছেন, তাই না সে-দেখার ফলে আজ ভূমিশয্যায়ও পরমানন্দে আছেন! গতবৎসর বললেন মনে নেই—এক সাধুর দুই শিষ্য তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল, কারণ সাধু বলছিলেন সেন মহাশয় পরম-ভাগবত। শিষ্যদুটি সেন মহাশয়ের অসংলগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস শুনে গিয়ে গুরুকে বলে: কার কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাদের? বদ্ধ পাগল! শুনে সেন মহাশয় কী বলেছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন হাততালি দিয়ে: 'এই ভালো ঠাকুর, এই ভালো। আমার পাগল নামই কায়েমি কোরো—ভক্ত নাম রটলে যদি অভিমান হয়! কারণ অভিমানের লেশ উঁকি দিলেও যে তোমাকে হারাব'!"

শোনার মতন কথা বলার মতন ক'রে বলেছিলেন এই অকৃত্রিম নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, তাই যখন বলেছিলেন: "শুধু নাম শুধু নাম—নামেই সব মিলবে। 'কলৌ নাস্ত্যেব

নান্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—" তখন তাঁর কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে কেঁপে উঠেছিল। এরি তো নাম—পরম ভাগবত!

শেষে আমাকে প্রণাম করে বললেন: "ভক্তের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে আজ ভগবান্ এলেন।" আমি প্রতিপ্রণাম ক'রে করজোড়ে বলেছিলাম: "ভক্ত নই, তবে ভক্তিকামী বটে। তাই প্রার্থনা: আশীর্বাদ করুন যাতে আপনার আত্মহারা ভক্তির ছিটেফোঁটাও পাই।"

ইন্দিরার ভাবসমাধি হ'য়ে গেল তাঁর নামগানের উচ্ছ্বাসে—শুধু গাল বেয়ে অশ্রুধারা।

* * *

কলকাতায় এবার ফের দেখা হ'ল আর এক পরম ভাগবতের সঙ্গে: শ্রীমৎ গুরুদাস ব্রহ্মচারী—সাঁচ্চা সাধু। থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চবটীতে একটি ভাঙা ঘরে বহুবৎসর কাটিয়েছেন শুধু কৃষ্ণনাম জপ ক'রে। বৎসর কয়েক আগে—তাঁর সিদ্ধিলাভের পরে—একটি ভক্ত কাছেই গঙ্গাতীরে তাঁর জন্যে একটি ছোট ঘর ক'রে দিয়েছেন—সঙ্গে শুধু একটি কলতলা। ব্যস। নেই কোনো আসবাবপত্র, সতরঞ্চি কি আলমারি—শুধু মাটিতে একটি আসনে ব'সে ব্রহ্মচারীজি ধ্যান-জপ-স্বাধ্যায়ে নীরব থাকেন দিবারাত্র। এই ঘরেই আমি তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করি বৎসর দুই আগে।

শ্বেতশ্মশ্রু অশীতিপর বৃদ্ধ। ভূমিশয্যায় নিদ্রা যান। কিন্তু মুখে সে কী অপরূপ প্রশান্তি! কণ্ঠস্বরও কী স্নিগ্ধ, মধুর! কোথায় পড়েছিলাম—সিদ্ধপুরুষেরা কঠোর সাধনার অন্তে কঠোর কি শুষ্ক হন না, হ'য়ে ওঠেন আরো কোমল, রসাল। সব সিদ্ধপুরুষের সম্পর্কেই একথা খাটে কি না বলতে পারি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, এই মহাত্মার মধুর বচনে তথা কোমল চাহনিতে প্রাণ ভ'রে যায়। ইনি আজকাল কেবল দুপুরবেলা দেখা করেন—বারোটা থেকে পাঁচটা। বাকি সময়টা একলাই কাটান। আজকাল এঁর কাছে অনেক ভক্ত জিজ্ঞাসুই আসে—ইনি কদাচ কোনোসূত্রেই আর কোথাওই যান না—এই ঘরেই নিঃস্ব হ'য়েও বিশ্বলাভ ক'রে নিত্যানন্দ ভূমিতে চিরাসীন। বই বলতে দুটি—গীতা ও ভাগবত। এবার বললেন আমাকে: "এই দুটি ধর্মগ্রন্থে সবই আছে, আর কোনো বই না পড়লেও চলে। গীতা আর ভাগবত সর্ব শাস্ত্রের সার।"

তিনবারই তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম—শুধু তাঁর কথামৃত পান করতে।

সেন মহাশয়ের ম'ত তিনিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন শুধু একটি মধুর কথা : নাম করো, শুধু নাম নাম নাম। ওতেই সব পাবে। জপাৎ সিদ্ধি। কলিতে আর পথ নেই।"

এবৎসর একটি নতুন কথা বলেছিলেন : "লোকে বলে কৃষ্ণ চ'লে গেছেন। সে কি কথা ? নাম রেখে গেছেন যখন, তখন চ'লে গেছেন বলব কেমন ক'রে ? ঐ নামেই যে ভিত্তি বাঁধা। পালাবেন কোথায় ?"

মনে পড়েছিল ভাগবতের একটি বিখ্যাত শ্লোক একাদশ স্কন্ধে :

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্
হরিরবশোঽভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।

আমার "ভাগবতী কথা-"য় আমি এ-শ্লোকটি অনুবাদ করেছি :

আনমনে বলে : "কোথা বল্লভ ?"—অমনি সে-আহ্বান
তাঁহার চরণডোর হ'য়ে তাঁকে টেনে আনে লহমায়।
এমন প্রেমে যে আসীন—সে ভাগবতের মাঝে প্রধান,
পাপহারী হরি তার হৃদাসন ভুলেও ছেড়ে না যায়।

আমি এ-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর আগের বার : "কিন্তু নাম তো অনেকেই করে—ফলে ভক্তি নামে কজন ভাগ্যবানের হৃদয়ে ?"

তিনি বলেছিলেন : "নাম যতদিন হৃদয়ে না জেগে ওঠে ততদিন ভক্তি আসবে কেমন ক'রে ? কামনাবাসনার লেশ থাকলেও ভক্তি তো হৃদয়ে স্থায়ী হতে পারে না।"

আমি বলেছিলাম : "কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতেন না : 'ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো চোখের জলে ?' তাতে শ্রীগুরুদাস হেসে উত্তর দিয়েছিলেন : "কিন্তু ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে চাইলেই কি কান্না আসে ? চোখে জল আসা কি সহজ কথা ? চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হৃদয়ে ব্যাকুলতা বা চোখে প্রেমাশ্রু জাগে কি ? যথার্থ প্রার্থনা আসে কি ? তাই তো বিধি দিয়েছেন মুনি ঋষিরা—নাম করো, নিরন্তর নাম করো। অবশ্য যতদিন নামে রুচি না হয় ততদিন যে নামে মন বসে না—তোমার একথা সত্যি। কিন্তু নামে রুচি হবেও ঐ নাম

করতে করতেই। আর কোনো পথ নেই। ব্যাপার কি জানো? আমরা পাঁচটা নিয়ে থাকি। বলি ভগবানও ভালো, জগৎও ভালো, ঘরবাড়ি মান যশ ধন জন সবই ভালো। যখন নাম করতে করতে এমন অবস্থা হবে যে, নাম ছাড়া আর কিছুই ভালো মনে হবে না—তখনই হবে নামের সুরু—আর সে অবস্থা হ'লে তবেই তিনি ধরা দেবেন, তার আগে না। আর তিনি আলো ক'রে এলে দেখবে যে যে-সংসার বিষ হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর অভাবে, সে-সংসার মধুময় হ'য়ে উঠেছে তাঁর আবির্ভাবে—শুধু মানুষে নয় পশুপক্ষী গাছপালা ধুলোবালি সব কিছুর মধ্যেই।"

এই হ'ল তাঁর সাধনলব্ধ মহোপলব্ধির রোমাঞ্চকর মূল বাণী। নির্দেশ কিছু অভিনব নয়, সেন মহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলেন—কিন্তু যে-জাপক নাম ছাড়া আর কিছুই ভালো বাসেন না, যিনি পার্থিব ধুলোবালিতেও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর শ্রীমুখে নামকীর্তনের গুণগান শুনলে মন সহজেই আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এরই নাম উপলব্ধির ছোঁয়াচ। পরম ভাগবত বঙ্কিমচন্দ্র সেনও এবার বলেছিলেন কথায় কথায়: "শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে হরিনামে যে-আগুন ছুটত, সবার মুখে কি সে-আগুন ছুটতে পারে?"

অতএব খতিয়ে দাঁড়ায়—চিত্তশুদ্ধি হ'লে তবেই ধ্যানধারণা নাম প্রার্থনার উদ্দীপন হয়। নৈলে যে-পথ বেয়েই চলো না কেন তীর্থলক্ষ্যে মন প্রাণ হবে না একান্তী—চাইবে না শুধুই তীর্থসিদ্ধি। পক্ষান্তরে একবার চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে গেলেই ব্যস্, কেল্লা ফতে! নির্ভাবনা! সংশয়ও যাবে কেটে, হৃদয়ও উঠবে মেতে। এই অবস্থায়ই সাধনা হয় রসময়, ভুবন মধুময়, মন তন্ময়, প্রাণ প্রেমময়—পথ চলতে তখন ধুলো কাদায়ও আনন্দের মণিমুক্তা ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তখন ব্রহ্মচারীজির ভাষায় "প্রতি জীবের মধ্যেই শিবকে দেখতে পাওয়া যায়, কাজেই বিরহ থাকে না আর, আলোর পরে ফের অন্ধকার উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারে না।" শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ও শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারীর চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেছে ভগবানের করুণায়। তাই তাঁদের মুখে নাম জপের গুণগান শুধু যে সাজে তাই নয়—যে শোনে তারও উদ্দীপন হয়—রাতারাতি নামে রুচি না হোক, শ্রদ্ধা আসে।

* * *

অঘটন বলতে কলকাতায় একটি ভূতুড়ে কাণ্ডের কথা বলি। না বললেও চলত, কারণ ভূতুড়ে কাণ্ড তো ভূতনাথের করুণার কাহিনী নয়—নানা অবোধ্য কর্মফলের প্রায়শ্চিত্তবর্গীয় উৎপাত। তবু এ-অঘটনটির উল্লেখ করছি শুধু একটি

কারণে : যে, এতে ক'রে প্রতিপন্ন হয় যে জাগতিক অনেক কিছুরই দিশা পায় না আমাদের মানবিক বুদ্ধি—এবং অসিদ্ধ হয় বৈজ্ঞানিক মনের হসনীয় ঘোষণা যে যুক্তি দিয়ে সব কিছুরই হদিশ পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতন আশ্চর্য বুদ্ধি কালেভদ্রে দেখা যায়। এহেন মহামনীষীও বলতেন যে, ভাগবতী লীলার নাগাল পেতে পারে না মানুষের যৌক্তিক পার্থিব মন—physical mind ; সাবিত্রীতে তাই তিনি লিখেছেন :

Our reason cannot sound life's mighty sea
But only counts its waves and scans its foams.
জীবন-মহাসিন্ধুর যুক্তি কবে পায় তল ?—শুধু
ঢেউ গোনে বসি' তীরে, ফেনপুঞ্জ করে বিশ্লেষণ।

আর এর কারণ শুধু এই যে,

"For not by reason was creation made
And not by reason can the Truth be seen.
রচিত হয়নি বিশ্ব প্রবুদ্ধ যুক্তির শক্তিবলে,
পারে না লভিতে বুদ্ধি যুক্তি কভু সত্যের নিদান।

ভৌতিক অঘটনের পালাগান সুরু করার আগে পেশ করি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বন্ধুবর প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সঙ্গে যুক্তি ও বিজ্ঞান নিয়ে কিছু আলোচনা, কিছু বা বিতণ্ডার কথা। একে গৌরচন্দ্রিকা হিসাবেই ধরতে পারো।

প্রতিবার কলকাতায় গেলেই তাঁর সঙ্গে সময় ক'রে দেখা করি, কারণ প্রিয়দাবাবু ঠিক গড়পড়তা বৈজ্ঞানিকের কোঠায় পড়েন না। তিনি হয়ত নিজে মানতে চাইবেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে-ধরণের "অবৈজ্ঞানিক" গভীরতার সহজ স্থিতি তথা বিকাশ লক্ষ্য করেছি তার জন্যে খানিকটা অন্ততঃ দায়ী তাঁর ধর্মের প্রতি হিন্দুসম্ভব শ্রদ্ধা, নৈলে তাঁর বিজ্ঞানে শ্রদ্ধা তাঁকে আজ পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক শূন্যবাদী ক'রে দাঁড় করাত যেমন ওদেশের অনেক বৈজ্ঞানিককেই করিয়েছে। ইদানীন্তন বুদ্ধিবাদী ও বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবে প'ড়ে ভারতবর্ষকে আমরা যতই কেন না সেকেলে (medieval) ও গতানুগতিক (tradition-bound) ব'লে অবজ্ঞা করি, প্রিয়বাবুর কাছে গেলেই আমার মনে হয় যে বিজ্ঞানের এ-জয়-জয়-কারের যুগে তিনি যে তাঁর বিজ্ঞানভক্তিকে আজো সর্বার্থসাধিকা মনে করতে পারেন নি তার কারণ তাঁর বাইরের মনে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ রং ঝিকমিক করলেও তাঁর অন্তরে এখনো অধ্যাত্ম সাধনায় একটা সলজ্জ শ্রদ্ধার দীপ্তি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে

যায় নি। এর কারণ—আমি বলব—তিনি রক্তে ও মজ্জায় ভারতীয়। তাই তো বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর নানা অতিপ্রশস্তিতেও আমার মনে বিরস ভাব জেগে ওঠে না যেমন ওঠে অনেক গোঁড়া ও হাল্কা বৈজ্ঞানিকের গাজোয়ারি ঘোষণায় ও একদেশ-দর্শিতায়। ভারতীয় রক্ত বলতে কি বুঝছি ব্যাখ্যা করতে প্রিয়দাবাবুর একটি পত্র থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন একবার (১০. ৯. ১৯৫০): "বিজ্ঞান শক্তি বা ধনসম্পদ আহরণ করতে মানুষকে সাহায্য করতে পারে, ভোগের জন্যে নানা উপকরণও ফাঁপিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু মানুষের আত্মবিকাশে তার দিশারি হ'তে পারে না। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক—impersonal ব'লে আমাদের স্বভাবের আবেগগোত্রীয় অনুভবলোকে উচ্চতর ইষ্টার্থদের—higher values—বিকাশেও সহায় হতে অক্ষম।...তাই যদি কোনো বৈজ্ঞানিক জোর ক'রে বলেন যে বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধানের পদ্ধতিতেই আমরা পরম সত্যনির্ণয়ে পৌঁছব, বা মুক্তি কী বস্তু তার দিশা পাব তাহ'লে তাঁকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।" (তাঁর ইংরাজী পত্রের তর্জমা এটুকু)

কিছুদিন আগে তিনি আমাকে বাংলায় একটি পত্র লিখেছিলেন তাতে আরো পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ভাবুকতার—যার গুণে তিনি আমাদের মন টানেন। সে-পত্রে তিনি লিখেছিলেন (১৯. ১০. ১৯৬১): "অনেক সময় মনে হয় সবই বুঝি ফাঁকিবাজি।...দেহের অবসানে দেহীর কোনো অস্তিত্ব থাকে কি না এ নিয়ে পণ্ডিতেরা এবং সাধুসন্তেরা অনেক আশা ভরসা দিলেও অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন আমাদের ম'ত বিজ্ঞানসেবী মানুষের মনের সংশয় ঘোচে না। তাই আপনার 'অঘটন আজো ঘটে' বর্গীয় লেখাগুলি আমি মন দিয়ে পড়ি, বিশেষতঃ যখন আপনি সত্য ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে লেখেন।"

একথা যে-কোনো গতানুগতিক বৈজ্ঞানিক বলতে পারতেন, কিন্তু এর পরেই প্রিয়দাবাবু তাঁর এমন একটি ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার গভীর মিল আছে। তাঁর সে উক্তিটি হচ্ছে এই: "অনেক সময় ভাবি—বিজ্ঞান বহির্জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে এক প্রকার অসাধ্য সাধন করেছে বলা যায়, কিন্তু অন্তর্জগতের স্বরূপ ও নানা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে পারে নি। তবে হয়ত বৈজ্ঞানিক পন্থাই মানুষকে এপথে অগ্রসর হবার উপায় নির্দেশ করবে, নয়ত মানুষ যে-বিশ্বকল্যাণের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তার সন্ধান মিলতে পারে না। আজ বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার আশঙ্কা ও আতঙ্ক হচ্ছে এর প্রমাণ।"

বিজ্ঞানের সন্ধানে সীমা কোথায় প্রিয়দাবাবুর মতন চিন্তাশীল অনেক বৈজ্ঞানিকই ক্রমশঃ ধরতে পারার কিনারায় আসছেন একটু একটু ক'রে। কিন্তু বিজ্ঞান বহির্জগতে তীক্ষ্ণ বস্তুবিচার বিশ্লেষণের প্রসাদে যে-"অসাধ্যসাধন" করেছে তার ফলে একধরণের মোহ অনেক বৈজ্ঞানিককে পেয়ে বসেছে—যাঁরা মনে করেন এই মহামহীয়ান্ প্রহেলিকাময় বস্তুবিশ্বের গোলকধাঁধা থেকে নিঃসারণের পথও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানই খুঁজে বার করতে পারবে বিজ্ঞান-অনুমোদিত বুদ্ধির আপন সর্তে।

একটা গল্প বলি। এক সাধক একদা খুব উচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিলেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর সাধনা ক'রে। নিরন্তর জপতেন গীতার দুটি উক্তি: "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং" অর্থাৎ "আমারে যে ভজে যৈছে তারে আমি ভজি তৈছে" (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)। অন্যটি: "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সব ধর্ম ছেড়ে আমার শরণ নিলেই পরম সিদ্ধি। প্রার্থনায় শুধু তিনি বলতেন: "ঠাকুর! মৎস্য, কূর্ম, বরাহ—তোমার যে-রূপে ইচ্ছে দর্শন দিও কেবল হাতী বাদে।" কিন্তু বঙ্কুবিহারীর চলন-বলন ধরণ-ধারণ সবই বাঁকা তো—তিনি আচম্বিতে গণেশের মূর্তি ধ'রে হাজিরি দিলেন ভক্তের সাম্‌নে। ভক্ত তখন বুঝলেন—সর্ত ক'রে শরণাগতি হয় না, আর শরণাগতি বিনা নেই প্রেমসিদ্ধি।

বিজ্ঞানের দ্রুত প্রতিষ্ঠার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এমনিভাবেই চাইছেন সত্যকে: "সত্য! তুমি এসো, কেবল সাবধান! বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানের (statistics) পথে হাজির না দিলে মান্‌ব না তোমাকে অকাট্য সত্য বলে।" সত্য ঠাকুর নিশ্চয় মুখ টিপে হাসেন বৈজ্ঞানিকের এ-দাবি-কণ্টকিত সর্তে। পরমহংসদেবকে এক দুর্ধর্ষ তার্কিক বলেছিলেন: "যদি কোনো মহাপুরুষ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন হাতে হাতে যে, পরলোক আছে তাহ'লেই মানব, নৈলে নয়।" পরমহংসদেব হেসে বলেছিলেন: "মহাপুরুষদের দায় পড়েছে। তুমি মানো না মানো কী যায় আসে তাঁদের?"

একথায় বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকেরা বড় রাগ করেন, বলেন: "কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমরা যাকে মঞ্জুর করব না সে সত্য ব'লে কল্কে পাবে? কক্ষনো না, রইল সে একঘরে হ'য়ে।" যোগী ঋষিরা একথায় পাল্টা রাগ করেন না। শুধু স্নিগ্ধ হেসে বলেন মনে মনে: "ভায়া, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। পরম সত্যকে পাওয়া যায় না কোনো আত্মাভিমানী সর্ত ক'রে। পেতে হ'লে সব আগে ছাড়তে হবে বুদ্ধির দর্প, হাঁকডাক। চোখের জলে অনাথা দ্রৌপদীর মতন কাতর সুরে

'অগতীনাং গতির্ভব' ব'লে ডাকলে তবেই তিনি আবির্ভূত হ'য়ে সভ্যতা-সংকট থেকে তারণ করবেন, নৈলে নয়।"

আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, গহন আত্মিক শক্তি তথ্য বা তত্ত্বের পরীক্ষা হ'তে পারে না কোনো কুলীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যাঁরা চান এসব অঘটনকে কোনো সংখ্যাবিচারী নিকষে ক'ষে তবে মঞ্জুর করতে, তাঁদের কাছে সব গভীর নেপথ্য-তত্ত্বই অগোচর থেকে যাবে—ভাগবতী করুণার প্রত্যক্ষ সত্য—অপরোক্ষ অনুভূতি—বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির বকযন্ত্রে বা টেস্ট-টিউবে আবির্ভূত হবে না কোনোদিনই। শুধু তাই নয়, অধ্যাত্ম সত্যের প্রকৃতিই এম্‌নি যে সে যুক্তির পর্দায় ছায়াপাত করে না, বুদ্ধির নিকষে দাগ কাটে না। এই কথা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন ১৯৩৫ সালে একটি পত্রে: "Even in ordinary non-spiritual things the action of invisible and subjective forces is open to doubt and discussion in which there could be no material certitude—while the spiritual force is invisible in itself and also invisible in its action." (অর্থাৎ, এমন কি আধিভৌতিক জগতেও অদৃশ্য বা ব্যক্তিগত শক্তিদের সম্বন্ধে সংশয়ী আলোচনা ক'রে কোনো নৈশ্চিত্যেই পৌঁছনো যায় না, কাজেই নানা অধ্যাত্ম শক্তির সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা দেবে বলো—যখন তারা শুধু যে স্বরূপে অলক্ষ্য তাই নয়—তাদের ক্রিয়াপদ্ধতিও চাক্ষুষ করা যায় না?)

"আর এই জন্যেই"—লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ—"যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা যে, অমুক অমুক ফল ফলেছে তমুক তমুক আত্মিক শক্তির ক্রিয়ায়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ধারার অনুসারেই চলতে দেওয়া ছাড়া গতি নেই—কেন না যোগীরা নানা আত্মিক সত্যকে অঙ্গীকার করেন তো কোন অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তির এজাহারে নয়, করেন—হয় উপলব্ধির বা বিশ্বাসের আলোয়, না হয় হৃদয়ের অন্তর্দৃষ্টির বা গভীর বোধের নির্দেশে—যে-দৃষ্টি বা বোধ দৃশ্যমানের আড়ালের নেপথ্য তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়।"

তাই—শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়ে আমাকে লিখেছিলেন—"The spiritual consciousness does not claim in that way, it can state the truth about itself but not fight for a personal acceptance." (অধ্যাত্ম চেতনা সত্য সম্বন্ধে শুধু তার দর্শন বা উপলব্ধিকে পেশ ক'রেই খালাস, বলে না: সবাইকেই এসব মানতে হবে—না মানলে যুদ্ধং দেহি।")

প্রিয়দাবাবু উদার বৈজ্ঞানিক তথা দরদী বুদ্ধিবাদী, তবু যোগীদের গ্রহণবর্জন-পদ্ধতি সম্ভবতঃ তাঁর চোখে গ্রাহ্য মনে হবে না। নাই হ'ল, শ্রীঅরবিন্দ তো বলছেনই সত্যদ্রষ্টা যোগীরা মোটেই মাথা বকান না তাঁদের সত্যনির্ণয়ের নিকষকে কে বরণ করল না করল। তাঁরা চলবেনই চলবেন নিজের অন্তরের আলোয় তীর্থলক্ষ্যের পানে। কেবল এখানে একটি কথা বলবার আছে: প্রতি জিজ্ঞাসুই তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর চাইবেন তাঁর স্বধর্মনির্দিষ্ট পথে—তথাস্তু। কেবল এইটুকু বিনম্র স্বীকৃতি প্রত্যেকেরই থাকা বাঞ্ছনীয় যে, আমি যাকে বরণীয় মনে করছি বা যে-ভাবে সত্যকে পরখ করতে চাইছি সে-পথে যারা সত্যসন্ধানে না চলে তারা সবাই মরীচিকামুগ্ধ। কাজেই ধরো, বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা যে-জাতীয় প্রমাণকে "অকাট্য" উপাধি দেন যোগীরা সে-জাতীয় প্রমাণ বিনাও যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এজাহারে আত্মার অবিনশ্বরতাকে মঞ্জুর করেন তবে তাঁদের ভ্রান্ত বলার কোনো যৌক্তিক অধিকারই বৈজ্ঞানিকদের নেই, থাকতে পারে না। জীবনসমুদ্র বিশাল। তার নানা তরঙ্গের আবর্তের নানা লীলা, নানা রং, অতলে কত শত নাম-না-জানা মণিমুক্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নানা ডুবুরি নানা পদ্ধতিতে ডুবসাঁতার কেটে রকমারি মণিমুক্তা আহরণ করেন, নানা তরীতে নানা পালে নানামুখী হাওয়ায় নানা বন্দরে পৌঁছন। বেশ তো! বৈজ্ঞানিকেরা চলুন তাঁদের নিজের পথে—নিজের বুদ্ধি বিবেক বিচারের আলোয়; কবি শিল্পীরা চলুন তাঁদের স্বকীয় পথে—সৌন্দর্যের ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তীর্ণ হোন নানা রসের, রূপের ভাবের রাজ্যে; আবার যোগী ধ্যানীরা উড়ে চলুন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে ধ্যানের পাখায় শান্তি মৈত্রী করুণার বৈকুণ্ঠকে বরণ ক'রে, কোন্‌টা ধ্রুবতারা আর কোন্‌টা আলেয়া—শুধু তাঁদের যোগালোকলব্ধ আলোয় যাচাই ক'রে এগিয়ে চলুন। যোগীরা স্বভাব-সহিষ্ণু, তাই বৈজ্ঞানিকদের মনোবৃত্তিকে বোঝেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা দর্পী ও রোখালো, তাই যোগী ঋষিদের ধ্যানলব্ধ বাণীকে বলেন সোনার হরিণ, মায়াকল্পনা। এইখানেই তর্ক ওঠে বাগ্বিতণ্ডার কোঠায়, যেখানে কোনো প্রশ্নেরই নিষ্পত্তি হ'তে পারে না। তবে ভরসার কথা এই যে, প্রিয়দাবাবু এ-জাতীয় অসহিষ্ণু বৈজ্ঞানিক নন, তাই বলেন না—যে-কথা আমাকে লিখেছিলেন কোনো এক গোঁড়া বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আমার "অঘটন আজো ঘটে" প'ড়ে: "তুমি লিখেছ অঘটন আজো ঘটে। ভুল দিলীপ, ভুল! অঘটন কোনো দিনই ঘটে নি, ঘটছে না বা ঘটবে না।" উত্তরে আমি তাঁকে কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রশ্ন

করি: "এবার?" তাতে তিনি উত্তর দেন: "এবার একটু ফাঁপরে পড়েছি বৈকি, কারণ কোথায় তোমার ভুল হচ্ছে ঠিক ধরতে পারছি না, অথচ তোমার কথা মেনে নেওয়াও অসম্ভব। তবে এটুকু আমি মানি যে, যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে হয়ত বাজিতে তুমিই জিতলে কারণ যোগের জপতপের পথে শান্তি পেয়েছ—যেখানে বিজ্ঞানের বুদ্ধিবাদী পথে আমাদের দোদুল্যমান মন শুধু সংশয় ও অশান্তির অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

ইনি হ'লেন পাশ্চাত্ত্য রোখালো বৈজ্ঞানিকদের সগোত্র—"মরি তো মর্যাদা ছাড়ব না" যাঁদের জপমন্ত্র। অথচ মজা এই যে, এ-জাতীয় বৈজ্ঞানিকেরো যুক্তি বা বিশ্বাসের পিছনে অবিশ্বাস থাকে লুকিয়ে। তাই তো এত অশান্তি—যুক্তিতর্ক হালে পানি পায় না ব'লেই! পক্ষান্তরে, আর এক জাতের বৈজ্ঞানিক দেখা যায়—(যাঁদের আমি দরদী ব'লে বরণ করি, যেমন প্রিয়দাবাবু)—যাঁদের অবিশ্বাসের পিছনেও গা-ঢাকা হ'য়ে থাকে অতীন্দ্রিয় অনুভব উপলব্ধিতে ঠিক বিশ্বাস না হোক—মরিয়া-না-মরে-রাম বর্গীয় শ্রদ্ধা। আর এ-শ্রদ্ধা ম'রেও মরে না কেন—তার মূল খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে ভারতীয় সংস্কার—আমরা যাকে পরম বরদ মনে ক'রে থাকি, কেন না আমরা বুদ্ধির তুফানে বহু হাবুডুবু খেয়ে তবে এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছি যে সে-তুফান দৃষ্টিকে সব সময়ে স্বচ্ছ করে না, তাই পারে না পরম মুক্তি বা প্রজ্ঞার দিশা দিতে—হাঁকে: বুদ্ধির দূরবীনে যে-সুদূর বন্দরের দেখা মেলে না সে-সত্য নামঞ্জুর।

একটা উদাহরণ দিই। এবার কলকাতায় প্রিয়দাবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় জ্যোতিষ নিয়ে তর্ক উঠল। তিনি বললেন: "মানি না।" আমি বললাম: "মানেন না কারণ বুদ্ধি দিয়ে ঠাহর পান না—জ্যোতিষ সত্য হ'তে পারে কেমন ক'রে। কিন্তু হয়। এ আমি অকাট্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি—একাধিক দৃষ্টান্ত দিতে পারি।" প্রিয়দাবাবু হেসে বললেন: "কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে জ্যোতিষীর পাঠ ভুল হয়।" আমি বললাম: "তাতে কি? অমোঘ ডাক্তারি ওষুধও অনেক ক্ষেত্রে ফলে না। তাই ব'লে কি ডাক্তারি ওষুধের শক্তিমত্তা 'নামঞ্জুর' বলবেন? কিম্বা ধরুন ভূত কি তন্ত্র। একদা আমি যৌবনদৃপ্ত যৌক্তিক বুদ্ধিকে মেনে বলতাম যে ভূত নেই, বা তান্ত্রিক অভিচার শক্তি সব কুসংস্কার। কিন্তু এসব স্থলে অনেক ক্ষেত্রে ভূতুড়ে কাণ্ডে জাল জুয়াচুরি আছে—শুধু এই চুক্তির জোরে বলা চলে কি যে, এসবই ফক্কিকারি? আপনি বলবেন:

বিজ্ঞান মঞ্জুর করতে পারে কেবল পরিসংখ্যানের পুঞ্জীভূত এজাহার। উত্তরে আমি বলব: এ-পদ্ধতিতে সত্যনির্ণয় বিজ্ঞানের পথ হ'তে পারে কিন্তু তাব'লে তাঁদের একথা মেনে নেওয়া চলে না যে, সর্ববিধ সত্যের দেখাই মিলবে কেবলমাত্র এই একটি বাঁধা-ধরা বৈজ্ঞানিক পথে। একটা উদাহরণ দেই: নানা তান্ত্রিক অভিচার-শক্তি যে দূর থেকে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে, বা বিদেহী আত্মার দেখা পাওয়া যায়—এর অকাট্য ব্যক্তিগত প্রমাণ পেয়েছি আমি তিন-চারটি ক্ষেত্রে। তাই অনেক ক্ষেত্রে জালিয়াৎ বিদেহী আত্মা নিজেকে মূল মহাত্মা ব'লে জানান দেয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তান্ত্রিক শক্তি ব্যর্থ হয় বলেই সরাসর রায় দেওয়া চলে না যে, সব ক্ষেত্রেই তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অন্য ভাষায়, যেসব ক্ষেত্রে তারা যথার্থ আত্মপরিচয় দিয়েছে ব'লে না মেনে গত্যন্তর নেই সে-সব ক্ষেত্রেও তাদের বরখাস্ত করা চলে না এই অপল্‌কা যুক্তিতে যে, বিজ্ঞানের সংখ্যাবিচারী পদ্ধতিতে তাদের ঢেলে সাজানো যায় না। আসলে, জীবন এতই জটিল ও দুরবগাহ যে, কেউই বলতে পারে না—শুধু অমুক অমুক যুক্তিসিদ্ধ পথেই সে-জটিলতার গ্রন্থিমোচন হতে পারে, বাকী সব পথই বিপথ সুতরাং নামঞ্জুর। আমাদের সনাতন উপনিষদের ঋষিরা বারবার ঠেকে শিখে তবে ঘোষণা করেছেন যে, পরম সত্য তর্কাতীত (অতর্ক্য) তথা যুক্তির নাগালের বাইরে, কেন না "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ"—চক্ষু বাক্ মন কিছুই পায় না তার এলাকায় পৌঁছতে। (কেনোপনিষদ)

এ-ভূমিকা করলাম আরো একটি কারণে: এ-সব তর্কাতর্কির দু'তিন দিন পরেই প্রিয়দাবাবু তাঁর এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন খানিকটা নাজেহাল হ'য়েই বলব। কারণ এ-বন্ধুটির ভৌতিক অভিজ্ঞতা অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও এতই অকাট্য যে, প্রিয়দাবাবু-যে-প্রিয়দাবাবু তিনিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন—যে-কথা তাঁর বন্ধু আমাকে তাঁর পত্রের শেষে লিখেছেন। এবার বলি এই দুর্দান্ত অঘটনটির কথা।

এই বন্ধুটির নাম গোপন রাখছি শুধু এই জন্যে যে, তিনি আমাকে এ-ঘটনাটি বলেছিলেন হয়ত ধ'রে নিয়ে যে এ-অঘটনের কথা আমি প্রকাশ করব না। তবে এ-দুর্দৈবের কথা আজ কলকাতায় অনেকেই জেনে ফেলেছেন—মুখে মুখে র'টে গেছে—তাই আশা করি বন্ধু রুষ্ট হবেন না যদি তাঁর এজাহার প্রকাশ করি। ইন্দিরা ও আমাকে তিনি দুদিন ধ'রে বলেছিলেন এ-দুর্বিপাকের কথা, দ্বিতীয় দিন এনেছিলেনও তাঁর বালকপুত্র প্রবীরকে—যাকে কেন্দ্র ক'রে এ-ভুতুড়ে উৎপাতের সুরু হয়। আমাকে তিনি একটি চিঠিতেও উপদ্রবটির একটি সংক্ষিপ্ত

বিবৃতি দিয়েছেন। তাই থেকেই উদ্ধৃত করি—আমার নিবন্ধের বহর কমাতে। তিনি আগে অধ্যাপক ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে কি একটা ব্যবসা করেন বললেন। পত্রে ভুক্তভোগী লিখছেন (২০, ১০. ১৯৬১) :

"শ্রীদিলীপ কুমার রায়, পরম প্রীতিভাজনেষু

"আমার জীবনে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় আপনাকে জানাতে বলেছেন। সেই উপলক্ষ্যেই পুনরায় আপনাকে এ-পত্র দেওয়া।

"আগেই ব'লে রাখি, পুনর্জন্মবাদ বা ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস কম। এ নিয়ে এক সময়ে আচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে আমি অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু এবারকার বিষয়বস্তু পরোক্ষ অনুভূতির সাক্ষ্যপ্রসূত নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এজাহার।

"সংক্ষেপে : গত ১৯শে আগস্ট হঠাৎ আমার দোতলার ঘরে সকাল আটটায় ভীষণভাবে ঢিল ও ইঁট পড়তে থাকে, ফলে জানালার সমস্ত সার্সী ভেঙে যায়।...পুলিশে খবর দিলাম, কিন্তু তাদের সামনেই সমানে ঢিল পড়তে থাকে—এমন কি কয়েকটা ছিটকে তাদের গায়েও লাগে। তারা ব্যাপারটার তল না পেয়ে লালবাজারে সংবাদ দিয়ে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক আনায়। পুলিশ দুতিন জন পাড়ার ছেলেকে ধ'রে নিয়ে গেল, কিন্তু ঢিল-পড়া থামে না।... কিনারা করতে পারল না কেউই।

"সোমবার দুপুরে আমার বালক পুত্র শ্রীমান্ প্রবীরকে নিয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে আলো জ্বেলে পড়াচ্ছি এমন সময়ে বন্ধ ঘরেই ঢিল কয়লা কাঁচ ইত্যাদি পড়তে লাগলো। পুলিশ তখনো পাহারা দিয়ে চলেছে—মনে রাখবেন। তখন প্রথম সন্দেহ হ'ল যে, এ অন্য ব্যাপার—হয়তবা ভূতেরই উপদ্রব। গেলাম কয়েকজন তান্ত্রিকের কাছে। তারা এসে পুজোঅর্চা ঝাড়ফুঁক যত পারে ক'রে চলল তিন চারদিন ধ'রে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমার ঘরের মধ্যে যত বই কাগজপত্র ফাইল প্রভৃতি আছে সব অদৃশ্য হাতের টানে চারদিকে ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে। আমি হেঁকে বলি : আচ্ছা, আমার হাতে কিছু ফেলো, দেখি অম্‌নি শেল্‌ফ্‌ থেকে বই এসে পড়ে হাতে ; আচ্ছা, এবার পায়ে ফেলো তো—অম্‌নি বই এসে পড়ে পায়ে। বন্ধ আলমারি থেকে টাকার থলি উড়ে গিয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবির পিছনে। সব চেয়ে দারুণ ব্যাপার ঘটল—যখন প্রবীরের গায়ে অদৃশ্য হাতে

চড়-চাপড় চলতে লাগল। সে খুবই কাতর হ'য়ে পড়ল। সময়ে সময়ে ছুঁচ ফোটায়। অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারী কাঁদতে থাকে।...

"একমাস এইভাবে চলল। পণ্ডিচেরিতে শ্রীমাকে লিখে পাঠালাম। সেখান থেকে তাঁর আশীর্বাদের ফুল পাঠালেন স্বামী পূর্ণানন্দ। হাতে সেই ফুল বেঁধে দিলাম। কিন্তু বাঁধা ফুল খুলে খুলে পড়তে থাকে।...প্রিয়দাবাবু এসব আদৌ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি বলাতে অবিশ্বাস করতেও পারলেন না, তাই বললেন আপনাকে জানাতে—যদি ব্যাপারটার কোন সুরাহা হয়।"

এই সব নিছক ভৌতিক উপদ্রব—নিঃসন্দেহ। কোনো একটি বিদেহী আত্মার কাজ। সে অনেক কথা, ব'লে ফল নেই—আরো এই জন্যে যে, কেউই বিশ্বাস করবেন না সে-সমাধান। তবু যে এখানে এত কথা লিখলাম সে শুধু এই জন্যে যে, দূর-দর্শন, রকমারি অপ্রাকৃত অঘটন, বিদেহী আত্মার মূর্তি ধ'রে খবর দেওয়া—যা পরে হুবহু সত্য ব'লে প্রমাণ হয়েছে—এ-জাতীয় নানা অঘটনের সঙ্গেই সম্প্রতি আমার একাধিকবার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। সে-সব অলৌকিক আবির্ভাবের অন্ততঃ বারো আনা প্রকাশ করি নি। মাত্র বাকি চার আনা (বিশেষ ক'রে ভাগবতী করুণার অবতরণের তথ্য) আমার কয়েকটি লেখায় প্রকাশ করেছি শুধু এইজন্যে যে এসব ঘটনার এজাহারে একটি কথা প্রতিপন্ন হয়: যে, যোগবিভূতি, ঐশী কৃপা ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রবাক্যের অন্ততঃ সাড়ে পনেরো আনা অপ্রতিবাদ্য সত্য।

* * *

কাশীনরেশ লিখেছিলেন কলকাতা থেকে ফিরবার পথে কাশীতে তাঁর অতিথি হ'তে। মহারাজ নিজে মহা আচারনিষ্ঠ তথা ভক্ত। তার উপরে ভজন অত্যন্ত ভালোবাসেন। আমাকে লেখেন যে একদিন শিবালা মন্দিরে গীতাপাঠ করতে হবে, আর একদিন ভজন গান।

আমরা আটজন কলকাতা থেকে রওনা হই—৯ই নভেম্বর। উঠি তাঁর সুরম্য অতিথিশালায়। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, চার দিকে সুদূর বিস্তীর্ণ বাগান, দুটি রাজরথ সর্বদাই হাজির। পরমানন্দেই দিনগুলি কেটেছিল আমাদের। আমরা বলতে ইন্দিরা ও আমি ছাড়া আমার দুটি সিন্ধুদেশীয় শিষ্য ব্রিগেডিয়ার থাডানি ওরফে শ্রীকান্ত, মোহন সাহানি—আমাদের নানা বইয়ের প্রকাশক—এবং আমাদের কলকাতার অন্নদাতা ও অন্নদাত্রী মিলন সেন ও তজ্জায়া শ্রীমতী বাণী। মিলন ও বাণী

আমাদের বিশেষ অনুরাগী, কলকাতায় আমাদের হাজারো ঝক্কি যেভাবে বয় প্রতিবৎসর তাতে বিস্ময় জাগে বৈকি। বলতে ভুলেছি এ-সদাশয় স্নেহময় দম্পতীর সঙ্গে ছিল ওদের অষ্টবর্ষীয়া কন্যা রাকা ও পঞ্চবর্ষীয় পুত্র প্রেমল। রাকা বিশেষ গানভক্ত। প্রেমলও কম যায় না—পূজা করে মন্দিরে। মোটকথা, কাশীতে পরিবেশ ছিল বড় চমৎকার—সবাই মিলে মহানন্দে গঙ্গাস্নান তরণীবিহার নানা মূর্তির দোকানে ঘুরে শাদা পাথরের একটি চমৎকার শিবমূর্তি ও একটি কৃষ্ণমূর্তি সংগ্রহ করা—সব জড়িয়ে সময় কেটেছিল তর তর ক'রে।

১০ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কাশীনরেশ প্রায় ছশো নাগরিককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি প্রথমে সংস্কৃতে কৃষ্ণস্তব ক'রেই গীতায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে ইংরাজিতে বললাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। শেষ করলাম গানে। কীভাবে—বলি সংক্ষেপে।

আমি ইংরাজি অমিত্রাক্ষরে গীতার ত্রিশ-চল্লিশটি শ্লোকের অনুবাদ আবৃত্তি ক'রে ব্যাখ্যা করেছিলাম গীতাকার ভক্তিকে কী চোখে দেখেছেন। যা বলেছিলাম তার সারার্থ এই যে গীতার উক্তি অশ্রুসর্বস্ব বা আবেগসম্বল নয়। ভক্তিতে অশ্রু আবেগ উচ্ছ্বাসেরও স্থান আছে, কিন্তু ভক্তির উত্তমরহস্যের চাবিকাঠি শুধু পরম শরণাগতির হাতে- যার দীক্ষামন্ত্র: "সর্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ভগবানের শরণ নেওয়া।" ভক্তির সুরু স্বধর্মপালনে, সারা—স্বধর্মের বিসর্জনে, কারণ স্ব বলতে বোঝায়—আমি, আর শরণাগতির আরাধ্য হ'ল—তুমি: আমি ও আমার ছেড়ে তুমি ও তোঁমার বলতে বলতে আত্মবিলোপ। শেষে বললাম: "গীতার শরণাগতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিতে চাই ইন্দিরা দেবীর মীরা ভজন গেয়ে।" ব'লে গাইলাম হিন্দিতে:

> সুন রি সখী তোহে আজ কহুঁ ময়—কৈসে সাজন পায়ে।
> যোগী ঋষি জিস মুখকো তরসেঁ ময় অবলা রো রিঝায়ে।

পুরো হিন্দী গানটি "সুধাঞ্জলি"-তে আছে। বাংলা অনুবাদটি—আমার অনামীর ২৭৩ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। আমি টীকা করেছিলাম এই ব'লে: "এই গানটির বাণী—পূর্ণ শরণাগতির। সে-বাণীর প্রাণের কথা কী? না, ঠাকুর আকাশের ভগবান্ নন—আমাদের অন্তরঙ্গ। তাই যে-মুহূর্তে আমরা তাঁকে মানি আপন হ'তে আপন ব'লে—অশ্রুজলে তাঁকে আবেদন জানাই যে তাঁকে না পেলে আমার দিন কাটে না —সে-মুহূর্তে তিনি সাড়া না দিয়েই থাকতে পারেন না। তাই মীরা বলছেন: জ্ঞান-ধ্যান, মন্ত্র-তন্ত্র, যোগ-যাগ নয়— শুধু চোখের জলে তাঁকে ডাকা—'আমাকে রাঙা

পায়ে ঠাঁই দাও ঠাকুর' ব'লে তাঁর আশ্রয় চাওয়া। তাঁকে জানতে আমি চাই না—পারিও না—চাই শুধু তাঁর শরণ নিয়ে জন্ম সার্থক করতে :

"হরির লীলার কী বা জানি আমি? সে আকাশ, পাখী আমি যে।
পড়িতে চরণে দিলো ঠাঁই—গণি' আপন আমায় স্বামী সে।
শিশুস্বরে কেঁদে ডাকিলে অমনি আসে সে ত্বরিত চরণে।
শরণাগতির পথে শুধু সখী পেয়েছি সে-মনোমোহনে।"

আমার ভাষণটির প্রাণের কথাটি আমি গানের মধ্যে দিয়ে বেশি ফোটাতে পেরেছিলাম সেদিন রাতে। ভাষার বর মস্ত বর সন্দেহ কি? কিন্তু তার চেয়েও বড় বর—গান গাইতে পারা। কারণ গানের আছে সুরের পাখা, ভাষার আছে—শুধু কথার চরণ। তাই গান যে-নীলমণির নাগাল পায় সহজেই—ভাষা পায় হয়ত তার ক্ষণিক আভাষ—তার বেশি নয়। বড় জোর ছুঁতে পারে, কিন্তু ধরতে গেলেই দেখে—সব হাওয়া!

* * *

দ্বিতীয় দিন মস্ত শামিয়ানার নিচে জমায়েৎ হয়েছিলেন প্রায় দু'হাজার লোক। সামনে শিবমন্দির, কাছে কলকল্লোলিনী গঙ্গা, শ্রোতা শুধু কাশীর বহু পণ্ডিত অধ্যাপক গুণী-জ্ঞানী নয়—ভক্ত জিজ্ঞাসু সাধক সন্ন্যাসী। গান গাইতে গাইতে পুণ্য তীর্থের পরম পরিবেশে মন ভুলে গেল পার্থিবতার হাজারো পিছুটান। অনেকেই আর্দ্র হয়ে উঠলেন যখন সব শেষে গাইলাম ইন্দিরার বাঁধা মীরাভজন :

নিখিল রসের নিধান তুমিই, সাধি প্রেম তব সাথে,
সব বিকিকিনি তব সাথে, হার জিতও তব প্রসাদে,
তোমার কাছেই হাসি কাঁদি, চাই পায়ে ঠাঁই হে তোমারি,
আর কেহ নয়—তুমি শুধু পিতা মাতা সখা সহচারী।

গানের শেষে এক সঙ্গীত রসিক আমাকে চলতি প্রথায় বাহবা দিয়ে বললেন : "আপনার গান শুনেছিলাম পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীত সম্মেলনে।" কাশীনরেশ ছিলেন পাশেই দাঁড়িয়ে, টুকলেন (ইংরাজিতে): "কিন্তু সে ছিল কনফারেন্স। এ মন্দির। সে-গান ছিল ওস্তাদি গান, আজকের গান—মীরাভজন। দুয়ের তফাৎ আশমান জমিন।" শুনে চমকে গেলাম, পরে বলেছিলাম কাশীনরেশকে যে, ভজনগায়ক ওস্তাদিপন্থী শ্রোতার জন্যে গায় না, গায় এম্‌নিতর ভক্তের জন্যেই।"

পরদিন রামনগরে তাঁর রাজপ্রাসাদে গান হ'ল। কিন্তু সেদিন গান জমল না কিছুতেই। কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু গানে আমার ভক্তি নামল না। এক রাজসভাসদ পরে বলেছিলেন: "পরশু মন্দিরে আপনার গানে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল, সাধুজি! কিন্তু কাল রাজপ্রাসাদে কী হ'ল?"

আমি করুণ হেসে বলেছিলাম: "দি ওল্ড্ ওল্ড্ স্টোরি, স্যর! ভক্তি নামল না কিছুতেই। তাই ভজন গাইতে গিয়ে গাইলাম শুধু গান। ভালোই হ'ল—হয়ত একটু একটু ক'রে সম্প্রতি মনে অহঙ্কার জমছিল যে, আমি ভজন গাইতে পারি। দর্পহারী হেসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে শুধু তিনি পারালেই পারি, নৈলে নয়। উপনিষদে পড়েন নি কি—একখণ্ড তৃণকেও ঝড় সরাতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না যদি না বিধাতা বাদ সাধেন?" মনে মনে আরও একটু বললাম—স্বগতঃ অনুতাপে: "ভবিষ্যতে মনে রাখতে চেষ্টা করব যে, ভজন গান রাজপ্রাসাদে রাজপরিষদের মধ্যে জমে না, জমে শুধু ভক্তসংসদে।"

* * *

কাশীতে এবার ফের দেখা হ'ল বন্ধুবর শ্রীকালীপদ গুহ রায়ের সঙ্গে—যাঁকে আমি আমার "অঘটন আজো ঘটে" উৎসর্গ করেছি। তাতে লিখেছি:

"দিয়েছ শান্তি হে গুপ্ত যোগী, কত অশান্ত পান্থে
মুক্তির দিশা দেখায়ে তোমার জীবনের দৃষ্টান্তে ···
পেয়েছ প্রেমের শক্তি
পরকে আপন ক'রে নিয়ে কাছে টানতে।"

বড় বিচিত্র মানুষ কালীদা! বলতে কি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। তাই তো তাঁকে "গুপ্তযোগী" উপাধি দিয়েছি। তাঁর আচরণ দেখে আমার মনে পড়ে ভাগবতে বিষ্ণুর অদিতিকে চুপি চুপি বলা: "তোমার গর্ভে আমি বামন হয়ে জন্মাব বলিকে অপদস্থ করতে, কিন্তু একথা কদাচ প্রকাশ কোরো না ঘুণাক্ষরেও—'সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্'—দেবতার অভিপ্রায় গুহ্য রাখলে তবেই সিদ্ধি লাভ হয়।"

কালীদা একথায় বিশ্বাস করেন, তাই কাউকেই বলেন না নিজের কোনো কথা। কিন্তু আত্মগোপন করলে হবে কী—তাঁর ব্যক্তিরূপে যে পদে পদেই উচ্ছল হ'য়ে ওঠে এক চিত্তাকর্ষী দীপ্তি—কিংবা উপমা দেওয়া যেতে পারে: চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তিনিও তেমনি বহু লোককেই টেনে আপন ক'রে নেন।

এক সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন। তারপর বিবাহ ক'রে গৃহী হ'য়ে পরে যোগী হন। আজকাল গঙ্গাতীরে কাশীবাসী, কারণ তাঁর বৃদ্ধা মা চান কাশীতেই দেহরক্ষা করতে। মাতৃভক্ত পুত্র তাই চার বৎসর কাশী ছেড়ে কোথাও যান নি এ পর্যন্ত।

শুনতে পাই তাঁর জীবনে নাকি দুটি বিদেহী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু একথা তিনি নিজমুখে আমাকে বলেন নি, শুনেছি প্রথম বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায়ের, পরে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে। কে বলেছিল মনে করতে পারছি না—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীগোপীনাথের সঙ্গে কালীদার নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথালাপ চলে। অথ, অনুমান করছি এ-সংসদে নানা সাধন সম্বন্ধে গুহ্য কথাই হয় সচরাচর। এ-ও শুনেছি যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কালীদাকে বারণ ক'রে দিয়েছে কোনো গুহ্য কথাই আমার কাছে ফাঁস না করতে, কারণ আমি সবাইকে ব'লে ফেলবই ফেলব। এ-গুজব সত্য কি না জানি না, তবে সেটা জানি যেটা এই যে, কালীদা তাঁর নিজের সাধনা বা উপলব্ধি সম্বন্ধে কোনো কথাই আমাকে বলেন নি। এতে হয়ত ভালোই হয়েছে, কারণ কে জানে হয়ত আমি সত্যিই না ব'লে থাকতে পারতাম না। তবে আমার সান্ত্বনা এই যে স্বয়ং গীতার ঠাকুর আমার সাফাই গেয়েছেন : "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?" অর্থাৎ যার প্রকৃতি ব'লে ফেলা সে বোবা হ'য়ে থাকতে পারে না হাজার চাপ দিলেও। তাছাড়া আমি সত্যিই তো "চুপ্ চুপ্ কেউ না শুনে ফেলে যেন"-জাতীয় অনুশাসনে হাঁপিয়ে উঠি—করি কী বলো? মহৎ কিছু দেখলে উল্লসিত হ'তে এবং আশ্চর্য কিছু দেখলে বিস্মিত হ'তে আমি শুধু যে ভালোবাসি তাই নয়, পাঁচজনকে ডেকে এ-জাতীয় উল্লাস ও বিস্ময়ের ভাগীদার না করলেও যেন আমার আশ মিটতে চায় না। অবশ্য সর্ববিধ গুহ্যকথাই যে প্রকাশ করি এমন নয়। (বলতে কি, গত বারো বৎসর আমি অত্যাশ্চর্য অঘটন যা যা দেখেছি তার বারো আনাই প্রকাশ করি নি এই ভয়ে যে, প্রকাশ করলে লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেই বলবে) কিন্তু যে-সব কথা শুনলে মন উন্নত হয় —যথা, মহৎসাধক বা ভাগবতী করুণা সম্বন্ধে আমার নানা চোখে-দেখা ও প্রাণে-পাওয়া অঘটন—সে-সব তথ্য গোপন করব কী দুঃখে? তাই প্রাণের মায়া ছেড়ে বলি কালীদা সম্বন্ধে—যা প্রাণ চায়।

তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় গুরুদেবের দেহরক্ষার পরে ১৯৫২ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে। মাদ্রাজে তখন আমি ও ইন্দিরা ছিলাম উডল্যাণ্ডস হোটেলে—

গ্রামোফোনে কয়েকটি গান দিতে। হবি তো হ, সেখানে একদিন সকালে হঠাৎ "পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—অকস্মাৎ দেখা কালীদা-সনাথ হেরম্বর সঙ্গে! হেরম্ব আরো বহু যোগী মুনি তপস্বীকে চেনে। গুরুপদ ব্রহ্মচারীর কথাও শুনি প্রথম তার কাছেই। পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ, তিরুভান্নামালাইয়ের শ্রীরমণমহর্ষি, আনন্দাশ্রমের শ্রীরামদাস, আলমোরার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, পুরীর নঙ্গা বাবা, কাশীর শ্রীবীতরাগানন্দ—আরো সে-কত যোগীর আশ্রমেই যে তার যাওয়া-আসা!

নানা দিক দিয়েই এই স্নেহশীল, স্বভাবনম্র মানুষটিকে "বিচিত্র" অভিধা দেওয়া যায়। গৃহী হয়েও উদাসী, সংসারী হ'য়েও সৎসঙ্গবিলাসী, আলাপী হ'য়েও অপ্রগল্‌ভ! কারুর নিন্দা কখনো শুনি নি ওর মুখে। কালীদার সম্বন্ধে ও-ই প্রথম বলে আমাদের: "প্রেমিক মানুষ তিনি।" নিজে যে স্নেহশীল সে স্নেহশীলকে চিনবে না তো চিনবে কে? কিন্তু কালীদার কথাই বলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মান্দ্রাজে কালীদার সঙ্গে আমার দেখা হ'তেই তিনি হেরম্বকে বললেন—আরো দুদিন মান্দ্রাজে থাকাই চাই। হেরম্বর সঙ্গে উনি যাচ্ছিলেন তিরুভান্নামালাইয়ে রমণ মহর্ষির আশ্রমে। একটি পুরো কামরা রিজার্ভ করা হ'ল দুদিন পরে: আমরা এক ট্রেনেই মান্দ্রাজ যেতে দক্ষিণ দিকে পাড়ি দেব; কালীদা ভিল্লুপুরমে ট্রেন বদলে যাবেন সোজা রমণ আশ্রমে, আমরা ফিরব গুরুহীন গুরুগৃহে।

বলতে ভুলেছি, ইতিপূর্বে—১৯৫১ সালে—হেরম্ব আমাকে একটি পত্রে লিখেছিল কালীদাকে ইন্দিরার শ্রুতাঞ্জলি দেখাতেই তিনি প্রথম পাতায় তার ছবি দেখে বলেছিলেন: "প্রেম ও আলোয় গড়া—a being of light and love—কিন্তু বেশি দিন বাঁচবে না। বছর তিন-এর মধ্যে দারুণ ফাঁড়া আছে, কাটা শক্ত।" ১৯৫২ সালে কালীদার সঙ্গে দেখা হ'তে এ-প্রসঙ্গ তুলব ভেবেও তোলা হয় নি নানা কারণে। পরে ১৯৫৪ সালে ইন্দিরা যখন শয্যাশায়ী হ'য়ে নাভিশ্বাসের পরেও আশ্চর্যভাবে বেঁচে যায় ঠাকুরের প্রত্যক্ষ বরে তখন কালীদার কথা ফের মনে হয়েছিল ব'লেই তাঁর এ-ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করলাম।

কিন্তু না, আরো একটি অঘটন ঘটেছিল তাঁর মাধ্যমে। বলা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু গীতার সান্ত্বনা যখন আছে—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" তখন ব'লেই ফেলি, ক্ষতি কী?

আমার একটি গুরুভাই শ্রীন—আমাকে শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে বলেন এই গল্পটি কালীদা সম্পর্কে—পরে কালীদাও সায় দিয়েছিলেন গল্পটি আরো

খুটিয়ে ব'লে। ব্যাপারটা এই : শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের এক বৎসর আগে একদা ন—কালীদার সঙ্গে কলকাতায় হিমাদ্রি অফিসে কথায় কথায় বলে যে শ্রীমুন্সি প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ১৯৫২ সালে ঘটা ক'রেই শ্রীঅরবিন্দের আশীবৎসরের. জন্মোৎসব করবেন ঠিক হয়েছে। কালীদা বলেন : "বৃথা, শ্রীঅরবিন্দ ততদিন ইহলোকে থাকবেন না।" ন—তর্ক তুলতে কালীদা একটি কাগজে শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন তিরোধানের তারিখ লিখে কাগজটি মুড়ে তার হাতে দিয়ে বলেন : "রেখে দিন আপনার কাছে, এখন খুলবেন না, আপনার গুরুদেব গতায়ু হ'লে পর মিলিয়ে নেবেন।" ন—কাগজটি দুদিন কাছে রেখে গভীর অস্বস্তি বোধ ক'রে কালীদার কাছে গিয়ে ফিরিয়ে দেয়, বলে : "এ-কাগজ আপনার কাছেই থাকুক।" (কালীদা এবারে আমাকে কাশীতে বলেন : "ন—কে সাবাস দিতেই হবে যে অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও কথা রেখেছিল")। কালীদা তখন তাঁর অনুগত বন্ধু ৺অমলেন্দু দাশকে ডেকে কাগজটি তার জিম্মায় দেন। ১৯৫০ সালে ৫ই ডিসেম্বর-এ শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক তিরোধানের পরে অমলেন্দুবাবু কাগজটি খুলে দেখেন তারিখটি লেখা আছে—৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০।

এ-গল্পটি সেদিন প্রিয়দাবাবুর কাছে করতে পারতাম যখন তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সঙ্গে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলবার লোভ সামলেছিলাম অনেক কষ্টে—বৈজ্ঞানিক তো, অবৈজ্ঞানিক সত্যকে পেশ করতে ভয় করবে না ? তবে গল্পটি আজ ব'লেই ফেলি যখন প্রসঙ্গ উঠল।

ইন্দিরার এক প্রিয় মুসলমান সখী, বেলার বেগম, ও তার ভাই সুলতান জোর ক'রে ইন্দিরার হাতের ছাপ নিয়ে নাম ধাম না ব'লে নরওয়েতে সিকেলকো রীড নামে এক সন্ন্যাসীকে (মঙ্ক) পাঠায় ১৯৪৫ সালে। সুদূর তুষারের দেশে রীড সাহেব এ-ছাপ দেখে অভিভূত হ'য়ে ২৩শে মার্চ ১৯৪৫ সালে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন ইংরাজিতে। এপত্রের কপি আমি শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়েছিলাম কারণ এ-করকোষ্ঠীর সাড়ে পনের আনা মন্তব্য তথা ভবিষ্যদ্বাণী পরে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। তার মধ্যে শুধু দুটি কথাই বলব আজ। রীড সাহেব ইন্দিরা সম্বন্ধে কিছুই না জানা সত্ত্বেও নরওয়ে থেকে সুলতানকে লিখেছিলেন : "সত্য জিজ্ঞাসা, মনঃকষ্ট ও অধ্যাত্মশান্তির জন্যে তৃষ্ণা এঁর প্রবল হবে বিশেষ ক'রে কোনো একটি মানুষের প্রভাবে। ফলে ৩০ বৎসর বয়সে এঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। নিশ্বাসের কষ্ট হবে দেখতে পাচ্ছি—৩৪ বৎসর বয়সে রক্তক্ষরণে দারুণ মৃত্যুর ফাঁড়া।

যদি বাঁচেন তবে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে পারেন—তার পরে নয়। ইন্দিরার দারুণ হাঁপানির কথা রীড সাহেব জানতেন না—সে যে কোথায় থাকে কী বৃত্তান্ত কিছুই কেউ তাঁকে বলে নি।

৩৪ বৎসর পর্যন্ত করকোষ্ঠির রায় একেবারে হুবহু মিলে গেল: ১৯২০তে ইন্দিরার জন্ম; উনত্রিশ বৎসর বয়সে—১৯৪৯শে ও যোগের দিকে ঝোঁকে; ১৯৫০-এ দীক্ষা নেয়; শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পর দিন ৬ই ডিসেম্বর—বম্বে থেকে চ'লে আসে; একত্রিশে পা দেবার আগেই সংসারিণী হয় পূর্ণ যোগিনী; তারপর ঠিক ৩৪ বৎসর বয়সে ১৯৫৪ সালে আগস্টে পুনরায় রক্তবমন সুরু হ'ল—৬ই সেপ্টেম্বরে নাড়ী ছেড়ে গেল। বাঁচল যে ভাবে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ করুণায় সে এতই অবিশ্বাস্য যে আমি দু'চারজনকে ছাড়া বলি নি, কারণ জানি যে, লোকে বিশ্বাস করবে না কিছুতেই, ভাববে আমি ষোলো আনা বানিয়ে বলছি—যদিও এ-অঘটনের দশবারোজন সাক্ষী আছে, যাদের মধ্যে স্যর্ চুনিলাল মেতা অন্যতম। বুদ্ধিকে যখন মানুষ জ্ঞানের একমাত্র বিচারক ও দিশারি ব'লে বরণ করে তখন যা কিছু বুদ্ধির নাগালের বাইরে তাকেই সে বুদ্ধিপূজারী কাজীর বিচারে নস্যাৎ ক'রে দিতে চায় এক কথায়। কিন্তু করলে হবে কি, বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরলেই যে সে আশ্রয় দিতে পারে একথায় আজকের দিনে বুদ্ধিলোকের দিক্‌পালেরাও আর যেন তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না—বারবার ঘা খেয়ে ঠেকে শিখেছেন যে, সুসময়ে নীলাকাশের নিচে শান্তি সমুদ্রে বুদ্ধির নৌকাবিহারে যুক্তির হাল ধ'রে রকমারি বিলাসবন্দরে পৌঁছনো গেলেও জীবনের নানা ঝড়তুফানেই সে-হাল ধরতে না ধরতে নৌকা হয় বানচাল, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির নিপুণতম যুক্তিতর্কও হয় নাজেহাল।

বুদ্ধিকে আমিও আবাল্য প্রাণপণেই পূজা ক'রে এসেছি—জীবনের সব উদ্‌ভ্রান্তি, কুসংস্কার, মোহের প্রতিষেধক ব'লে মেনে নিয়ে। কিন্তু যতই দিন যায় ততই দেখতে পাই—বুদ্ধির লক্ষ্য নয় পরম জ্ঞান, তার কাজ হ'ল—প্রতিপদে আমাদেরকে সংসারের সঙ্গে রফা ক'রে মিলে মিশে চলতে শেখানো, এবং বিজ্ঞানলোকে নানান্ প্রাকৃতিক তথ্য ও আইনকানুনের খবর দিয়ে ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা, অসুখ বিসুখে বেদনা কমানো, নানা দৈব দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচানো আরো নানান দৈনন্দিন সুব্যবস্থা করা। যে-বুদ্ধিমানেরা বলেন বুদ্ধি আরো অনেক কিছু পারতে পারতে শেষমেশ সবজান্তার কোঠায় পৌঁছলো ব'লে—তাঁরা অভিমানের ফেরে প'ড়েই এত বড় ভুল সিদ্ধান্তকে ঠিক সিদ্ধান্ত ভেবে

হাবুডুবু খান অথই জলে—অন্তিমে নাস্তানাবুদ হ'য়ে কবুল করতে বাধ্য হন বিখ্যাত মনীষী লোয়েস ডিকিন্সনের সুরে সুর মিলিয়ে: Nothing that is important can be proved by reason : এ-সূত্রটির ভাষ্য এই যে, যেমন বুদ্ধি শুধু যে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম চাহিদার কোনো নির্দেশ দিতে পারে না তাই নয়, যে-আলো হৃদয়ে নামলে বাইরের কালোর চিহ্নও থাকে না তার কোনো দিশাই সে দিতে পারে না। বুদ্ধি পারে অনেক কিছু। পারে—মানুষের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করতে, পারে কোনো লক্ষ্য চিহ্নিত হ'লে তার পথের নির্দেশ দিতে। কিন্তু কোন্ লক্ষ্যসিদ্ধিতে অন্তরাত্মার পরমমুক্তি তার বিধান দিতে পারে শুধু আত্মার অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধির বহির্নেত্র নয়। বুদ্ধি পারে কোনো প্রতিপাদ্যের স্বপক্ষে যুক্তি জড়ো ক'রে তার ওকালতি করতে—কিন্তু নানা মুনির নানা যুক্তির মধ্যে কোন্‌টা অকাট্য—বুদ্ধি বুঝতে পারে না। তাই একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ যাকে চমৎকার মনে করেন, আর একজন সমান সত্যনিষ্ঠ তাকে মনে করতে পারেন সর্বনাশা!—এবং ক'রেও থাকেন নিত্য নিয়ত এই দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির জগতে। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন একটি পত্রে (১৯৩৬ সালে ১৩ই জানুয়ারি): "As a matter of fact, there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions ; there is only my reason, your reason, X's reason, Y's reason multiplied up to the discordant innumerable. Each reasons according to his view of things, his opinion, that is, his mental constitution and preference." (অর্থাৎ এজগতে বিশ্বজনীন বুদ্ধি বা যুক্তি ব'লে এমন কোনো নিয়ন্তা নেই যে নির্দেশ দিতে পারে হাজারো মতামতের হানাহানির মধ্যে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল। আছে শুধু আমার যুক্তি, তোমার যুক্তি, যদুর যুক্তি, মধুর যুক্তি,—এম্‌নি ক'রে তাল পাকাও এক অসংখ্য ঝনঝনার প্রচণ্ড বেসুর। খতিয়ে, প্রত্যেকেই যুক্তি জাহির করে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, পক্ষপাত বা মনের গড়ন অনুসারে।)

শুধু তাই নয়, জগতের ইতিহাস শান্তভাবে পর্যালোচনা করলে একটা সত্য ফুটে ওঠে দীপ্ত প্রভায় : যে, দেশে দেশে কালে কালে শ্রেষ্ঠ মানুষ বহু ঠেকে তবে এই অবিসংবাদিত উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, জীবনের সবচেয়ে বড় বর ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ বা দেহবিলাস নয়—কারণ এ-সুখ অতি ক্ষণায়ু, যার উল্টোপিঠে আছে

শুধু গভীর অবসাদ, বিষাদ, অতৃপ্তি। বস্তুবিচারী বুদ্ধি বা বিজ্ঞানী মনীষার কীর্তিকলাপ হাজার "অসাধ্য সাধন" করলেও—শূন্যপথে হাজার উড়ো শকট চালিয়ে নানা গ্রহে পৌঁছে আমাদের চমকে দিলেও—পারে না সেই অধ্যাত্ম প্রতিভার প্রতিস্পর্ধী হ'তে যে ভাগবতী করুণার আবাহনে পায় দয়ার আলো, মৈত্রীর মধু, প্রেমের অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি। এই প্রতিভাই সবচেয়ে বড় প্রতিভা, কেন না শুধু তারি দৃষ্টিতে শ্রুতিতে ফুটে ওঠে রূপের ওপারের অরূপের দিব্য জ্যোতি, সাধনার পথে প্রেমের পরম বাণী : "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ—শুধু ভক্তির আলোয় ভক্ত দেখতে পায় ভগবানের স্বরূপ ও বহুবিচিত্র রূপায়ণ।" আর এ-দৃষ্টি যাঁরা পেয়েছেন এ-বাণী যাঁরা শুনেছেন শুধু তাঁরাই সর্বজীবে শিবকে দেখে সেই প্রেমসুন্দরের সাধর্ম্য লাভ ক'রে হ'তে পারেন তাঁরি মতন "সর্বভূতহিতে রতাঃ"।

কালীদার কথা বলতে গিয়ে প্রেমের প্রসঙ্গ এসে গেল এ ঠিকই হয়েছে। কারণ তিনি যোগসাধনার পথে প্রেমের আলো হৃদয়ে পেয়েছেন ব'লেই সে-আলোয় দেখতে পেয়েছেন যে ভারতের আর্ষবাণী সনাতন সত্য, অর্থাৎ জীবনের পরমতম বরদাতা হ'ল প্রেম স্নেহ প্রীতি দরদ অনুকম্পা বর্গীয় হৃদয়বৃত্তি—সংশয় বিশ্লেষণ যুক্তিতর্ক বর্গীয় মস্তিষ্কবৃত্তির হাঁকডাক নয়। কেবল একটি কথা আছে। বুদ্ধির একটি মস্ত দান এই যে, সে যদি বিনম্র শ্রদ্ধায় যথার্থ আত্মিক প্রেমের আলোকে বরণ করতে শেখে তা'হলে সে আলোর বরে সে পরিষ্কার দেখতে পায় কতদূর অবধি মানস বুদ্ধিবিচারের দৌড়। অর্থাৎ দেখতে পায় তার দৃষ্টিপরিধির সীমা। তাই তখন সে বুদ্ধির চেয়ে বড় যিনি তাঁর কাছে মাথা নিচু ক'রে তাঁর হুকুমবরদার হ'তে অপমান বোধ করে না আর, বরং আরো উল্লসিতই হয়ে ওঠে এই আনন্দময় সত্যকে উপলব্ধি ক'রে যে, নিরভিমান না হ'লে কেউই পেতে পারে না সেই পরম জ্ঞান যার জননী ভক্তি। এই কথাই বলেছিলেন আমাকে জ্ঞানিশিরোমণি রমণ মহর্ষি : "ভক্তি জ্ঞানমাতা।" কালীদা রমণ মহর্ষিকে অগাধ শ্রদ্ধা করেন আরো এই জন্যেই যে এই ভক্তি বা প্রেমের আলোর খবর তিনি নিজেও পেয়েছেন তাঁর প্রাণের অন্তঃপুরে। তাই তো তিনি পরকে আপন করতে পারেন এত সহজে—যেকথা ডোরাস্বামী একবার আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন। তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে এসে গেল এও ভালোই হ'ল কারণ অনেকদিন থেকেই ভাবছি এই মহাত্মার সম্বন্ধেও স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে কিছু লিখতেই হবে।

সংসারে দুঃখ শোক তাপ ও ভয়ের কবলে কখনো পড়েনি এমন মানুষ নেই বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না—বিশেষ ক'রে ভয়। রমণ মহর্ষি একদিন আমাকে বলেছিলেন: আমাদের শাস্ত্রে আছে ছয়টি রিপু জয় করাই চাই—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। কিন্তু এদের জয় করার পরেও পরম মুক্তির পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে সপ্তম রিপু—ভয়।

ভয় কি আমাদের একটা? আশৈশব আমাদের ভয়ে ভয়েই কাটল—যেকোনো সিদ্ধির শিখরচারী হই না কেন, ভয় মাথার উপর খাঁড়ার মতন ঝোলে—কখন পড়ে কে জানে?—একে সাহেব পুরাণে বলে Damocles' sword; তাই মুনি ঋষিরা ভর্তৃহরির একটি প্রখ্যাত শ্লোককে বৈরাগ্যের মন্ত্রী ব'লে এত সাদরে বরণ করেন:

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্॥
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্।
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবভয়ম্॥

অর্থাৎ

ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বৈভবে ভয় অরিরাজের,
মানে—দৈন্যের, বলে—শত্রুর, রূপে ভয়—মোহিনীর ফাঁদের,
পণ্ডিত ভয় করে পণ্ডিতে, গুণী—খলে, দেহী যমকে ডরে,
সকলেই ভয়ে সারা ভবে, শুধু বৈরাগ্যই শঙ্কা হরে।

ডোরাস্বামী সেই আরো বিরল মহাজনদের দলে যাঁরা ভয় পেয়ে বৈরাগী হ'তে লজ্জা পান। দয়ালবাগের এক গুরু সাধু প্রায়ই বলতেন—যে ভয়কে জয় করতে পারে কেবল সে-ই যে পুরোপুরি অনাসক্ত হ'তে পেরেছে—কেবল সে-ই বলতে পারে গৌরব ক'রে:

রাজার আসনে বসাবি আমারে কি রে?
এমনি রাজ্যশাসন করিব তবে—
যেমন শাসন কেহ কভু করে নাই।
রাখিতে আমারে চাস কি ভাঙা কুটিরে?
করিব ভিক্ষা এমনি সগৌরবে
যেমন ভিক্ষা করে নাই কেহ, ভাই!

ডোরাস্বামীরও ছিল এই আদর্শ : ভয় পেয়ে ত্যাগ নয়, অনাসক্ত হ'য়ে ভোগ। তাঁকে দেখে মনে পড়ত ঈশোপনিষদের উপদেশ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—বাইরে ভোগী হও অন্তরে ত্যাগী হ'য়ে, পরের ধনে লোভ না ক'রে—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'। হয়ত এই জন্যেই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে আকৈশোর প্রাণের দিশারি ব'লে বরণ করেছিলেন স্বদেশী যুগ থেকে : এরি তো নাম মহাবীর, অভী, অনাসক্ত, সমদর্শী। এখানে তাঁর সঙ্গে বারীনদার কতক মিল ছিল। "ছাড়তে হয় ছাড়ব, ভুগতে হয় ভুগব—কেবল ভয় পাব না, পাব না, পাব না—এমন কি সর্বস্ব পণ করতেও"—এই-ই ছিল দুজনেরি জপমন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতে যাঁর চোখে আলো জ্বলে উঠত সেই উপেনদাও একদিন আমাকে বলেছিলেন এই ধরণের একটি কথা অভয় হওয়া সম্পর্কে, কেবল আরো একটু এগিয়ে গিয়ে : "দাদা, যে-আদর্শের জন্যে বারীন, ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীনদের দল শুরু করতে ছুটেছিলাম আমিও—কি না এককথায় প্রাণ দেওয়া—সে-আদর্শ বড়, না বলবে কে? কিন্তু তার চেয়েও বড় আদর্শ হ'ল—কোনো মহাসিদ্ধির জন্যে ম'রে বাঁচা নয়—বেঁচে থাকা—বাঁচার মতন বাঁচা—একান্তী হ'য়ে তপস্যা করতে পারা, হাজারো নিরাশায় হার না মেনে মরুর পর মরু পার হওয়া। আবেগের মাথায় ঝাঁ ক'রে প্রাণ দেওয়া কঠিন হ'লেও লক্ষ লক্ষ লোক করেছে একাজ। কিন্তু কোনো মহৎ আদর্শের জন্যে প্রবাসী হ'য়ে ধন মান প্রতিষ্ঠা কিছুই না চেয়ে ত্রিশবৎসর ধ'রে তপস্যা করতে হ'লে, শ্রীঅরবিন্দের মতন আধার চাই।"

উপেনদার এ-উক্তিটির মর্ম যেন আমি নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম ডোরাস্বামীকে দেখে। তাঁকে একদিন আমি বলেছিলাম যে, শ্রীঅরবিন্দের জন্যে তাঁকে ধনীর প্রাসাদ ছেড়ে অকিঞ্চন যোগী হ'তে দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ত ভাগবতে ত্রিভুবনাধিপ বলির একটি উক্তি :

> সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
> ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ॥

আমার "ভাগবতী কথা"-য় আমি এর ভাষ্য করেছি :

> হে ব্রহ্মর্ষি! যুদ্ধে প্রাণ করে বলিদান
> লক্ষ লক্ষ বীর। কয়জন দান করে
> সর্বস্ব অকুতোভয়ে?

ডোরাস্বামী এই বিরল দানবীরদের অন্যতম ছিলেন স্বভাবে, তাই তাঁর "সর্বস্ব" অকুতোভয়ে নিবেদন করতে পেরেছিলেন গুরুচরণে। হয়ত যোগী হ'তে তিনি চান নি, কিন্তু চেয়েছিলেন মনে প্রাণে বড় আদর্শের জন্যে ছোট সুখ ছোট ভোগ ছাড়তে। তাই তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল শ্রীঅরবিন্দের লোকোত্তর তপঃশক্তি। মেটারলিংক তাঁর বিখ্যাত Sagesse et Destinée গ্রন্থে লিখেছেন একটি গভীর কথা: যে, যখনই দেখবে কেউ এক কথায় সব ছেড়ে মহাবীরের (hero) পদবী পেল তখনই ধ'রে রাখতে পারো যে, সে বহু বৎসর ধ'রে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখেছে মহাবীর হবার, নৈলে সে কিছুতেই পারত না এক কথায়ই দুঃসাহসের আগুনে ঝাঁপ দিতে। ডোরাস্বামীর সম্বন্ধে একথা পূর্ণ প্রযোজ্য: সুদূর মান্দ্রাজে ব'সে শ্রীঅরবিন্দের চারিত্রবল, প্রতিভা, অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ সবই তাঁকে বহুদিন থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল দেশের জন্যে সর্বস্ব পণ করার আদর্শে। তাই আরো অনেক শ্রীঅরবিন্দ ভক্তের মতন তিনিও প্রথমে তাঁর বিপ্লবী আদর্শের ডাকেই সব ছাড়তে চেয়েছিলেন। পরে তাঁকে ভালোবাসলেন সর্বান্তঃকরণে। তখন কী হ'ল? না, শ্রীঅরবিন্দ যা চান আমিও তাই চাইব। মিলটন বলেছিলেন না—He for God only, she for God in him: ডোরাস্বামীর যোগদীক্ষার সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন তাঁকে: "দেশ স্বাধীন হবেই হবে, ভেবো না। আমি চাই তুমি দেশের চেয়ে আরো বড় আদর্শকে বরণ করো—সর্বস্ব পণ করো ভগবানের জন্যে।" ডোরাস্বামী আমাকে বলেছিলেন: "আমি শুনে সকুণ্ঠে বলেছিলাম: 'কিন্তু আমি কি পারব যোগী হ'তে?' শ্রীঅরবিন্দ বললেন: 'নিশ্চয় পারবে, নৈলে তোমাকে ডাকতাম না।' অমনি আমি বললাম: 'তথাস্তু, নেব দীক্ষা—আপনি যেপথে চালাবেন সেই পথেই চলব আমি।'"

এই যে এক কথায় গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে পারা—এর নামই তো যোগী, আর যোগী ছাড়া কে পারে বরণ করতে অভয় ও সর্বস্বদানের আদর্শ? যার স্বভাবে নেই পরিণামচিন্তা, স্বধর্মে যে অসাবধানী, তাকে বিচক্ষণরা নাম দেন মূঢ়। কিন্তু গতানুগতিক সঞ্চয়ী যারা তারাই তো খতিয়ে হারায় জমাতে যেয়ে, জেতে তারাই যারা বিশ্ব হারিয়ে পায় বিশ্বনাথকে। যোগিকবি এ-ই (জর্জ, রাসেল) বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা:

> What shall they have, the wise, who stay
> By the familiar ways···

Who shun the infinite desire
And never make the sacrifice
By which the soul is changed to fire ?

অর্থাৎ

কী পাবে তাহারা, সেই সাবধানা সুবিজ্ঞের দল
চলে যারা চেনা পথে—অনন্তের দুরাশা উচ্ছল
করে যারা পরিহার—করে নাই কভু ত্যাগ, হায়,
বরে যার অন্তরাত্মা রূপান্তর লভে বহ্নিভায় ?

ডোরাস্বামী কোনোদিনও ছিলেন না সেই সাবধানী সুবিজ্ঞের দলে—দরদস্তুর করা যাদের জপমালা। ভয় পেতেন না ছাড়তে, লজ্জা পেতেন শুধু ভীরু হ'তে। তাই সে-যুগেও তিনি নিয়মিত মান্দ্রাজ থেকে গুরুর আশ্রমে যেতেন যখন তখন, জেনে শুনে যে, পুলিশ শুধু যে পিছু নেবে তাই নয়, যে-কোনো মুহূর্তে ফেলতে পারে ফ্যাসাদে।

এ-সবই আমি শুনেছিলাম তেত্রিশ বৎসর আগে—যখন আমি পণ্ডিচেরি প্রয়াণ করি সংসার ছেড়ে। তাই তো আরো চাইতাম তাঁর পুণ্য সঙ্গ, আরো মুগ্ধ হ'তাম তাঁর নম্র সৌকুমার্যে, সঙ্গীতানুরাগে, নির্লোভ চরিত্রে ও সদাপ্রসন্ন আচরণে। পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমি দুটি মাত্র গুরুভাইকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলাম: বারীনদা ও ডোরাস্বামী। নিয়তির বিচিত্র বিধানে এই দুইজনই পরে পণ্ডিচেরি আশ্রমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। এজন্যে উভয়কেই গভীর দুঃখ পেতে হয়েছিল, নৈলে কি যে-গুরুর জন্যে কেউ সংসার ছেড়েছে সে চাইতে পারে তাঁর কাছ থেকেও দূরে যেতে—তাঁর কোনো বিধান মেনে নিতে না-পারার দরুণ? যাঁরা বারীনদা বা ডোরাস্বামীর নিন্দা করেন তাঁদের মনের ছাঁচ ছোট, কল্পনা নিস্তেজ—নৈলে তাঁরা বুঝতে পারতেন কত বেদনায় এই দুই সর্বত্যাগীকে বৃদ্ধবয়সেও ছাড়তে হয়েছিল সেই গুরুর আশ্রয় যাঁকে তাঁরা চিরদিন ভক্তি ক'রে এসেছেন দেবতার ম'ত। ডোরাস্বামী আজও শ্রীঅরবিন্দকে গভীর ভালোবাসেন, বারীনদাও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দকেই প্রণাম করেছেন গুরু ব'লে—খানিকটা হয়ত একলব্যের মতনই বলব। আমি জানি না এই দুই মহামতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বপ্নভঙ্গের পুরো ইতিহাস। তবে তাঁরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং আমি তাঁদের গভীর ভক্তি করতাম ব'লে সেই প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিকে এটুকু বুঝেছিলাম

যে, এঁরা উভয়েই উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন সত্যনিষ্ঠার খাতিরেই, কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশাভঙ্গের ফলে নয়, গুরুদ্রোহিতার ঝোঁকে তো নয়ই।

কেউ কেউ বলেন—ডোরাস্বামী পর পর দুটি কৃতী পুত্রের মৃত্যুশোকের দরুণই গুরুস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি জানি একথা কত অসত্য—শুধু ডোরাস্বামী স্বভাবে গুরুপূজারী ছিলেন ব'লেই নয়, তিনি এমনি একটি স্নিগ্ধ সরলতা নিয়ে জন্মেছিলেন যে তাঁকে দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ত বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক স্যাঁৎ ব্যভ-এর (Sainte Beauve) একটি বিখ্যাত উক্তি: "Il y a des natures qui naissent pures et qui ont reçu quand même le don de l'innocence." এর ভাষ্য এই যে, কোনো কোনো ধীমান্ শুধু যে অমল স্বভাব নিয়ে জন্মায় তাই নয়, সেই সঙ্গে পায় এমন সরলতার বর যা সেই অমলতাকে ধারণ করে; জীবনের জাঁতায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'লেও এ-হেন মহাজন মলিন হয় না, বলে না—"হার মেনেছি।" এ-হেন তীর্থযাত্রী ভুল করলে সোজা কবুল করে—"ভুল করেছি—" কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের সাফাই গাইতে রাজি হয় না।

পণ্ডিচেরিতে আমার ডোরাস্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯২৮ সালে আগস্ট মাসে। তখনো আমি (সংসারী না হ'লেও) ছিলাম খানিকটা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমই বলব: গান গেয়ে বেড়াই যত্র তত্র, দোটানায় হাঁপিয়ে উঠেছি, অথচ শ্যামের জন্যে কুলের নোঙর কাটবার সাহস পাচ্ছি না। তাই হয়ত ডোরাস্বামীর স্নিগ্ধ হাসি ও দ্বন্দ্বহীন বিশ্বাস দেখে সংসার ছাড়বার জন্যে আরো ব্যগ্র হয়ে উঠি—শুধু তাঁর মুখে শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা শুনেই নয়—খানিকটা তাঁর সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের ছোঁয়াচেও বটে। এত গুণে গুণী মানুষ যে-কোনো দেশেই মেলা ভার: উদার, সঙ্গীতকোবিদ, দানবীর, চরিত্রবান্, সর্ববিধ ঝোঁক ও বদভ্যাস থেকে মুক্ত, পরোপকারী, অনাড়ম্বর, অজাতশত্রু, জনপ্রিয়—সর্বোপরি সত্যনিষ্ঠ ও নির্লোভ। মাদ্রাজের একজন প্রধান উকিল হ'য়েও কোনোদিন মিথ্যা কেস নেন নি—এবং মক্কেল এলে আগে তাকে বলতেন সম্ভব হ'লে আপোষে নিষ্পত্তি করতে—জেনে যে এতে তাঁর আয় কমবে বৈ বাড়বে না। একথা পরে "হিন্দু" পত্রিকায় পড়ি—মাদ্রাজের চীফ জাস্টিসের বক্তৃতায়। ডোরাস্বামী যখন মাদ্রাজের জজ হবার মুখেই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে সর্বস্ব গুরুচরণে দান ক'রে ফকির হন তখন

সেখানকার জজেরা তথা উকিলেরা সবাই বার বার বলেছিল তাঁর এই আশ্চর্য নির্লোভতা ও সত্যৈকান্তব্রতের কথা।

অতঃপর যখন ১৯২৮ সালের শেষে আমি পণ্ডিচেরি রওনা হই শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ ক'রে, তখন মান্দ্রাজে "যাত্রাভঙ্গ" করি এই নবলব্ধ আতিথেয় বন্ধুর প্রাসাদে, পাম গ্রোভে। সত্যিই "প্রাসাদ" যাকে বলে—বিস্তীর্ণ উদ্যানের মাঝখানে শ্বেতস্তম্ভধৃত আলোহাওয়া-ভরা উদার রম্যনিলয়—মনে হ'ল গৃহস্থের স্বভাবের সঙ্গে গৃহের মিল আছে বটে। আমার কথা তখনো তাঁকে আমি নিজে কিছু বলি নি, তিনি লোকমুখে শুধু শুনেছিলেন যে আমি কূলের মায়া কাটিয়ে সদ্য ঝাঁপ দিয়েছি যোগজীবনের অকূলপাথারে।

তিনি তখনই স্থির করেছিলেন সব ছেড়ে এইভাবে অকূলবিহারী হবেন—ইংরাজিতে বলে burning one's boats—কিন্তু তখনো শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শতাধিক সাধকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার প্রধানতঃ তাঁকেই বহন করতে হ'ত। আমরা আরো শুনেছিলাম যে, গুরুদেবের নির্দেশেই তিনি ওকালতি করছেন—শুধু আশ্রমের কথা ভেবে। মাদ্রাজে তখন তাঁর বিপুল পসার—কম ক'রেও মাসিক দশবারো হাজার উপায় করেন—কিন্তু এ-কলির-দাতাকর্ণ প্রতিমাসে যত-কম-টাকায়-সম্ভব সংসার চালিয়ে বাকি সমস্ত আয়ই মাস মাস গুরুচরণে নিবেদন করতেন গুরুসেবার্থে। এ-প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে মহাত্মা উকিল শ্রীতারাকিশোর চৌধুরীর কথা—যিনি কাঠিয়াদাস বাবার কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে সন্তদাস বাবাজী নামে পরিচিত হবার পরও বৎসরাধিক কাল কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি ক'রে সত্তর হাজার টাকা উপার্জন করেন বৃন্দাবনে গুরুর নবনির্মিত আশ্রম ব্যপদেশে। কিন্তু এ ছাড়া সাধক জীবনের সঙ্গে ঐহিক বৃত্তির সমন্বয় সাধন ক'রে শুধু গুরুসেবার্থে অর্থোপার্জন ও শেষে যথাকালে তাও ছেড়ে সর্বস্ব গুরুচরণে নিবেদন ক'রে ফকির হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত আর দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

ফকির ব'লে ফকির! একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেই—না, "সামান্য" বলি কেন? পাদপ্রদীপের সামনে "হিরো" হ'তে পারে অনেকেই, অন্তত বীরত্বের ভঙ্গিতে নিজেকে তথা অপরকেও ঠকাতে পারে হয়ত; কিন্তু যে-সুদূর ছায়াভ নেপথ্যে বহুর সপ্রশংস দৃষ্টি বা করতালি পৌঁছয় না, সেখানেও যে-মানুষ একান্ত অজ্ঞাতবাসে তার আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে তার আদর্শবাদ সম্বন্ধে পুরোপুরিই নিঃসংশয় হওয়া যায় না কি? যাহোক ব্যাপারটা এই:

পণ্ডিচেরি আশ্রমের পাঠাগারে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকা আসত। অনেকেই কাড়াকাড়ি করত—ভিড়ের মধ্যে ভালো ক'রে কাগজ পড়া ভার। তাই আমি আমার এক গুরুভাই ভেঙ্কটরমনের কাছে প্রস্তাব করি যে ডোরাস্বামীকে ডাক দেওয়া যাক—আমরা প্রত্যেকে ফি মাসে দুটাকা ক'রে চাঁদা দিলে হিন্দু কিনে ক'ষে পড়তে পারব পর পর। তবে ভেঙ্কটরমন বলে হেসে: "ডোরাস্বামী মাস মাস দুটাকা ক'রে হাত খরচ পেতেন তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন যে—জানো না?" আমি শুনে চম্‌কে গেলাম—ঠিক হ'ল আমি মাসে চারটাকা দেব আর ভেঙ্কটরমন দুটাকা। এইভাবে ডোরাস্বামীকে আমরা হিন্দু পত্রিকা পাঠাতাম।

ভাবো একবার: এ শৌখীন নিঃস্ব হওয়া নয়—যাকে বলে নিযুতপতির নিষ্কিঞ্চন হওয়া—অক্ষরে অক্ষরে! এর পরে আমি গুরুদেবের কাছ থেকে মাস মাস ৪০৲ ক'রে পকেট খরচ নিতে বেশ একটু কুণ্ঠাবোধ করতাম। কিন্তু করি কি? আমার মাসিক চিঠিপত্র বইয়ের খরচই ছিল বিশ পঁচিশ, তাছাড়া আমি আশ্রমের কোকো খেতে পারতাম না, বাজার থেকে চা কিনে স্টোভে ফুটিয়ে খেতাম সদলবলে—বহু চেষ্টা ক'রেও মাসে চল্লিশ টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারতাম না—আর ডোরাস্বামী আশ্রমের একটি মাত্র ছোট ঘরে কাটাতেন হাসিমুখে—যেন রাজার হালে আছেন! একদিন তাঁর এক মোটরচালক পণ্ডিচেরি এসে তাঁকে এভাবে থাকতে দেখে চোখের জল সামলাতে পারে নি। এর পরেও বলবে কি যে, সিংহাসন ও পর্ণকুটিরে সম-আনন্দে বিরাজ করা সম্বন্ধে যে-কবিতাটি উদ্ধৃত করেছি সেটি অত্যুক্তি?

বলেছি—ডোরাস্বামী প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দকে নিছক রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবী বীর ব'লেই বরণ করেছিলেন। একাধিকবার তাঁর চোখ চিক চিক করে উঠতে দেখেছি যখনি তিনি গুরুদেবের স্নেহের, করুণার, স্নিগ্ধসম্ভাষণের উল্লেখ করতেন। কয়েক বৎসর আগেও যখন তিনি পুণায় আমাদের আতিথ্য স্বীকার ক'রে আমাদের ধন্য করেছিলেন তখনও তিনি আবার করেছিলেন তাঁর একটি প্রিয় স্মৃতিচারণী গল্প—কীভাবে গুরুদেব একটি চিঠি তাঁর মারফৎ পাঠিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে—লিখেছিলেন: "ডোরাস্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো আমাদেরই একজন ব'লে।" এ-গল্পটি ডোরাস্বামী কতবারই যে করেছেন—আর যখনই করতেন ভক্তিকৃতজ্ঞ আবেগে তাঁর স্বর গাঢ় হ'য়ে আসত, বলতেন: "দিলীপ! তোমাকে বলছি, কারণ তুমি জানো কী আশ্চর্য ভালোবাসতে পারতেন তিনি—যার

টানে মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিঃস্ব হ'য়েও মনে করত যেন বিশ্ব পেয়েছে। তুমি জানো—কারণ তুমিও ছিলে তাঁর অন্তরঙ্গ।"

১৯৪৬ সালে যখন স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ তাঁর বিখ্যাত সন্ধিপত্র নিয়ে দিল্লিতে গান্ধিজির কাছে দরবার করেন তখন শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে ক্রিপ্স্ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করলে মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি ক'মে যাবে, কেন না হিন্দুরাই বড় বড় ক্ষমতার পদ পেয়ে যাবেন, ফলে মুসলীম লীগের হর্তাকর্তা বিধাতা জিন্না সাহেব সেধে আসবেন হিন্দুদের সঙ্গে রফা ক'রে সহযোগ করতে। পরে অনেকেই স্বীকার করেছিলেন যে, হিন্দুনেতারা ক্রিপ্স্‌কে প্রত্যাখ্যান ক'রে অপদস্থ না করলে মুসলীম লীগের পায়াভারি হ'ত না—এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত। ডোরাস্বামীর মনে কিন্তু সে-সময়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল ইংরাজদের সততা সম্বন্ধে। তবু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ডেকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি গুরুর আজ্ঞায় গেলেন সোজা গান্ধিজির কাছে—এম্‌নিই ছিল তাঁর গুরুভক্তি—যার প্রভাবে তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘ'টে যায়। তাইতো তিনি মানুষ যা কিছু জীবনে বহুবাঞ্ছিত মনে করে সে-সবকে হাতে পেয়েও পায়ে ঠেলে এক কথায় চ'লে যেতে পেরেছিলেন পণ্ডিচেরির হাস্যহীন গম্ভীর যোগাশ্রমে গুরুদাস হ'য়ে গুরুসেবা করতে। কীর্তির দিক দিয়েও এ কি একটা সহজ কীর্তি?

তবে একটা কথা এখানে ব'লে রাখা ভালো: যে, ডোরাস্বামী স্বভাবে সামাজিক মানুষ বলতে আমি এ-ইঙ্গিত করতে চাইনি যে তিনি যোগের অধিকারী ছিলেন না। নিশ্চয়ই ছিলেন, নৈলে কি তিনি ভগবান্ শ্রীরমণ মহর্ষির প্রিয়পাত্র তথা পূজারী হ'তে পারতেন? তাঁর মুখে কতবারই শুনেছি মহর্ষির অপরূপ চরিত্রের নানামুখী মহিমার কথা। তিনি ডোরাস্বামীকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন—ডোরাস্বামী কতদিনই তো তাঁর সঙ্গে খেয়েছেন শুয়েছেন হাসি গল্পালাপে কাল কাটিয়েছেন—গীতায় অর্জুনের উক্তি মনে পড়ে: যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসন-ভোজনেষু···একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! ডোরাস্বামী মহর্ষির কাছে কাছে থাকতেন ছায়ার মতনই যখন মহর্ষির বাহুমূলে দুষ্টক্ষত—ক্যান্সার—হয়। কী অনটল সহ্যশক্তি মহর্ষির!—বলতেন ডোরাস্বামী সাশ্রুনেত্রে, অসহ্য ব্যথায়ও সমানই হাসিমুখে সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে গেছেন শেষ পর্যন্ত। বলতে কি, মহর্ষির দিকে আমার টান হয় প্রথম ডোরাস্বামীরই মুখে তাঁর মহিমার কথা শুনতে শুনতে বিশেষ ক'রে তাঁর অচলপ্রতিষ্ঠ জীবন্মুক্ত অবস্থার গুণগান-কীর্তনে। স্থানাভাব, তাই শুধু একটি

মাত্র উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব মহর্ষিকে ডোরাস্বামী কী গভীর ভালোবেসেছিলেন তার একটু আভাস দিতে।

"একদিন"—বললেন ডোরাস্বামী—"মহর্ষির বাহুতে ফের অস্ত্রোপচার করা হ'ল—ক্লোরাফর্ম না ক'রে। মহর্ষি অচল অটল—কিন্তু তাঁর বাহু থেকে অবিরল রক্তস্রাব দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল দিলীপ! আমি কেঁদে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরে শুনলাম মহর্ষি পরে আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন হেসে: 'ডোরাস্বামীকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে যে, আমি আমার দেহ নই!' অর্থাৎ আমি কষ্ট পাই অনর্থক—না বুঝে যে, দেহের দুঃখ মহর্ষির আত্মাকে স্পর্শও করতে পারে না।" তাঁর মুখে রমণ মহর্ষির কথা শুনতে শুনতে আমার প্রায়ই মনে হ'ত এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার একটু মিল আছে হয়ত। অর্থাৎ আমার যেমন দুটি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ, ডোরাস্বামীর তেম্‌নি দুটি গুরু—শ্রীঅরবিন্দ ও রমণ মহর্ষি। তাই তো যখন তাঁর জীবনে এসেছিল পুত্র-শোক—(আর একটি নয়, পর পর দুটি নয়নানন্দ যুবক পুত্রের অকালমৃত্যু)—তখন তিনি রমণ মহর্ষির শান্তিময় সান্নিধ্যে ফিরে পান আত্মকর্তৃত্ব।

কিন্তু এ-শোকের টাল সামলানোর কীর্তির চেয়ে আরো মহৎ কীর্তি তাঁর এই যে, যে-গুরুর জন্যে তিনি ফকির হয়েছিলেন সে-গুরুর আশ্রয় ছাড়তেও তাঁর বাধে নি যখন তাঁর মনে হয়েছিল যে না ছাড়লে তিনি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারবেন না। এ-শোকাবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস হয়ত তিনি একদিন বলবেন নিজেই। আমার নিজের মনে হয় বলা তাঁর উচিত, তাহ'লে লোকে জানবে যে এ-টাকা-আনা-পাইয়ের জগৎ শুধু ক্ষুদ্রমনা সুবিধাবাদীতে ভরা নয়—এখানে এমন মহাজন আজো দেখা যায় যাঁরা গভীর আশাভঙ্গের ক্ষোভেও বিশ্বাস হারিয়ে সিনিক হন না। শুধু তাই নয়, ডোরাস্বামীর চরিত্রের অপরূপ কোমলতার পিছনে গাঢাকা হ'য়ে থাকত একটি আশ্চর্য তেজস্বী পুরুষ যে ভুল করলে তাকে ভুল ব'লে সনাক্ত করতে কুণ্ঠিত তো হয়ই না বরং লোকনিন্দার ভয়ে মিথ্যার সঙ্গে রফা ক'রে মান বাঁচাতেই লজ্জা পায়। আমি নিজে এইজন্যেই তাঁকে বরাবর সব চেয়ে বেশি ভক্তি ক'রে এসেছি—এই অভী সত্যনিষ্ঠার জন্যে। সংসারে ভুল কে না করে? কায়াভ্রমে কোনদিনও ছায়াকে বরণ করে নি বা ঠকবার ভয়ে কাউকে কখনো বিশ্বাস করে নি এমন মানুষের উপাধি—অল্পজীবী, ক্ষুদ্রপ্রাণ; দিলদরিয়া যাঁরা তাঁরা শুধু যে ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সস্তা সান্ত্বনা পেতে চান না তাই নয়, সব ছাড়তে

পারেন এককথায়। যারা পরিণাম চিন্তা বরণ ক'রে পা গুনে গুনে পথ চলে, নিরন্তর হিসেব করে কত দিয়ে কত পেল, তারা দেশের দশের একজন হ'তে পারে, কেবল পারে না সেই ক্ষণজন্মাদের সংসদে ঠাঁই পেতে যেখানে কীর্তির চেয়ে দুরাশার দাম বেশি, প্রতিষ্ঠার চেয়ে ত্যাগের, সুখের চেয়ে অভিসারের। মহাকবি গেটে এই শ্রেণীর দুরাশীকেই পূজার্হ ব'লে বরণ করেছিলেন :

Sag es niemand, nur den Weisen,
Denn die Menge gleich verhoenet :
Das Lebend'ge will ich preisen
Das nach Flammentodt sich sehnet'

কোরো না প্রকাশ—যাহা আমার নিগূঢ় মর্মতলে
অনির্বাণ অমলিন জ্বলে :
কহিও জ্ঞানীরে শুধু—নহিলে এ-হেন বাণী সবে
বাতুল-প্রলাপ সম কবে
বোলো তারে—আমি অর্ঘ্য দিই সেই দুঃসাহসী প্রাণে—
ধায় যে অকূল-অভিযানে,
আদর্শের তরে দেয় আহুতি যে হোমাগ্নি-শিখায়
সর্বস্ব তাহার দুরাশায়।

মনে পড়ে—ত্রিবান্দ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী তপস্যানন্দের উচ্ছ্বাস ডোরাস্বামীর সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন আমাকে : "আপনারা বাঙালী দিলীপবাবু, আপনাদের মধ্যে গুরুর জন্যে সর্বত্যাগের দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু আমাদের—মানে, তামিলদের—মধ্যে অন্তত এ-যুগে কেউ ভাবতেই পারে না যে কোন সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ হঠাৎ এমন পাগলামি ক'রে বসতে পারে। কে না জানত যে ডোরাস্বামী অচিরে হাইকোর্টে জজ হবেন? যে-সময়ে উনি এ-সম্মান ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন সে সময়ে ওঁর 'রোরিং প্র্যাকটিস'। তাই তামিল বিচক্ষণদের মধ্যে সে-সময়ে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল ডোরাস্বামীর মতন স্বনামধন্য কৃতী পুরুষের এ-হেন অভাবনীয় ত্যাগে। অনেকেই বলেছেন আমাকে বিজ্ঞ হেসে : 'এ যে—এ যে মিডীভাল।' "

আমি তাঁকে বলেছিলাম : "স্বামীজি, কালিদাস বলেছিলেন 'পুরাণম্ ইত্যেব ন সাধু সর্বং'—যা কিছু সেকেলে তা-ই প্রণম্য নয়। কিন্তু ঠিক তেম্‌নি পাল্‌টে

বলা যায় 'আধুনিকম্ ইত্যেব ন সাধু সর্বং'—যা কিছু একেলে তা-ই আহা-মরি নয়। তবে ডোরাস্বামীকে একটু কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই আপনি যা বললেন তার সঙ্গে একটু জুড়ে দিতে চাই : যে, ডোরাস্বামী পাগলের মতন 'অভাবনীয় ত্যাগ' করবার আগেও বিচক্ষণদের দলে নাম লেখাতে চান নি। কারণ সর্বত্যাগ করবার আগেও তিনি কম পাগলামি করতেন না দিনের পর দিন : মক্কেলেরা নধর দক্ষিণা দিতে চাইলেও কোনো মিথ্যা কেস নিতেন না তাই নয়—প্রায়ই তাদের সদুপদেশ দিতেন সব আগে তাদেরই মঙ্গলের কথা ভেবে : যে, মকদ্দমা না ক'রে আপোষে রফা করাই শ্রেয়। শুনেছেন কখনো কোনো বিচক্ষণ বর্ধিষ্ণু উকিলকে এভাবে নিজের আয়ের দিকে দৃষ্টি না রেখে মক্কেলকেও শুভবুদ্ধির নির্দেশ দিতে? হিন্দুতে মান্দ্রাজের চীফ জাসটিসের ডোরাস্বামী-প্রশস্তিতে আমি ঐকথা পড়েছি, কাজেই এ বাজে গুজব নয়। শুধু তাই নয়—ডোরাস্বামী যখন হাইকোর্ট থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিচেরিতে চ'লে এলেন ফকির হ'য়ে তখন, এমন কি তাঁর প্রতিবেশীরাও বলেছিল বিষণ্ণ স্বরে : 'এমন সদাশয় বন্ধু আর পাব না।' জুনিয়র উকিলেরা চোখের জল ফেলেছিল 'এমন উদার হাসি আর দেখতে পাব না' ব'লে।"

এহেন মানুষ যখন উত্তরকালে গুরুর আশ্রমের সঙ্গে সব আদান প্রদানের সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন তখন তাঁকে কী দুঃখ পেতে হয়েছিল বাইরে কেউ জানতে পারে নি—কারণ তিনি কাউকে দোষ দেন নি—নীরবে চ'লে গিয়েছিলেন সোজা রমণ মহর্ষির কাছে। মহর্ষির শান্তিসান্নিধ্য তাঁর কাছে এসেছিল বিধাতার বর হ'য়েই বলব। কিন্তু বড় আধার ছোট পরীক্ষা পাশ ক'রে পার পায় না তো, তাই ডোরাস্বামীকেও পুত্রশোকের সঙ্গে সঙ্গে সইতে হ'ল আরো দুটি গভীর শোক : প্রথম ১৯৫০ সালে এপ্রিলে রমণ মহর্ষি দুষ্টক্ষতে রক্তক্ষরণে দেহরক্ষা করলেন, এবং তার পরেই ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ করলেন মহাপ্রয়াণ। ডোরাস্বামী মান্দ্রাজ থেকে ছুটে এসে শ্রীঅরবিন্দের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে না কি কেঁদে বলেছিলেন : "আমি না গিয়ে তিনি কেন গেলেন?" শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতে আজও তাঁর চোখে জল ভ'রে আসে। পুনাতে একবার তিনি ইন্দিরা ও আমাকে বলেছিলেন : "তোমরা কেন যখন তখন বলো—আমি গুরুচরণে এত দিয়েছি, তত দিয়েছি—যখন আমি যা দিয়েছি পেয়েছি তার চতুর্গুণ? আমি সাধ্যমত যা পারতাম দিতাম 'দাতা' নাম কিনতে তো নয়, দিতাম—শুধু দেওয়ার আনন্দে। এ-ধুলোবালির জীবনে এমন আনন্দ কি আর আছে, বলো তো দিলীপ? শুধু

অকুণ্ঠে বিলিয়ে যাওয়া। তোমার অন্ততঃ জানার কথা, ইন্দিরা, যে যারা দেওয়ার আনন্দের স্বাদ পায় নি তাদের মতন দুর্ভাগ্য আর নেই। খৃস্টদেব বলেছিলেন কি সাধে: 'It is more blessed to give than to receive?'" আমি উত্তরে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলেছিলাম: "আপনি আমাদের গৃহে অতিথি হয়েছেন এতে আমরা ধন্য হয়েছি—আমাদের কুটির পবিত্র হয়েছে।" অত্যুক্তি বলবে কি?

এহেন বরেণ্য মহাজন আজ শান্তি পেয়েছেন কালীদার স্নেহাশ্রয়ে। বৎসরে অন্তত চার পাঁচ মাস তিনি কালীদার আতিথ্যেই কাটান। কালীদা ওঁকে কোনো বিশেষ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন কি না জানি না (কারণ বলেছি কালীদা মন্ত্রগুপ্তিতে বিশ্বাস করেন) তবে এটুকু জানি যে, তিনি আজ কালীদার স্নেহাস্পদ, অন্তরঙ্গ। কাশীতে তাই এবার এই দুটি যথার্থ অসামান্য মানুষের সংস্পর্শে এসে আমাদের গভীর আনন্দে দিন কেটেছিল। রোজই সকালে কালীদার সঙ্গে নানা হাসি গল্পে আলোচনায় আমাদের সময় কেটে যেত তর তর ক'রে।

কাশীতে এবার একটি চমৎকার ইরানী অভিজাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল। তাঁর নাম সৈয়দ হুসেন নাসির। পারস্যের শিক্ষাসচিব—Education Minister. যেমন রমণীয় চেহারা তেম্‌নি কমনীয় আচরণ! কিন্তু শুধু কান্তি সম্ভ্রম আচরণের আভিজাত্যই নয়, মানুষটি সত্যিকার জিজ্ঞাসু তথা চিন্তাশীল। গীতা আটদশবার পড়েছেন—শ্রীঅরবিন্দের রচনার সঙ্গেও গভীর পরিচয় আছে। কাজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল বৈকি দেখতে দেখতে। জীবনে একটি সম্বন্ধ সহজেই বড় তৃপ্তিকর হ'য়ে ওঠে—যখন আমি যাকে ভক্তি করি তুমিও তাকে ভক্তি করো—common admiration, community of worship; তার উপর মুসলমান অভিজাত হ'য়ে গীতা ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবের ভাবুক, সোজা কথা নয় তো। নাসির বললেন রবীন্দ্রনাথ পারস্যে তাঁর পিতার অতিথি হয়েছিলেন, তাই আরো উজিয়ে উঠলাম। আমার ভজন ও গীতার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। বললেন: "গীতাকে আমি এযাবৎ কর্মযোগের শাস্ত্র ব'লেই জানতাম, তাই মুগ্ধ হয়েছি আরো জেনে যে গীতার মূল বাণী ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়···ইত্যাদি।

কালীদার কথা উল্লেখ করতে নাসির সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন ও দুজনে মিলে মনের সুখে কোরাণ ও সুফীদের ঈশ্বরবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। কালীদা সুফীধর্মে বেদান্তের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, কিন্তু এ-স্মৃতিচারণে সে-আলোচনার অনুলিপি দেওয়া সম্ভব নয়। এ-কথায় তবু

উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে কালীদার কোরাণ ও সুফীবাদ সম্বন্ধেও এত পড়াশুনা আছে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম আমরা সবাই। নাসির বললেন: "Remarkable man! I am glad you took me to him." কালীদার কাছে আরো অনেক জিজ্ঞাসু আসেন। একবার আমার সঙ্গে স্যর পল ডিউক গিয়েছিলেন—কালীদার সঙ্গে তন্ত্র আলোচনা করতে। এবারও তন্ত্র সম্বন্ধে কালীদা অনেক কথা ব'লে শেষে বললেন শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের কথা: "He is the last word on Tantra—এতবড় তন্ত্রজ্ঞ ভূভারতে দুটি নেই।"

কাশীতে এবার এইভাবে শুধু পুরানো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ ক'রে নয়, নতুন বন্ধুর দেখা পেয়ে মন আমার প্রহৃষ্ট হয়েছিল। তবে কাশীতে কবে আমি অহৃষ্ট হয়েছি? দশাশ্বমেধ ও কেদারঘাটে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার, সৎসঙ্গ, সদালোচনা, মিলন বাণীর সদাপ্রফুল্ল শ্রদ্ধা স্নেহ ও সহযোগ—সব জড়িয়ে এবারকার কাশীবাস আমারে কাছে বিশেষ ক'রেই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

১৩ই নভেম্বর রাকা ও প্রেমলকে নিয়ে মিলন ও বাণী কলকাতা ফিরে যেতে আমাদের আনন্দের চৌতাল হঠাৎ যেন ঢিমা তেতালায় পৌঁছয় আর কি! আমি ইন্দিরাকে বললাম: "উঁহুঃ, লক্ষণ ভালো নয়—মিইয়ে যাবে কিনা চতুষ্টয় অক্লান্ত যোগী?" তৎক্ষণাৎ ইন্দিরা চাঙ্গা হবার পথনির্দেশ করল: "রাজরথ পাঠিয়ে আরো যোগীদের আনা যাক্।" কথাবৎ কার্য: এলেন কালীদা ও ডোরাস্বামী।

সেদিন হয়ত শেষ সন্ধ্যা ব'লেই—কালীদা যাকে বলে rose to the occasion: সে যে কতরঙা কথারি ফুলঝুরি কেটে চললেন! অনেক কথাই টুকে রাখবার ম'ত——কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে আর নেই যৌবনের সে-উৎসাহ। কেবল কালীদার দুটি তিরস্কারের কথা উল্লেখ না করলেই নয়: প্রথম টুকলেন—আমি ইন্দিরা সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ ক'রে ভুল করেছি, যদি এসব গুহ্য কথা প্রকাশ করতেই হয় তবে অন্য ভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়, আমি নিজেকে চিনি না ব'লে এমন অনেক মানুষকে বড় ক'রে ধরি যারা তেমন কিছু নয়। ভর্ৎসনা ক'রেই স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: "কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমি সত্যি ভালোবাসি ব'লেই টুকি, এবং আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ব'লে যে ভাগবতীকৃপা যে আপনি পেয়েছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইন্দিরার আপনাকে গুরুবরণ করা। কিন্তু হয়েছে কি জানেন? যে-সব অলৌকিক অনুভবের এজাহারে ওর মহিমা আপনি প্রচার করছেন ভাবছেন সে-ধরণের অলৌকিক অঘটন ওর চেয়ে

অনেক ছোট আধারের মাধ্যমেও ঘটে। যথা, এইমাত্র যে বললেন আপনার বন্ধু ৺ল-র বিদেহী আত্মার ওর কাছে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে প্রমাণ করা যে সে সত্যিই ল—।" আমার ইচ্ছা হয়েছিল বলি: "আমি যা পারি তার চেয়ে বেশি পারি না তো, কালীদা!" কিন্তু বলি নি কারণ তর্কবিতর্ক করতে আজকাল আর একটুও ভালো লাগে না। তাই কালীদাকে সেদিন শুধু বলেছিলাম: "আমি ভুলভ্রান্তি করলে বলবেন বৈকি, কেবল একটি কথা: আমি আপনার তিরস্কারকে পুরস্কার গণ্য করার পরেও চলব নিজের পথেই, আর কারুর নির্দিষ্ট পথে নয়। কারণ বহু পোড় খেয়ে তবে পেয়েছি একটি পরম জ্ঞানদীক্ষা: যে, ঠাকুর গীতায় একটুও অত্যুক্তি করেন নি যখন তিনি অর্জুনকে পই পই ক'রে বলেছিলেন পরধর্ম শুধু যে ভয়াবহ তাই নয়, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ। তাই কেবল নিবেদন রইল যে আমার দ্বিবিধ (বা ত্রিবিধ বা চতুর্বিধ) অপরাধের জন্যে তিরস্কার করতে চান করুন সাধ মিটিয়ে, আমার নানা ভ্রান্তিবিলাসের নিরাকরণ ক'রে যদি আমার মনকে পরিষ্কার করতে চান তাতেও আমি আপত্তি করব না, কেবল আমাকে আপনার অন্তর থেকে বহিষ্কার করবেন না এইটুকু মনে রেখে যে, আপনাকে দরদী তথা ব্যথার ব্যথী মনে হয় ব'লেই বারবার আপনার সৎসঙ্গ কামনা করি—আপনার নানা তর্জন সত্বেও।"

কালীদার চোখ চিকিয়ে উঠল, তিনিও আমাকে আলিঙ্গন করলেন। মোহন টুক ক'রে ছবি নিয়ে নিল। ছবিটি মন্দ হয় নি—কী বলো? অন্ততঃ কালীদা কিরকম দিলখোলা প্রেমময় পুরুষ তার একটু আভাষও তো ফুটেছে।

কালীদার এই স্বভাব-স্নেহশীলতার পরে জোর দিয়ে তিন চার বৎসর আগে ডোরাস্বামী আমায় একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। তার এক জায়গায় ছিল: "আমি দেখেছি হিমাদ্রি আফিসে একদল আদর্শবাদী যুবক তাঁকে কী ভক্তি করে!—প্রায় দেবতার মতনই বলব। শুধু তাই নয়, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে তারা দিনের পর দিন কত যে ত্যাগ স্বীকার করে সে দেখবার ম'ত। হিমাদ্রি পত্রিকা চলছে শুধু এই জাতের কয়েকটি ত্যাগোদ্বুদ্ধ অনুরাগীরই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গুণে। দিলীপ, আমি এ-আটাত্তর বৎসরে দেখেছি ঠেকেছি ও ভুগেছি বিস্তর এবং শিখেছিও কম নয়—তাই তোমাকে একটা কথা বলতে পারি একটু জোর করেই: যে, এ-স্বার্থ-পূজারী যুগে বড়ই বিরল এ-জাতীয় কর্মী—যারা নায়কের নির্দেশে হাসিমুখে অক্লান্ত কর্ম ক'রে যায় পারিশ্রমিক বিনা। আর এ-শ্রেণীর কর্মী গ'ড়ে তুলতে পারেন কেবল সেই জাতের মহাজন যাঁরা মানুষকে ভক্তি করতে শিখিয়েই শক্তিমান্ ক'রে

তোলেন।" ডোরাস্বামী বাংলা জানলে তাঁকে বলতাম: "এইজন্যেই পিতৃদেব লিখেছিলেন সহাস্যে—তাঁর একটি হাসির গানে:

শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি,
(আর) ভক্তের জন্যে শক্তি জোগান মহত্তর ব্যক্তি।"

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ল মাদ্রাজে প্রথম দিন কালীদাকে দেখেই ইন্দিরা বলেছিল: "শক্তিমান্ পুরুষ।" ১৩ই রাত্রে কথায় কথায় ইন্দিরার এ-রায়টি উদ্ধৃত করতেই কালীদা হেসে বললেন: "সে কি? স্নেহবান্ নই?" আমি বললাম: "সে কি আর বেশি ক'রে বলার দরকার করে, কালীদা? না, আপনি নিজেই জানেন না সেকথা? কেবল আমার মনে একটা বোবা খেদকে বহুদিন ধ'রে চেপে রেখেছি—আজ বললামই বা। কথাটা এই যে ইন্দিরা বলে আপনি বিস্তর সাধনা করেছেন। কিন্তু আপনি কিছুই বলেন না দেখে মনে প'ড়ে যায় লাওৎসের একটি বিখ্যাত উক্তি:

অজ্ঞান এই ভবে যারা—তারাই তো হয় মুখর নিতি,
জ্ঞানীরা সব মৌনী—ধাতার এম্‌নি হায় বিচিত্র রীতি!

আমি হয়ত প্রথম দলে, আপনি শেষের।" কালীদা হাসিমুখে টুক ক'রে উত্তর দিলেন: "আর আমার বোবা খেদ এই যে, আপনি নিজেকে চেনেন নি ব'লেই আজো টের পান নি যে, যাঁদের আপনি 'গ্রেট' উপাধি দিয়েছেন তাঁদেরও কেউই আপনাকে বাঁধতে পারবেন না, আপনি নিজের পথ নিজেই কেটে চলবেন নিজের বিবেকের আলোয়।" (এই শেষ কথাটি বলেছিলেন তিনি মাদ্রাজে উডল্যাণ্ড হোটেলে এপ্রিল মাসে—শুনে আমি একটু রাগই করেছিলাম তাই মনে গেঁথে আছে। কেননা সে-সময়েও আমি চেয়েছিলাম মূলতঃ গুরুপদাঙ্কই অনুসরণ করতে পণ্ডিচেরিতে কায়েমী হ'য়ে। এ-কথাটার উল্লেখ করলাম আরো এইজন্যে যে, কালীদার আরো কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর মতন এটিও পরে ফলেছিল।)

আমি নাছোড়বন্দ, বললাম: "সে তো হ'ল—কিন্তু আপনি কলকাতায় একদিন বলেছিলেন আপনার সাধনার কথা কিছু বলবেন।" কালীদা ফের এড়িয়ে-যাওয়া হাসি হেসে বললেন: "কী বলব বলুন? একসময়ে করতাম সাধনা, কিন্তু এখন আর কিছুই করি না।" ভাবলাম ফের জেরা করি: "এরি নাম ভগবানে আত্ম-সমর্পণের সূচনা নয় তো?" কিন্তু করিনি—জানতাম ব'লে যে কালীদা একগাল হেসে পাড়বেনই পাড়বেন অন্য কথা।

যাহোক তার পরে কালীদা কত কথাই যে বললেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর অতিমানস—supramental—যোগ সম্বন্ধে! আমি শেষে বলতে বাধ্য হলাম: "থাক্, আর বলবেন না। আপনার ধারণা আপনারই থাকুক, আমার ধারণা আমার।"

আমার কথা সেদিন কালীদাকে সব খুলে বলা হয় নি, তবে তিনি খুব ভালো ক'রেই জানতেন শ্রীঅরবিন্দকে আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরে কী অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, কত পথের পাথেয় পেয়েছি তাঁর নানা চিন্তা তথা নির্দেশ থেকে, কত শক্তি পেয়েছি তাঁর দৃষ্টান্তে ও স্নেহাশীর্বাদে। একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, সব গুরুবাক্যকেই আমি সবসময়ে মেনে নিতে পেরেছি। এ-ও আমার কোনোদিনই মনে হয় নি যে, শিষ্য গুরুর মতামতে কখনো কদাচিৎ সায় দিতে না-পারার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে করজোড়ে গুরুর স্তাবকতা না করলে নরকে যাবেই যাবে। তবে আমার এ-ধরনের মতামত শুনে শিউরে উঠে আমার অনেক গুরুভাইই আমাকে উন্মার্গগামী মনে করার দরুণ বহু মনঃকষ্ট পেয়ে শেষে ১৯৪৩ সালে আর থাকতে না পেরে একরকম জোর ক'রেই গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করি ও খুলে বলতে বাধ্য হই যে, তাঁর সব মতামতেই আমি নির্বিচারে সায় দিতে অক্ষম—এজন্যে তিনি আমাকে বরখাস্ত করলে আমি প্রস্থান করব, কিন্তু আমার বিবেকবুদ্ধিকে ত্যাগ ক'রে তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারব না। এ-সম্পর্কে আরো অনেক কথা আমার Among the Great-এর তৃতীয় সংস্করণে বিশদ ক'রেই লিখেছি, তাই এখানে শুধু তাঁর আশ্বাসটুকুর অনুবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হব। তিনি বলেছিলেন (৩৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা):

"আমি যখন কিছু বলি বা লিখি তখন শুধু আমার মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করি—এমন কথা বলি না যে আমি যা-ই বলব আর সবাইকে মেনে নিতে হবেই হবে।… আমি কোনোদিনই হুকুমী হাকিম হ'তে চাই নি, বা জোর জুলুম করি নি যে সবাইকার মতই আমার মতের ছাঁচে ঢালাই করতে হবে, কি সবাইকেই আমার যোগ করতে হবে।" *

আমি স্বভাবে ঠিক মামুলি গুরুবাদী নই, কালীদা একথা জানতেন ব'লেই

---

* "I have never cared to be a dictator; neither do I insist that everybody's views must be moulded by mine, any more than I insist that everybody should follow me or my Yoga" (Among the Great. P. 335)

গুরুদেবের সঙ্গে আমার এ-শেষ আলাপের অনুলিপি আমি সেদিনই লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিই ও তিনি অনুমোদন করলে তবে আমার বইটির তৃতীয় সংস্করণের শেষে জুড়ে দিই—"authorised" ব'লে।

আমার সাম্‌নে শ্রীঅরবিন্দের নানা মত খণ্ডন করতে কুন্ঠিত হতেন না। সেদিন তিনি ঠিক কি কি বলেছিলেন আমি মনে করতে পারছি না, তবে উত্তরে আমি যা বলেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। আমি নম্র অথচ দৃঢ়ভাবেই বলেছিলাম: "শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার পুরো অধিকার আপনার আছে নিশ্চয়ই, কেবল আমার বিনীত অনুরোধ: আমি তাঁর কাছে চিরঋণী একথা মনে রেখে আমার সাম্‌নে তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে এ-ধরনের কথা বেশি বলবেন না।"

আমার এ-আতপ্ত প্রতিবাদের উত্তরে কালীদা সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে কয়েকটি ব্যাখ্যা করলেন এমন চমকপ্রদ ভাষায়—চমৎকার ক'রে গুছিয়ে—যে আমি কী প্রত্যুত্তর দেব সত্যিই ভেবে পেলাম না। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি ও ইন্দিরা উভয়েই খানিকটা যেন আবিষ্ট মতন হ'য়ে পড়লাম। ইন্দিরা পরে বলেছিল: "বলিনি—কালীদা শক্তিমান্ পুরুষ?" আমি বলেছিলাম: "বলেছিলে জানি। কেবল আরো একটা কথা অকুণ্ঠেই বলা যায় কালীদার সম্বন্ধে: যে, তিনি শুধু যে চিন্তায় বলিষ্ঠ তাই নয়—সব কিছুই দেখেন তাঁর বিশিষ্ট, নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য-তন্ত্রতার পরিচয় দিতে তাঁর একটি পত্র থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি। পুরো চিঠিটি অনামী-তে ছাপা হয়েছে। তিনি আমাকে লিখেছিলেন কলকাতা থেকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে (২০ জানুয়ারি, ১৯৫৬):

"প্রাণসুন্দরেষু,

বাইশে জানুয়ারি আপনার জন্মদিন, তাই এই দিনটি আপনার ও আমার বন্ধুদের কাছে এত প্রিয়।...

"প্রাণসুন্দর পুরুষ আপনি। আনন্দই আপনার বৃত্তি, আনন্দেই আপনার স্থিতি। আপনি আবাল্য নিজের চারপাশে এক সহজ আনন্দের পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। গানে, কাব্যে, গল্পে, আলাপে এই অভিনব আনন্দের রশ্মিই সর্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে। এমন আনন্দস্বরূপ আর কার? মহাপ্রেমিক আপনি। এই অনাবিল প্রেম আমাদের সকলের মনকেই স্পর্শ করে এবং আত্যন্তিকভাবে একটি গভীরতা হয়ত অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়। এদিক দিয়ে আপনার জীবন একটি জাতীয় সম্পদ।...

"সময়ে সময়ে আপনার জন্যে চিন্তিতও হই বৈকি। কিন্তু পরে যেই ভাবি—ইন্দিরা আপনার দেখাশুনা করার ভার নিয়েছে, সেই আর কোনো চিন্তা থাকে না।

ভগবানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এই মেয়েটি। অনেক সত্যিকারের ভালো মেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর ম'ত এমন দ্বিধাবিমুক্ত দ্বন্দ্ববিরহিত আলোকোজ্জ্বল মন আর একটিও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওর ভার ভগবান্ নিয়েছেন। আমি শুধু ওর শারীরিক সুস্থতা কামনা করি, আর ভগবান্ আপনাদের আপ্তকাম করুন এই প্রার্থনা করি। ইতি।

প্রীতিমুগ্ধ শ্রীকালীপদ গুহরায়।"

* * *

সেদিন রাত একটা অবধি কালীদা যখন নানা কথা ব'লে আমাকে উল্লসিত ক'রে তুললেন তখন আমি হেসে বলেছিলাম: "আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তিই করেছেন স্নেহবশে। তবে আমার সদানন্দ অবস্থা সম্বন্ধে আপনার চিঠিপত্রে থেকে থেকে যে ভুল মন্তব্য করে থাকেন তাতে আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় একটি অবিস্মরণীয়াকে। মহিলাটি মালাবারী খৃস্টান। স্বামী ত্রিবাঙ্কোরের এক বড় আরণ্যক রাজপুরুষ। পরে আমাকে চমৎকার মধু ও আশ্চর্য বল্কলের আসন উপহার দিয়েছিলেন। আমি সে সময়ে—বোধ হয় ১৯৪৫ সালে—ত্রিবান্দ্রমে রাজ-অতিথি, সর্বত্র গান গেয়ে চলেছি সমানে। একদা হঠাৎ রাজ-অতিথিশালায় এই মহিলাটিকে দেখলাম বৈঠকখানা ঘরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে তিনি আদৌ চিনতেন না, আমার গানও শোনেন নি। আমার গেরুয়া বেশের 'পরে চোখ পড়তেই তিনি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে উঠেই অকুণ্ঠে আমার কাছে এসে বললেন চমৎকার ইংরাজিতে: "স্বামীজি! আমার একটি সদ্যোজাত শিশুকে আশীর্বাদ করতে যদি একটিবার আমাদের বাংলোয় পদধূলি দেন তাহ'লে বড়ই বাধিত হব। কিন্তু ব'লে রাখি আমরা খৃস্টান—ক্যাথলিক—আপনার যদি শুচিবাই থাকে—" আমি বললাম হেসে: "ও বালাই আমার নেই। কেবল যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটি প্রশ্ন করতে চাই।" তিনি বললেন: "স্বচ্ছন্দে।" আমি বললাম: "আপনি খৃস্টান হ'য়ে আমার ম'ত হিন্দু স্বামীজির আশীর্বাদ চাইছেন কেন? আপনি কি হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন?" তিনি সোজাসুজি বললেন: "না। আমি আপনার কাছে এসেছি শুধু একটি কারণে: সেটি এই যে আমি এই প্রথম দেখলাম এমন একটি মানুষ যে শুধু আনন্দকেই জেনেছে, দুঃখকে না।" আমি হো হো ক'রে হেসে বললাম: "আপনি বলেন কি! আমি কত দুঃখ পেয়েছি যদি জানতেন—" তিনি বাধা দিয়ে বললেন: "আমাকে কেন

মিথ্যে মিথ্যে ধোকা দিচ্ছেন স্বামীজি? (Why do you humbug me, Swamiji ?) আপনার মুখে দুঃখশোকের একটি রেখাও পড়েনি এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে। এমন দুঃখশোকের চিহ্নলেশহীন মুখ আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি ব'লেই আপনার কাছে ধর্ণা দিতে এসেছি—যদি দয়া করে আমার শিশুটিকে একটু আশীর্বাদ করেন এসে।"

হাসিতে আমরা কেউই কম যাই না তো। তাই গল্পটি ব'লে ডোরাস্বামী, কালীদা, শ্রীকান্ত, মোহন ও ইন্দিরার সঙ্গে কোরাসে অট্টহাস্য ক'রে আমি রাজ-প্রাসাদ কাঁপিয়ে দিলাম। হাসি থামলে কালীদাকে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল (যদিও বলি নি) : "ন্যাবা রুগীই হলুদে দেখে, কালীদা! আনন্দময় পুরুষই আনন্দ দেখে চার ধারে।" বলিনি, কারণ মনে হ'ল কথাটা বৈষ্ণব বিনয়ের মতই শোনাবে—যার মামুলি অতিপ্রয়োগে ধার ক্ষ'য়ে গেছে। জীবনে ভুল করেছি বহুবারই, কেবল এই একটি জায়গায় ঠিক করেছি—এই মিথ্যে বৈষ্ণব বিনয়ের ভঙ্গি করার কপটাচারকে ছেড়ে সত্যনিষ্ঠ আন্তরিকতাকে বরণ ক'রে। তাই তো সেদিন কালীদাকে বলেছিলাম : "আপনার কাছে লুকোবো না কালীদা, আমার খুব আনন্দ হয়েছিল আপনার এক পত্র পেয়ে যাতে আপনি লিখেছিলেন যে আমার স্মৃতিচারণ প'ড়ে আপনি 'অভিভূত' হয়েছেন। কারণ আপনার মতন স্পষ্টবক্তা ক্রিটিককে যে আমি অভিভূত করতে পারব এ-ভরসা আমার সত্যিই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম এত বড় বই পড়বার আপনি হয়ত সময়ই পা'বেন না, বা পেলেও আমার নানা মন্তব্যের জন্যে ফের আমাকে তিরস্কার করা শুরু করবেন।"

কালীদা উত্তরে বলেছিলেন : "আপনি আজ যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে আপনার মনে লাগবার কথা নয় কে কী বলে না বলে। কেবল একটি কথা আপনাকে অকপটেই বলতে পারি : যে, আমি আপনাকে সমালোচনা করি 'ক্রিটিক' হ'তে নয়, শুধু এই জন্যে যে, আপনি অনেক সময়েই নিজেকে অযথা ছোট করেন তাদেরকে বড় ক'রে ধরতে যারা তেমন বড় নয়। এইটুকু বুঝে আমার এ-দুশ্চিকিৎস্য দুর্মুখতাকে ক্ষমা করবেন—এই অনুরোধ রইল।"

তবু তাঁর নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার দুঃখ হয়ত আমি মনে টাঙিয়ে রাখব ভেবে তিনি এবার আমার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়েছিলেন "পরে পড়বেন" ব'লে। সে-চিঠিটি ও তার উত্তরে আমার ছড়াটি উদ্ধৃত ক'রে কালীদা-ডোরাস্বামী-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি এবার।

কালীদার চিঠিটির ভূমিকা (context) হ'ল এই : আমি তাঁকে মাসখানেক আগে আমার Mira In Brindaban কাব্যনাট্যটি উপহার পাঠাই, তাতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম (ইংরাজিতে): "কালীদাকে—যিনি আমাকে ভুলে গেছেন।"

কালীদা এর উত্তরে লিখেছিলেন ছড়ায় :

কাশী ১০. ১১. ১৯৬১

ক্ষমাসুন্দরেষু

ভোলা কি সহজ কথা ? ভোলা কি গো যায় ?
দিবানিশি তব বাঁশি প্রাণে মুরছায় !
আমার মনের গভীর গোপনে নয়নে বহে যে ধারা
সব কিছু তার বুঝিতে পারি না, কল্পিতে হই হারা।
চলিতে চলিতে জীবনপথের কত না অচিন বাঁকে
কোন্ সে-শিল্পী পলকে পলকে নানা রঙে ছবি আঁকে !
সব কিছু তার থাকে না স্মরণে, হয়ত অনেক ভুলি,
আবার হয়ত আবেশের লাগি' স্মৃতির পাতাটি খুলি।
অকারণে তুমি বাসিয়াছো ভালো, ঢেলেছ প্রেমের ধারা.
আমি অভাজন চমকি' উঠেছি, নিমেষে হয়েছি হারা।
তুমি অপরূপ, তুমি অভিনব, তোমার গভীর প্রেম
কেমনে ভুলিব ? ভোলা কি সহজ ? সে যে নিকষিত হেম।

ইতি। প্রীতিধন্য

শ্রীকালীপদ গুহরায়

প্রত্যভিনন্দনে আমি লিখেছিলাম অযোধ্যা থেকে (১৫. ১১. ৬১)

কালীদা,

এ-ঘুমের দেশে জেগে থাকে হায় কয়জনা সাধনায় ?
সত্যের দিশা কয়জনা চায় নির্দিশা তমসায় ?
নিরানন্দের ব্যাপক অন্ধকারে কয়জনা পারে
জ্বালায়ে রাখিতে মহত্ত্ব-দীপ প্রত্যয় মণিহারে ?
কয়জনা পারে পরকে আপন ক'রে নিতে সহজিয়া
প্রাণ-আনন্দ-ছন্দে বেদনাকণ্টকে গোলাপিয়া ?

তামসিকতায় মগ্ন এ-দেশে তবু শুনি যুগে যুগে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-বাঁশরী—তাই বাজে বুকে বুকে
তাঁর ঘরছাড়া "আয় আয়" ডাক, শুনেছ যে তুমি তারি
মূর্ছনা তব অন্তরে—বুঝি তাই ওঠে ঝংকারি'
কথায় আলাপে হাসিতে তোমার সে-নিরবসান রেশ—
বিলায়ে চলেছ যে-মহাপ্রসাদ বিদেশে করি' স্বদেশ!
মাতৃদেবী তব চাহিয়াছিলেন শেষ নিশ্বাস তাঁর
ত্যজিতে গঙ্গাতীরে কাশীধামে—তাই বৎসর চার
তুমি বারাণসীবাসী হে জননীভক্ত সুসন্তান!
নিঃস্ব হ'য়েও পালিছ কত না দীন জনে! তব প্রাণ
সুন্দর ঔদার্যে তাহার নিয়ত আকর্ষণ
করি' আর্তেরে কত দেয় যোগনির্দেশে সান্ত্বন!
চণ্ডী গাহিল : যে পায় জগদ্ধাত্রীর আশ্রয়
সেই পারে দিতে আশ্রয়ে তার বিজয়ার বরাভয়।
যেখানেই থাকো স্নেহে তব ডাকো কত স্নেহার্থী জনে!
আমিও তাদের একজন—শুধু এইটুকু রেখো মনে।

ইতি। স্নেহমুগ্ধ দিলীপ

* * *

দীর্ঘায়মান স্মৃতিচারণের শেষে একটি পুণ্য স্মৃতির কথা লিখে সমাপ্তি টানি এবার। লিখব শ্রীরামচন্দ্রের সরযূমেখলা অযোধ্যা নগরীতে কী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম ও কী ভাবে রামায়ণের মহিমা নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম।

একথার মানে নয় যে, পুণ্যশ্লোক মহাকবি বাল্মীকির কাব্যরসধারা বাল্যকালেই আমার হৃদয়কে উর্বর করে নি। শৈশবেই আমি রামায়ণ পড়তাম নানা অনুবাদে—গদ্যে পদ্যে। এদের মধ্যে কৃত্তিবাসের সহজ স্নিগ্ধ ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করত। কিন্তু আমার আরো ভালো লাগত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের বাল্মীকি রামায়ণের মূলানুগ পদ্যানুবাদ। এ-দুই কবির চিত্রায়ণে আমি সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম হনুমানের ছবিতে। রামের কাছে হনুমান প্রার্থনা করেছিলেন—পিতৃদেব প্রায়ই এ-শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করতেন :

স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু সর্বদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা নিত্যং ভাবমন্যং ন গচ্ছতু॥
যাবদ্রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে স্বাস্যন্তি মম প্রাণাঃ ন সংশয়ঃ॥

রাজকৃষ্ণ রায় অনুবাদ ক'রেছিলেন—যা প'ড়ে আমার চোখে জল আসত:

তব প্রতি প্রীতি ভক্তি যেন নাহি টুটে।
আমার মনের ভাব তোমা বই, প্রভু,
অন্য ঠাঁই ভুলিয়াও নাহি যায় কভু।
ধরাতলে রামকথা থাকিবে যাবৎ,
আমিও জীবিত যেন থাকি গো তাবৎ।

এ ছাড়া রাজকৃষ্ণ রায়ের সরযূ নদীর নানা বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মনে কতবারই যে সাধ জেগেছে এ-পুণ্যতোয়ায় স্নান করতে। গঙ্গা কাবেরী যমুনা ব্রহ্মপুত্রে স্নান ক'রে পবিত্র বোধ করেছি বহুবারই, বিশেষ ক'রে গঙ্গাস্নানে। কিন্তু এবার—বোধহয় লগ্ন এসেছিল ব'লেই—সরযূ দেবী মন টানলেন। ফৈজাবাদ অযোধ্যা থেকে ছয় মাইল, সেখানে আমাদের স্নেহাস্পদ সুধী মল্লিক (জজ্ সাহেব) এবং স্ত্রী প্রতিমা নিমন্ত্রণ করল। সুধী আমাদের প্রিয় বন্ধু এলাহাবাদের প্রাক্তন জজাধিপতি শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের কৃতী পুত্র। যেমন নম্র, সুকুমার, তেমনি সঙ্গীতপ্রিয়। বিশেষ ক'রে আমার ভজন ওরা দুজনেই অত্যন্ত ভালোবাসে। তার উপর বন্ধু বিধুভূষণ (আমরা দাদা পাতিয়েছি) বললেন: "দাদা, আপনি ও ইন্দিরা যদি ফৈজাবাদে যান তবে আমিও গিয়ে হাজির হব।" অথ ১৪ই সকালের ট্রেনে রওনা হলাম কাশী থেকে।

সুধী ও প্রতিমা আমাদের ষোড়শোপচারে খাওয়ালো, দাদার পৌরোহিত্যে গানও খুব জমল, বিশেষ তুলসীদাসের ভজন:

সখা সহিত সরযূতীর বৈঠে রঘুবংশবীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস চরণমে লপটাই,
সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।

ইন্দিরা, শ্রীকান্ত, মোহন ও আমি ১৫ই সকালে সাত আট মাইল মোটরে ঘুরলাম অযোধ্যায়। তারপর বিশাল, নয়নাভিরাম সরযূ নদীতে স্নান করলাম পরমানন্দে। দেহমন জুড়িয়ে গেল। এখানে আমি মনে প্রাণে বাঙালী। হিমালয়

কৈলাস মানসসরোবর অমরনাথের তুষার-স্নেহাশীষ আমার মাথায় থাকুন, আমি অস্থিমজ্জায় নদীবিলাসী জীব। আমাকে দাও ব্রহ্মপুত্র, দাও যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ, সর্বোপরি দাও মা গঙ্গা। আমার অন্তরের প্রার্থনা—যেন গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ হয়। গঙ্গা দেখলে আজো আমার মন প্রাণ উজিয়ে উঠে। সরযূ অবশ্য গঙ্গার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তবু নদী তো। থুড়ি, ভুল বলেছি: শুধু নদী বলেই নয়। জর্মনিতে সুন্দরী রাইনে স্নান করেছি—যার অজস্র গুণগান করেছেন জর্মন কবি হাইনে। কিন্তু সে-জলে দেহ স্নিগ্ধ হ'লেও মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয় নি—যেমন হ'ল সরযূতে। প্রণাম করলাম শ্রীরামচন্দ্রকে—যাঁর চরণস্পর্শে সরযূ আজো পুণ্যতোয়া, পাপহারিণী।

স্নানান্তে অযোধ্যার বিখ্যাত হনুমান-মন্দিরে প্রয়াণ করা গেল। উঃ সে কী কাণ্ড!

হনুমানের ভক্তির কথা ভাবতে আমার হৃদয় আর্দ্র হয় ব'লে ভাবি যে আমার আশা আছে। শুধু গঙ্গা যমুনা সরযূ, কৃষ্ণা, কাবেরীতে ভক্তি নয় হনুমানকেও যে ভক্তি করতে পারে সে হিন্দুই বটে মনে প্রাণে। জানি অবশ্য এ-ধরণের কনফেশন-এর বিপদ কত—শুনে বিজ্ঞ ইদানীন্তনেরা ব্যঙ্গ হেসে বলবেনই বলবেন: "মিডীভাল তথা কম্যুনাল! হিন্দু! উনবিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞান-ধুরন্ধর হ'তে না চেয়ে সেকেলে ধার্মিক হ'তে চাওয়া? এই কম্যুনাল পাপেই হিন্দু ডুবতে বসেছে।" বলুন। আমি বিশ্বাস করি—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—তাই ডুবি ডুবব হিন্দু হ'য়েই—যদি গঙ্গায় ডুবি তা হ'লে তো সাতচিতে গোলোকধাম! বিদ্রূপীরা আমার হাতে মাথা কাটবেন কী করে?—আমি তো ততক্ষণ পৌঁছে গেছি গঙ্গাযাত্রার পুণ্যে ঠাকুরের রাঙা চরণে—যেখানে ঠাঁই পেয়ে হনুমান হলেন অমর। কিন্তু যা বলছিলাম: বাল্মীকির হনুমান-চরিত্রের কথা।

সত্যি, কী আশ্চর্য সৃষ্টি মহাকবির! পরমহংসদেবের কথামৃতে আছে: "একজন হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ কী তিথি? তাতে হনুমান বলেছিল: আমি তিথি বার নক্ষত্র জানি না। আমি শুধু রামচিন্তা করি।"

হনুমানের এই একনিষ্ঠ অহৈতুকী ভক্তির বর্ণনায় আমার বালহৃদয় সে যে কী অপূর্ব আবেগে দুলে উঠত কেমন করে বোঝাব? পড়তে পড়তে একবারও তো কই মনে হ'ত না হনুমান শাখামৃগ! এমনই ছিল বাল্মীকির বর্ণনাকৌশল যে, পড়তে পড়তে সত্যিই মনে হ'ত—যেন অমর হনুমানকে সামনে দেখছি, আর

আমি প্রার্থনা করছি: "তোমার মতন ভক্তি আমার হোক, হে মহাবীর রামভক্ত!" হনুমানের চরিত্র কেন সে-সময়ে আমার মনে এত গভীর ছাপ দিয়েছিল এখন নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না—কারণ পঞ্চাশ বৎসর আগে আমার মনোভাব ঠিক কী ছিল এখন পরিষ্কার মনে নেই—কয়েকটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আবেগের ছাপ ছাড়া আর সবই হ'য়ে গেছে ঝাপসা। তাই কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে শুধু এইটুকু জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমার আবাল্য ভক্তি-অভীপ্সাকে হনুমানের অপরূপ জীবন্ত চরিত্র উস্কে দিয়েছিল।

পরে বিলেত গিয়ে আমার মন অনেকখানি বদ্‌লে গিয়েছিল। ফলে বাল্মীকির হনুমান্-চরিত্রের কথা বড় একটা মনেই হ'ত না। কিন্তু বহুবর্ষ পরে পণ্ডিচেরিতে মূল সংস্কৃতে বাল্মীকির রামায়ণ পড়তে না পড়তেই মন ফের দুলে উঠেছিল বিশেষ ক'রে চারটি চরিত্রের মহিমায়: সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও হনুমান। হনুমানের কাছে আর সে-শিশুসরল প্রার্থনা জানাই নি বটে, কিন্তু যখনই আমার যুবমনে নানা তার্কিক যুক্তির মেঘ এসে আমার বিশ্বাসকে টলিয়ে দিত, মনে পড়ত বিশেষ ক'রে হনুমান ও প্রহ্লাদের দাসভাবে সাধনার কথা—যে-সাধনায় তর্ক, যুক্তি ও সংশয়ের স্থান নেই, আছে শুধু সরল বিশ্বাসের ও দৃঢ় একনিষ্ঠতার আলো।

তবু আজো পুরোপুরি হদিশ পাই না—আমাদের শাস্ত্রে এত মহাভক্তের ছায়াপথ মাদৃশ ভক্তিকামীর নয়নমনকে উদাসী করা সত্ত্বেও বিশেষ ক'রে হনুমান কেন আমার চিত্তকে এত আবিষ্ট ক'রে এসেছে! গঙ্গাস্নানের মহিমা বুঝি—সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা এ-দুয়ের রাজযোটক তো সোজা কথা নয়। তা ছাড়া আশৈশব চোখে দেখেছি মা গঙ্গার অমলা কান্তি, কানে শুনেছি তাঁর মধুর কল্লোল, অঙ্গে পেয়েছি তাঁর স্নেহাশীষের কোমল স্পর্শ। কিন্তু হনুমানের তো কই বাংলাদেশে তেমন নামডাক নেই?

"মহাবীর" হলেন পশ্চিমীদের আরাধ্য, যেমন গণেশ মারাঠীর, কার্তিক দাক্ষিণাত্যের, শিব কালী কৃষ্ণ বাঙালীর। তবে? হনুমান কেন আমার মতন আধুনিক বাঙালীর মনকে আজো এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে? তিনি একা লঙ্কাকাণ্ড করেছিলেন ব'লে? সে তো ঠাট্টার কথা। আমি বলতে চাইছি একটি গম্ভীর কথা—প্রায় গুরুগম্ভীরের কাছাকাছি। তবু ব'লেই ফেলি দুর্গা ব'লে। আমার বুদ্ধিবাদী ক্রিটিকরা তো আমাকে হিরোওয়ার্শিপর, উচ্ছ্বাসী, সেকেলে, উদ্ভট, গুরুবাদী আরো কত কি উপাধি দিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিহাসি ক'রে থাকেন—

আমার হনুভক্তিতে তাঁদের চোখে আর কতই বা ছোট হব—মরার বাড়া তো গাল নেই? এ-যুগেও যে-মূঢ় কৃষ্ণের নরলীলার নামে উজিয়ে ওঠে, বৈজ্ঞানিক ঐহিকতার চেয়ে পারমার্থিক বিশ্বাসকেই বড় ক'রে দেখে, খেয়াল-ঠুংরির চেয়ে ভজন কীর্তনকে ভালোবাসে, গণমনের চেয়ে আর্য প্রজ্ঞাকে শ্রদ্ধা করে—সে হনুমানকে দেবতা ব'লে প্রণাম করবার পাগলামি করবে না তো করবে কে?

কিন্তু সত্যিই কি এ-মনোবৃত্তি এতই হেয়—পাগলামি? পৌরাণিকী কাহিনী ছেড়ে দিলেও জীবজন্তুর কাছে কিছুই কি আমাদের শিখবার নেই? ইন্দিরার একটি গল্প মনে পড়ে। তার জবানিতেই বলি:

"আমার মার ছিল একটি প্রিয় কুকুর। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁকে শোভাযাত্রা ক'রে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতায় দিলাম তাঁর দেহ। কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমরা ফিরে এলাম—সে ফিরল না। আমরা তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কয়েকদিন বাদে দেখি সে মা-র চিতার কাছে ম'রে প'ড়ে রয়েছে।" পশুর ভালোবাসা ব'লে কি এ-প্রভুভক্তিকে অবজ্ঞেয় বলবে, না বলবে—সব মানুষই এমন ভালোবাসতে পারে?

আমার মনে হয় বাল্মীকি যখন তাঁর প্রাতিভ দৃষ্টিতে হনুমান-চরিত্র দেখেছিলেন তখন কোনো আশ্চর্য দৈবপ্রেরণা তাঁর হৃদয় আলো ক'রে এসেছিল ব'লেই শাখামৃগদের তিনি মানুষের চেয়ে ছোট ক'রে দেখেন নি। নৈলে রামায়ণে তিনি আরো তো অনেক ভক্তের ছবি এঁকেছেন—শবরী, গুহক, জটায়ু, বিভীষণ ইত্যাদি—তাদের কেউই কেন হনুমানের মতন চিরস্মরণীয় হয়ে পেল না দেবতার পদবী? এই কথাটি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রেই আমি এবার চমকে উঠেছিলাম অযোধ্যায়।

শাস্ত্রে বলে: "প্রত্যক্ষ: কেন বাধ্যতে?" অর্থাৎ seeing is believing: সত্যি, কী ব্যাপারই দেখলাম স্বচক্ষে: সে কি সোজা ভিড়? শুধু তাই নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তারা অনেকেই। বলতে কি, জজসাহেবের আরদালি ও গুর্খা পুলিশ সাহায্য না করলে হয়ত ভিড়ের চাপে আমাদের চেপ্টে যেতে হ'ত। কী উৎসাহ যাত্রীদের মনে! "জয় জয় মহাবীর—জয় রাম!" বলতে বলতে আবালবৃদ্ধবনিতার সে কী আনন্দ-উচ্ছ্বাস! কী? না হনুমান-মন্দিরে হনুমানদেবকে প্রণাম ক'রে তারা সবাই ধন্য হবে! অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে পাহাড়ে উঠে

আমরা হনুমানের বিগ্রহ দর্শন করলাম—পুলিশ ও আরদালির সাহায্য নিয়ে তবে। কিন্তু ঐ কাতারে কাতারে চলমান জনসংঘে রুগ্ন, কুব্জ, পঙ্গু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ভিক্ষুক, অবলা, ছিন্নকন্থা যাত্রী, কৌপীনবন্ত ভাগ্যবন্ত—সবাই মিলে পিঁপড়ের সার বেয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে পাহাড়ে উঠতে দেখি নি কি? তাদের মুখে সে কী আনন্দ—যে, হনুমান-দেবের চরণে ফল ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে আসবে! এ-অঘটনকে ঘটতে দেখি নি কি আমরা সেদিন এ-বিংশ শতাব্দীতেও?

চোখে আমার জল এল। এই-ই ভারত—পুণ্যভূমি! এ-দৃশ্য আর কোথাও দেখা যেত না। য়ুরোপে এ-ধরনের ভিড় হ'তে পারে কেবল সিনেমা-তারকাদের বিলাসিনী রূপ দেখতে, কিম্বা কোনো নামজাদা রাজনৈতিকের বক্তৃতা শুনতে। আমাদের দেশে জনতা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে যায় কোথায়? না দুর্গম তীর্থপথে, কুম্ভমেলায়, হিমালয়ের সাধু ও দেবদর্শনে, অর্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নানে। কৃষ্ণপ্রেমকে এ-দৃশ্যের কথা লিখতে সে আমাকে লিখেছিল (২২-১১-৬১):

"Your description of the joy on the faces of the pilgrims in Ayodhya reminds me of the utter satisfaction I noticed in the faces of the pilgrims setting out for home after the darshan of Badrinath as if everyone's heart, big or little, was full."

আর একটি চিঠিতে ও লিখেছিল: "After all, India is India!"

এই ভক্তির ঐতিহ্য! এই অযৌক্তিক বিশ্বাস! দেবতার নামে শুধু উজিয়ে ওঠা নয়—দুর্গম পথে দুরভিসার, দুঃখ বিপদ—এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণও তুচ্ছ ক'রে ভক্তিকে সম্বল ক'রে শক্তি আহরণ করবার দৃশ্য—অঘটন নয় তো কী? সত্যি বলছি, চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না যে রামায়ণের যাদুতে এক লাঙ্গুলী জীবকে লক্ষ লক্ষ লোক দেবতার বেদীতে বসিয়ে পূজা করতে পারে, ভক্তিবিহ্বল আবেগে দুরন্ত জনতার চাপ উপেক্ষা ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে শুধু এ-হেন উদ্ভট দেবতাকে দর্শন ক'রে ধন্য হ'তে!

হনুমান আমাদের দেশে বহু ভাবুক তথা জ্ঞানী ভক্তের চিত্তেও যে পূজ্য দেবতার আসন পেতেছেন বাল্মীকির আশ্চর্য কাব্যকলার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোথা থেকে পেয়েছিলেন তিনি অমানুষকে দেবতা ক'রে নরলীলায় অবিস্মরণীয় করবার এ-অদ্ভুত প্রেরণা?

এ-প্রশ্নের উত্তর শুধু এই যে, বাল্মীকি তাঁর প্রাতিভ ঋষিদৃষ্টিতে দেখেছিলেন

যে, হনুমানের মধ্যে দিয়েই অসম্ভব হবে সম্ভব, তাই আঁকতে হবে তাঁর কাব্যের অঘটনঘটনপটীয়সী তুলিতে এমন একটি অভাবনীয় চরিত্র যার প্রতি স্পন্দনে ঝরছে যুগপৎ শৌর্য ও শক্তি। এ-হেন চরিত্র তার অদ্ভুত বিস্ময়রসের মহামহিমায়ই ভুলিয়ে দেবে আমাদের যে, সে শাখামৃগ। সর্বাঙ্গসুন্দর দেবতাকে আরাধ্য করা হয়েছে তো অগুন্তি, বাল্মীকি বললেন এবার পশুকে দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে মানুষকে করবেন ভক্তিবিহ্বল। পশুর খুঁৎ (limitation)—বুদ্ধি-বিচার চিন্তাশক্তির অভাব—এই সবই হনুমানের চরিত্রে হ'য়ে দাঁড়াক পরম সম্পদ। তাই তো হনুমান পারলেন অবলীলাক্রমে যা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য : নির্বিচারে প্রশ্নহীন ভক্তিতে অসংশয় আনন্দে রামের চরণে আত্মসমর্পণ করা।

হিন্দুধর্মের একটি মহান্ মহিমা এইখানে যে, ভক্তিসাধনায় সাধক নানা পথের পথিক হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বিপথে পথ কেটেছেন। তাইতো এত রকম পূজা উপচার, উপাসনা, মন্ত্র, শোধন, কবচাদির ব্যবস্থা, এত রকম দেবতার এতরকম রূপ কল্পনা—যে-রূপ যার ভালো লাগে তার জন্যে সেই রূপধ্যানের ব্যবস্থা, যে-পথে চলতে যার প্রাণ চায় তাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। ভারতের সাধক ভগবৎ-সাধনায় কোনো পরীক্ষা (experiment) করতেই ভয় পান নি এবং যে-পরীক্ষাতেই তপস্যার প্রসাদে ফল পেয়েছেন তাকে মঞ্জুর করতে ইতস্ততঃ করেন নি—যে-উৎপ্রেক্ষা, উপমা, মূর্তি বা রূপকের সাহায্যেই ভক্তির দিকে টান বেড়ে ওঠে তাকেই কাজে লাগিয়েছেন অকুণ্ঠ স্তবে, স্তোত্রে, প্রতীকে, আখ্যায়িকায় অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে। উপেয় (end) তাঁদের একটি—ভক্তি, কিন্তু উপায় বহু। যাতেই মনে শ্রদ্ধা অনুরাগ উপচিত হয়, প্রাণ গলে, হৃদয় প্রেমের প্রণামী দিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, তাকেই বরণ ক'রে এসেছেন—কখনো ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ারে, কখনো বা চমকপ্রদ বিদ্যুদ্দামে। মন আমাদের সহজেই ঝিমিয়ে পড়ে, তাই তাকে ক্রমাগতই ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চেয়েছেন তাঁরা। অসম্ভব কাহিনী? হ'লই বা—যদি সে ভক্তি সঞ্চার করে তাহ'লেই সে মঞ্জুর। হ্রদে কুমীর চেপে ধরল হাতীর পা। অমনি পশু হাতীর চেতনায় জেগে উঠল ভক্তি—শরণাগতির প্রার্থনা :

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ॥

যাহার পরম মঙ্গলময় রূপদর্শন সাধ জপিয়া
নিখিল প্রাণীরে আপনার সম গণি' মুনি ঋষি গহন বনে

রাজে একা শুধু দুশ্চর তপসাধনার তরে অশাঙ্কয়া—
সে-তোমার, ওগো অগতির গতি, প্রার্থি চরণ চির শরণে।

এই বৈরূপ্যের (contrast) কলাকারু ভারতীয় কবিদের কাছে অতি আদরণীয় হ'য়ে এসেছে এই জন্যেই যে, তাঁরা কালোর পটভূমিকায় সাদাকে সহজেই উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারতেন তাঁদের প্রতিভাবলে। তাই মহাদৈত্য বৃত্রও হ'ল অন্তরে বৈরাগী, মহাসুর বলি বামনের ছোঁওয়া পেতে না পেতে হ'য়ে দাঁড়াল ভক্ত, শিশু ধ্রুবের অভিমান তাকে করল কঠোর তপস্বী, বালক কুশলবের হাতে রামের অনীকিনীর হ'ল পরাজয়···ইত্যাদি। এদের মধ্যে একটি অদ্ভুত সৃষ্টি হনুমান—যিনি আমাদের পুরাকাহিনীতে 'মহাবীর' নামে প্রখ্যাত—আজও হিন্দুস্থানীদের মুখে তাঁর এই 'মহাবীর' উপাধিই উচ্চারিত হয় নামের বদলে।

ভক্ত হনুমানের ভক্তিচিত্রণে তার বীর্যকে এত বড় ক'রে দেখানো হ'ল কেন—এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে। উত্তর সহজ: ভক্তকে আমরা প্রায়ই দুর্বল ও উচ্ছ্বাসী ভেবে অবজ্ঞা করি—প্রায়ই বলি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে: "ভক্তি? ও মেয়েদেরই মানায়—পুরুষ চাইবে জ্ঞান বল কীর্তি।" বাল্মীকি তাই দেখাতে চেয়েছিলেন—শক্তিমানের শক্তিও কী ভাবে মহাকীর্তি অর্জন করে যখন সে অহৈতুকী ভক্তির আনন্দে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে। যে-বলীয়ান্ শক্তিমদভরে দেবদ্রোহী হ'তে পারত সে ভক্তির অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পায়—যেমন দৈত্যবালক প্রহ্লাদ দেখতে পেয়েছিলেন—যে, শক্তির বৈকুণ্ঠে পৌঁছয় কেবল সেই মহাজন যে তার ভক্তির মহাবলেই তার শক্তির অহঙ্কারকে নুইয়ে নিয়োগ করতে শিখেছে ইষ্টের সেবায়। আত্মাদর অভিমান জাঁকজমকের নির্দেশপথে আপাতঃ-মনোহর ভোগের পথ যার খোলা সে কী স্বভাবে মহাবীর না হ'লে কাম ছেড়ে ভক্তিকে বরণ করতে পারে—প্রতাপের রাজত্ব ছেড়ে প্রেমের দাসত্বকে চাইতে? তাই তো হনুমানকে মহাবীর ব'লে পূজা ক'রে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ সাধক তাঁর অপরাজেয় বিক্রমের অকল্পনীয় কাহিনী থেকে শৌর্য প্রেম ও ভক্তির প্রেরণা পেয়ে এসেছেন।

* * *

পরদিন ছিল অযোধ্যায় একটি বিশেষ পর্ব-মহোৎসব। শুনলাম এই তিথিতে না কি শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় ক'রে ফিরে এসে দুর্গাপূজা ক'রে অযোধ্যা পরিক্রমা করেছিলেন—আট ক্রোশের পরিধি। সেই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের নানা গ্রাম ও

শহর থেকে এসেছিল অগুন্তি তীর্থযাত্রী। কুম্ভ মেলায় ছাড়া এত তীর্থযাত্রীকে কোনো একটি শহরে জমায়েৎ হ'তে দেখিনি আমরা। বিশ লক্ষেরও বেশি শুনলাম। ভোর রাত থেকে কানে ভেসে আসছিল তাদের জয়ধ্বনি : "জয় রাম সীতারাম... জয় মহাবীর..."

সকালে প্রাতরাশের পরেই উৎসুক চিত্তে বেরিয়ে পড়লাম এই অভাবনীয় উৎসব দেখতে।

সত্যিই অভাবনীয়! না দেখলে কল্পনাও করতে পারতাম না। ইন্দিরা, শ্রীকান্ত ও মোহনকে নিয়ে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম চক্রাকারে চলমান বিপুল জনসংঘের কিনারায়। জনসংঘ না ব'লে অশ্রান্ত জনস্রোত বলাই ভালো। কুম্ভমেলায় প্রয়াগে দেখেছিলাম লক্ষ লক্ষ নরনারীর জয়ধ্বনি-মুখর স্নানযাত্রা। এখানে দেখলাম তাদের আনন্দ-উদ্বেল শোভাযাত্রা। অযোধ্যার ঐ দারুণ শীতে প্রাগুষা লগ্ন থেকে পদযাত্রায় চলেছে এ-বিশাল জনসংঘ—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যুবক-যুবতী বালক-বালিকা—এমন কি সদ্যোজাত শিশু মায়ের কোলে, কিম্বা দুতিন বৎসরের শিশু পিতার কাঁধে। এই ভাবে তারা সারাদিন অযোধ্যা পরিক্রমা করবে অন্ততঃ দশঘণ্টা ধ'রে, মাঝে মাঝে হয়ত একটু জিরিয়ে নেবে, বা সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ফের সুরু করবে পরিক্রমা "জয় রাম, সীতারাম, জয় মহাবীর" বলতে বলতে! মুখে তাদের সে কী আনন্দের আলো—পরিক্রমার ফলে মহাবীরের প্রসাদ পাবে রামসীতার প্রতি ভক্তিতে বহুদিনের পুঞ্জিত পাপ দূর হবে! এই পুণ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রাণ জেগে উঠেছিল ব'লেই আমি সেদিন সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম উজিয়ে উঠে তুলসীদাসের বিখ্যাত রামভজন :

তু দয়াল, দীন হুঁ, তু দাতা ময় ভিখারী।
ময় প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী।

এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে সুর ক'রে, শোনে কথকের মুখে, গায় একযোগে রামধুন : "রঘুপতি রাঘব রাজারাম—পতিতপাবন সীতারাম।" আমাদের শিক্ষিত সমাজে এসব গান কেউ কেউ কখনো কদাচিৎ গান হয়ত—ড্রইংরুমে বা সভাসমিতির সুরুতে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে। কিন্তু তাঁদের মুখে রাম নাম আর এই বহুদূরাগত দীনদরিদ্র ভক্তিকামী সরল-বিশ্বাসীদের মুখে রাম নামের জয়ধ্বনি—তফাৎ আশমান-জমীন। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে

দেখতে লাগলাম এই বিপুল জনসংঘের উদ্বেলতা রামনামের ভক্তিতুফানে। তাদের মুখে যে কী অপরূপ বিশ্বাসের দীপ্তি, চোখে সে কী আনন্দ, চলনে সে কী পুলক শিহরণ! দেখতে দেখতে ইন্দিরার চোখে জল ভ'রে এল। বলল আমার দিকে তাকিয়ে: "কী অপূর্ব দাদা, না? দেখ তো—কী আনন্দে চলেছে এরা অশ্রান্ত পদক্ষেপে আটক্রোশ পথ পরিক্রমা করতে!"

মনে মনে বললাম: "ধন্য আমি যে এ-দৃশ্য দেখতে পেলাম যার আলোয় বিকীর্ণ হয় ভগবানের আশীর্বাদ—ঝরে ভক্তির আনন্দ-নির্ঝর, যার আশীর্বাদে লক্ষ লক্ষ নরনারীর দেহমন যায় জুড়িয়ে!" ভারতকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, সন্তদাস প্রমুখ পরম ভাগবতেরা যে পুণ্যভূমি নাম দিয়েছেন কেন যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। আমরা সংসারে দিনের পর দিন চলি—না চ'লে উপায় নেই ব'লে, শ্বাস প্রশ্বাসে প্রাণবায়ু গ্রহণ করি বাঁচতে হবে ব'লে, চোখ চেয়ে আলোকে বরণ করি আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না ব'লে। কিন্তু জীবনের আর একটি ছন্দ আছে যার নাম দেবতার আবাহনের ছন্দ-- ভক্তির উচ্ছ্বাসে যার সহজ প্রকাশ। অযোধ্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে দেখেছিলাম সেদিন সেই দিব্য আবির্ভাব—যাকে কালে ভদ্রে দেখা যায়। তাই মনে মনে প্রণাম করেছিলাম ঋষি বাল্মীকিকে যিনি রামায়ণ গান করেছিলেন সে কবে পাঁচহাজার বৎসর আগে—অথচ আজও তাঁর গানের সুরে বেজে ওঠে লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী নিরন্ন প্রাণে ভক্তির ঝংকার, আনন্দের জয়ধ্বনি। রামায়ণের তথা হনুমানের মহিমার মর্ম যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম অযোধ্যায় এই আকস্মিক তীর্থযাত্রায়।

(স্মৃতিচারণ—তৃতীয় পর্ব—সমাপ্ত)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৪	ও যে	ও কে
৩২	২১	অনেক	অনেক সময়ে
৩৪	৯	এখনো	কখনো
৩৬	১৮	আশ্বস্ত	উদ্বিগ্ন
৩৯	নিচ থেকে ৪	যে	রে
৪৪	৫	সবচেযে	সবচেয়ে
৪৫	নিচ থেকে ৮	বিচারপুজা	অবিশ্বাসের
৪৭	৪	শঙ্করভাষ্য	শাঙ্করভাষ্য
৪৮	২	ভর না	ধর্না
৪৮	৯	অতি স্মরণীয়	অবিস্মরণীয়
৬৭	১৮, ১৯	তাঁকে বিচার কয়ত	বই বিচার করে
৬৭	শেষ	যখন	নানা
৬৮	১৫	ভোরুস্বামী	ডোরাস্বামী
৬৯	১৭	আত্মধিকার	আত্মধিকারের
৮২	২৫	প্রসঙ্গ	প্রসঙ্গে
১০৭	১৬	অবিস্মরণীয়	অবিস্মরণীয়া
১১৫	৯	কালে	কানে
১২৭	১৯	নিয়ে	ফলিয়ে
১২৯	২	পাঠানো	ঠাঁই পাওয়া
১৩৮	১৮	মানুষ	পার্ষদেরা
১৪৯	২২	বলতে না যাওয়াই	পড়তে না বসাই
১৫৬	১৯	তাঁর	যার
১৬৭	৩	যে, কারণ	আরো এই জন্যে যে,
২০৬	২৪	অনির্বচনী	অর্থব্যঞ্জক
২২৬	২৫	পেয়েছিলেন	পেরেছিলেন
২৩৬	১০	বলি কী কোন্	বলি কোন্
২৪০	১১	বললেন	এলেন
২৫৫	৬	ভিত্তি	তিনি
২৬০	২০	ধারার	ধারণা
২৬১	৯	মরীচিকামুগ্ধ	মরীচিকামুগ্ধ নয়
২৬৮	১০	যদি না বিধাতা	যদি বিধাতা
২৬৯	৯	নানা সাধন সম্বন্ধে	সাধন সম্বন্ধে নানা
২৭১	৭	গতায়ু	গতায়ু
২৭৭	২৫	যেয়ে	চেয়ে
২৯৯	৪	আর্য	আর্য